প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮

প্রকাশক
সঞ্জীবকুমার বসু
অভী প্রকাশন
১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড
কলিকাতা ১

মুদ্রাকর
অমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩।১ মণীন্দ্র মিত্র রো
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

I pray to God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue. That is his legitimate sphere, his proper element. European Scholarship is good in as much as it renders us masters of the intellectual resources of the most civilised quarters of the globe ; but when we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have spring of fresh thought in them, fly to their mother tongue. ......I should scorn the pretensions of that man to be called 'educated' who is not master of his own language.

ভের্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে লেখা মাইকেলের চিঠি।

[২৬শে জানুয়ারী, ১৮৬৫]

সূচীপত্র

এক

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের নানা সূত্র

যেভাবে নানা বিদেশী জাতির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বণিকেরা এ দেশের শাসন-ভার পেয়েছিল তাতে তাদের পক্ষে এদেশে ইংরিজি শিক্ষাব্যবস্থার কোন পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা সম্ভব ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অধঃপতন এবং শিক্ষা-দীক্ষার অবনতি যেভাবে দেখা দিয়েছিল তার ফলে বণিকের মানদণ্ডকে রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিণত করাও সম্ভব ছিল না। মোগল শাসনের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাকে উন্নত ক'রে, জমিদারী কর্তৃত্ব গ্রহণ ক'রে, রাজস্ব-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে সরিয়ে অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বেশ সময় লেগেছিল। তাছাড়া সংকীর্ণ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোম্পানী যে শাসন চালাচ্ছিল তাকে সরানোও বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছিল। স্যার চার্লস গ্র্যান্টের বিখ্যাত রচনা, ১৮১১ সালে লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা এবং লর্ড ওয়েলেসলির সাক্ষ্য ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, বাঙলা দেশে তখন জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার বিশেষ অবনতি হয়েছিল। আর এই নতুন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশও অনুকূল ছিল না। এদেশে বা ইংল্যাণ্ডে উভয়ত্রই শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন ছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা অনর্থক আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়াবে এমন কথাও কর্তৃপক্ষ বলতেন। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টাতেই যে ইংরিজি শিক্ষার ব্যবস্থা হবে তা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়।

পাশ্চাত্ত্যধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাঙলা দেশে শিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ চার রকমের স্কুল উনিশ শতকের প্রথম দিকে দেখা গিয়েছিল :

১. হিন্দু প্রাথমিক স্কুল বা পাঠশালা।

২. হিন্দু বিদ্যার্জনের স্কুল বা টোল।

৩. মুসলমান প্রাথমিক স্কুল।

৪. মুসলমান বিদ্যাকেন্দ্র বা মক্তব।

দেশীয় বিদ্যাচর্চার অবনতি রোধ করবার জন্য এবং ইংরেজ ও দেশবাসীদের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কলকাতায় এক আরবি শিক্ষার কলেজ বা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের আগে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনার কোন ব্যবস্থাই ঘটে ওঠে নি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে লর্ড ওয়েলেস্‌লির আগ্রহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। এর আগে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দু কলেজ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক দিগন্তকে বহু দূর বিস্তীর্ণ করেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ: সিভিলিয়নদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞানের অভাবের জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের খুব অসুবিধায় পড়তে হতো। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে ঠিক হয় যে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী থেকে কতকগুলি বিশেষ চাকরিতে নিযুক্ত হতে হলে একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। পরীক্ষার বিষয়ে কতকগুলি কাজের জন্য বাংলা, ফার্সি ও হিন্দুস্থানী ভাষা-শিক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাঙলা, তেলেগু, মারাঠী, তামিল, কানাড়ি—হিন্দু আইন, মুসলিম আইন, ইংরিজি আইন, নীতিশাস্ত্র এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধ্যাপক-পদের জন্য প্রস্তাব করা হয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বাঙলা বিভাগ খোলা হয় নি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরির অধীনে বাঙলা ও সংস্কৃত বিভাগ খোলা হয়। কেরির উৎসাহে কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষ উৎসাহী হয়েছিলেন। অনেক বাইরের লোকও পুস্তক-প্রকাশে কলেজ কর্তৃপক্ষের অর্থ-সাহায্য পেয়েছিল। রোবাকের বই থেকে আমরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় পাই[১]:

কথোপকথন: উইলিয়াম কেরি	১৮০১
হিতোপদেশ: গোলকনাথ শর্মা	১৮০১
প্রতাপাদিত্য চরিত্র: রামরাম বসু	১৮০১
বত্রিশ সিংহাসন: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮০২
লিপিমালা: রামরাম বসু	১৮০২

তোতা ইতিহাস (ফারসি থেকে অনূদিত) : চণ্ডীচরণ মুন্সী ১৮০৫

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং :

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৮০৫

রাজাবলি : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০৮

A Dictionary of Bengali Language, Vol. I :

উইলিয়াম কেরি : শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ১৮১৫

পুরুষ পরীক্ষা : হরপ্রসাদ রায় ১৮১৫

A Grammar of the Bengali Language :

উইলিয়াম কেরি : শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ১৮১৮

এছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, কলেজ পরিষদের উৎসাহে রামকমল সেন ইংরিজি বাঙলা অভিধান সংকলনে সরকারের কাছ থেকেও উৎসাহ পেয়েছিলেন (১৮১৬)। বইটি পরে তিনের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। কেরির উৎসাহে মোহনপ্রসাদ ঠাকুর (কলেজের লাইব্রেরিয়ান) ইংরিজি-বাঙলা ওয়ার্ড বুক সংকলন করেছিলেন। কলেজ পরিষদ থেকেই দায় ভাগ—দত্তক প্রকরণ-এর বাংলা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কলেজের উদ্যোগে একটি বার্ষিক রচনা প্রতিযোগিতা হতো। সে প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের প্রদত্ত বিষয়ের বিপক্ষে বা স্বপক্ষে আলোচনা করতে হতো ভারতীয় ভাষায়। সে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকতেন গভর্নর জেনারেল, কলেজ পরিষদের সভাপতি ও সভ্যগণ, কর্মচারী ও অধ্যাপকগণ এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ। প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি লক্ষণীয়। কয়েকটির উল্লেখ করি[২] :

১. The Bengali Language is not only well-calculated for matters of business, but also is adapted to works for Literature and Science, 25th July, 1815.

২. The Bengali Language is better suited to historical than to poetical or philosophical composition, 15th July, 1816.

৩. The Bengali Language from its facility in the compounding of words, is one of the most expresisve language of the East. 15th August, 1818.

উইলিয়াম কেরি এই আলোচনা-সভা পরিচালনা করতেন এবং বাঙলাতে বক্তৃতা দিতেন। মহামান্য গভর্ণর জেনারেল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যবিবরণীর ওপর মন্তব্য করে বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতা থেকেই আমরা পাই এই দুটি উল্লেখযোগ্য তথ্য[৩] :

১. Mr. Sargent has qualified himself to translate four books of Virgil's Aeneid into the language of Bengal and has performed the work. [Address in 1809]

২. Mr. Monckton has undertaken, and has been able to execute, a translation into Bengali of Shakespeare's Tragedy of the Tempest [Calcutta Review, 1850, Art. Beng. Lit.]

লঙের ক্যাটালগ অনুযায়ী সার্জেন্ট 'ইনিড' ছাড়াও ইলিয়াডের প্রথম সর্গেরও বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন (১৮০৫)।

এ-দেশে এসে এ-দেশীয় আচার-সংস্কৃতি ও ভাষা শিক্ষার একটা উপায় হলো বিদেশীদের এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু বিদেশ থেকে আসার আগেই যাতে কর্মচারীরা এ-দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়ে আসতে পারে, তার জন্য হার্টফোর্ড ক্যাস্‌লে একটি স্কুল খোলা হলো। পরে এটি হেইলেবেরিতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ১৮১৩ সালের চার্টারে এই স্কুলটিকে মর্যাদাও দেওয়া হয়। এই স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কেউ কেউ এদেশে এসে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। মনোনয়ন প্রথা তুলে দিয়ে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হলো তখন এই স্কুলের গুরুত্ব কমে যায়। যাই হোক, বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব অসামান্য। দেশী-বিদেশী নানা বইয়ের অনুবাদ ক'রে, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা ক'রে, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র বিদ্যার চর্চায় উৎসাহ দিয়ে এই কলেজ যে শুধু শাসন-কার্যেরই সুবিধা করেছিল তা নয়, বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টিতে নতুন প্রেরণা দিয়ে সাহিত্যের নবজাগরণের সূচনা করে দিয়েছিল।

শিক্ষা বিস্তারে সরকারী প্রচেষ্টা ও রামমোহন রায় : সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ সৃষ্টি করলেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই, শাসন কার্যে দক্ষতা বাড়াবার জন্যই, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে

পরোক্ষভাবে সাধারণে কিছুটা উপকৃতও হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দশকের পর থেকেই সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা ও নতুন ভাবধারা গ্রহণের বিশেষ উৎসাহ দেখা দিল। কিন্তু সে তুলনায় সরকার কিছু করে উঠতে পারলেন না। প্রথম প্রথম প্রাচীন-সাহিত্য সংরক্ষণের কিছু চেষ্টা সরকার করেছিলেন। তারই ফলে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) এবং বারানসী সংস্কৃত কলেজের (১৭৯২) সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮১৩ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সনদ আইনে (Charter Act of 1813) ভারতবর্ষের কোম্পানীর একচেটে বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ও ভারতীয় পণ্ডিতদের উৎসাহ দেবার জন্য দশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও পরিচালনার জন্য শিক্ষা-পরিষদ বা জেনারেল কমিটি তথা পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শন জন্মলাভ করে। সনদ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত টাকা এতদিনে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হলো। তবে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে টাকার পরিমাণ কমই ছিল। তাছাড়া সনদ আইনের ধারাতে যে Revival of Literature এবং Introduction and Promotion of a Knowledge of the Sciences-এর কথা বলা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা নিয়ে সমস্যা হলো, প্রাচ্য বিদ্যায় উৎসাহী পণ্ডিতরা ধরে নিলেন যে, প্রাচ্য বিদ্যার উন্নতিতেই যখন নানা ব্যয় হয়েছে [সংস্কৃত ও আরবি শিক্ষা পুস্তক প্রকাশে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার দৃষ্টান্ত তাঁদের চোখের সামনে ছিল] তখন ঐ টাকাও প্রাচ্য-বিদ্যার চর্চাতেই ব্যয়িত হবে।

কিন্তু অনেকেই এতে সন্তুষ্ট হলেন না। রামমোহন রায়-ই (১৭৭৪—১৮৩৩) প্রথম এগিয়ে এলেন। প্রাক্-বেকন যুগের ইয়োরোপীয়ান স্কুলের আদর্শে যখন একটি সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কথা হলো, তখন অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে রামমোহন রায় ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তর্কবিচার ছেড়ে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে চিঠি দিলেন। এই মতের বিপক্ষে প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু নতুন যুগের অনিবার্য প্রবণতাকে রামমোহন ধরতে পেরেছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত রামমোহনেরই জয় হলো। ১৮৩৫-এর ২রা ফেব্রুয়ারী এক মন্তব্য-পত্র লিখলেন লর্ড মেকলে। ৭ই মার্চ সে পত্রে স্বাক্ষর করলেন উইলিয়াম বেন্টিক। এই বিধি অনুযায়ী স্থির হয়, যে এক লক্ষ টাকা এ দেশীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে, তা শুধু ইয়োরোপীয় সাহিত্য-জ্ঞান-

বিজ্ঞানের জন্যই, এবং ইংরিজি ভাষাতেই সব কিছু শিক্ষাদান করা হবে। পরে ১৮৫৪ সালের আদেশ-পত্র এই ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা কর্তব্য যে, যাঁর মধ্যে আমরা প্রথম প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্ত্যের সম্মিলন দেখেছি তিনি হলেন রামমোহন। বারানসীতে তাঁর শাস্ত্রীয় শিক্ষা হয়েছিল। পাটনাতে তিনি আরবি-ফারসি কিস্‌সার মধ্যে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। বিচিত্র দেশ-বিদেশ ভ্রমণে তিনি তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরে তিনি ইংরিজি চিন্তা ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করে বৃটিশ ও আমেরিকান ইউনিটেরিয়ানদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। বেন্থাম ও রস্কো নিজেদেরই সমকক্ষ জেনে রামমোহনকে অভিনন্দন জানান। ফরাসী চিন্তানায়কদেরও প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রামমোহনের চিন্তাশীলতা শুধু যুক্তি-তর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সব সময়েই তিনি নতুন যুগের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি নিয়ে সাধারণের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাতেই এগিয়ে এসেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা-প্রচারে রামমোহনই ছিলেন প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমহার্স্টের কাছে লেখা খোলা চিঠি ছাড়াও, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন, তাতে মেকানিক্‌স, জ্যোতির্বিদ্যা, ভল্টেয়ারের রচনা ও ইউক্লিড পড়ানো হতো। ১৮২৫-এ তাঁর প্রতিষ্ঠিত কলেজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন তিনি। এর দু'বছর আগে চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড এসেম্বলির কাছে তিনি আবেদন করেছিলেন যোগ্য শিক্ষক পাঠাবার জন্য এবং ১৮৩০-এ ডাফ সাহেব যখন কলকাতায় এলেন, তখন তিনি রামমোহনের বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন।

মিশনারী প্রচেষ্টা ও আলেকজাণ্ডার ডাফ : জনসাধারণের মধ্যে ইয়োরোপীয় শিক্ষার প্রসার প্রধানতঃ মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি কেরির শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন ঘটে। ১১ই জানুয়ারি থেকে মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরিদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করা এবং খৃষ্টের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। ১৮১৪-তে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচেষ্টায় চুঁচুড়া অঞ্চলে অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৬-তে

মার্শম্যান শ্রীরামপুর অঞ্চলে অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৪-তে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ওই বছরেই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের জন্য ডায়োসেসান কমিটি গঠিত হয়। ১৮২৯-এ ডাফ সাহেবের আসার আগের বছর, গরীব হিন্দু ছাত্রদের জন্য স্থাপিত হয় চার্চ মিশনারী স্কুল।

আলেকজাণ্ডার ডাফ ই হলেন প্রথম মিশনারী, যিনি দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে প্রথম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন। সমস্ত সংস্কার ও প্রথাগত চিন্তাকে দূর করতে চেয়েছিলেন ডাফ নতুন শিক্ষার মাধ্যমে। হিন্দু কলেজের ডিরোজিও যে চেষ্টা করেছিলেন, সমস্ত বাংলা দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ডাফ সাহেব সেই চেষ্টাই করেছিলেন। তাঁর জেনারেল এসেম্ব্লি প্রতিষ্ঠানে তিনি সাতটি ছাত্র নিয়ে শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। পরে সেই সংখ্যা বার-শো-তে দাঁড়ায়। পরে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে নানা কারণে সরে এসে তিনি কলেজ অফ দি ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভবিষ্যতে সেই কলেজের সম্মিলিত রূপ দাঁড়ায় স্কটিশ চার্চ কলেজ (১৯০৮)। বাংলা দেশকে পশ্চিমীকরণে ডাফের কৃতিত্ব আরও এক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেটি হলো তিনি ইংরিজি ভাষা-সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অপরিহার্য মনে করে শিক্ষা বিস্তারের কাজে এগিয়েছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মে জেনারেল এসেম্ব্লিতে তিনি বলেছিলেন[৪] :

> **The English language, I repeat it, is the lever which, as the instrument of conveying the entire range of knowledge, is destined to move all Hindusthan**

হিন্দু কলেজ : হিন্দু কলেজের মধ্য দিয়ে সারা উনিশ শতক ব্যাপী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের চর্চা আমাদের দেশীয় চিন্তাধারাকে বদলে দিয়েছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি আপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজ ছিল ইংরিজি শিক্ষার প্রধান স্থান। ১৮২৫ সনে ডেভিড হেয়ার কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্য হন। বিদ্যোৎসাহী ডেভিড হেয়ার এবং দুই অধ্যাপক ডিরোজিও ও রিচার্ডসন— এই তিনজনের প্রভাব বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে যুগান্তর এনেছিল। ডেভিড হেয়ারের ইংরিজি শিক্ষার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। সেই যুগের শিক্ষা-আন্দোলনে দুটি দল ছিল। মেকলে

ইত্যাদি মনীষীরা ইংরিজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্য পক্ষ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও আরবি সাহিত্য পঠন-পাঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হবে সেই নিয়েও দুই দলের মতভেদ ছিল। হেষ্টিংস, মিণ্টো প্রমুখ এক দল সংস্কৃত ও আরবি ভাষার পক্ষে ছিলেন। মুনরো, এলফিনষ্টোন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষাকে সমর্থন করেন। ডেভিড হেয়ার জ্ঞান-চর্চার ব্যাপারে এক দেশ-দর্শী না হয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের প্রয়াসী ছিলেন। মাতৃভাষা এবং ইংরিজিতে বই লেখা ও প্রচারের জন্য নব্য যুবকদের যে সমিতি ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডেভিড হেয়ার। এছাড়া সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য নব্য-যুবকদের যে সমিতি ছিল তার সঙ্গেও ডেভিড হেয়ার যুক্ত ছিলেন। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র (১৮৩৮) পরিদর্শক ছিলেন তিনি।[৫] হিন্দু কলেজের উন্নতি হবার পরে এই কলেজের শিশুশিক্ষার শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করে সেটিকে একটি বাংলা পাঠশালারূপে স্থাপন করা হয় (১৮৩৯)। হেয়ার-ই এই পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে একটি জিনিস লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন খৃষ্টধর্মী, কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচারের তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া তাঁর মৃত্যুর পর ঐ গুণটির উল্লেখ করেছিলেন—'his inveterate hostility to Gospel'। তার ফলে উগ্র খৃষ্টধর্মীদের চোখে তিনি 'হিন্দু' বলে গণ্য হতেন। মুক্ত মন ছিল বলেই তিনি নব্য-যুবকদের স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম উৎসাহদাতা হয়ে পড়েছিলেন।

ইয়োরোপীয় ভাবনা চিন্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাহক ছিলেন ডিরোজিও। পাঁচ বছর (১৮২৬—১৮৩১) তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেছিলেন এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি বাংলা দেশের নবজাগরণের প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে ছাত্রদের মধ্যে এবং দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছিলেন। মানবিকবাদ, স্বদেশ প্রেম, স্বাধীন চিন্তা এবং সুরুচি—বাঙালী সাহিত্যিকের এই ক'টি নবলব্ধবোধ ডিরোজিও-র প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। ডিরোজিওকে পুরোভাগে রেখে যে অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন গড়ে উঠেছিল (১৮২৮), তাতে যে সব আলোচ্য বিষয় ছিল সেগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে মানবিক গুণাবলীর চর্চা সেখানে কতখানি হতো। ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ডস্ জানাচ্ছেন[৬]:

Free will, fore-ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the argument for and against the existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid, Dugald Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry and the shame of priesthood were subjects which stirred to their very depths the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindu youths of Calcutta.

আলোচনার উন্নত মান সম্পর্কে ডাফ বলেছিলেন[৭] :

.. the sentiments delivered were fortified by oral questions from English authors. If the subject was historical, Robertson and Gibbon were appealed to ; if political, Adam Smith and Jeremy Bentham ; if scientific, Newton and Davy, if religious, Hume and Thomas Paine ; if metaphysical, Locke and Reid, Stewart and Brown. The whole was frequently interspersed and enlivened by passages cited from some of our most popular English poets, particularly Byron and Sir Walter Scott. And more than once my ears greeted with the sound of Scotch rhymes from the poems of Robert Burns.

এই রকম সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই কলেজের ছাত্ররা যে সত্যপ্রিয় ও সৎ, এমন কথা প্রায় প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ষোল বছর বয়সেই ডিরোজিওর 'The Harp of India' কবিতায় দেশপ্রেমচেতনা প্রকাশ পেয়েছিল। তারই পরিণতি—'Fakir of Jhungeera'। এই স্বদেশ-প্রীতির চেতনা তিনি ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চার করেছিলেন। রক্ষণশীল দলও এই স্বদেশ-প্রীতির শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবে তা নঙর্থক ভাবে বিদেশী-বর্জন রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সভায় আলোচনা ছাড়া ডিরোজিও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারাই চিন্তাশক্তি-চর্চার সুযোগ করে দিতেন।

হিন্দু কলেজ থেকে অপসারিত হবার পর উইলসনকে নিজের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে ডিরোজিও যা বলেছিলেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য[৮] :

Entrusted as I was for sometime with the education of youth peculiarly circumstanced, was it for me to have made them pert and ignorant dramatists, by permitting them to know what whould be said upon only one side of grave questions ? Setting aside the narrowness of mind which such a course might have evinced, it would have been injurious to the mental energies and acquirements of young men themselves. And (whetever may be said to the contrary), I can vindicate my procedure by quoting no orthodox authority than Lord Bacon : 'If a man', says this philosopher (and no one ever had a better right to pronounce an opinion upon such matters than Lord Bacon), 'will begin with certainties, he shall end in doubt. This, I need scarcely observe, is always the case with contented ignorance when it is roused too late to thought. One doubt suggests another, and universal scepticsim is the consequence. I therefore thought it my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo, in which the most subtle and refined arguments against theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume,—replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending. If the religious opinions of the students have become unhinged in consequence of the course I have pured, the fault is not mine. To produce conditions was not within my power, and if I am to be

condemned for the Atheism of some, let me receive credit for the theism of others.

এই রকম ছিল ডিরোজিওর জ্ঞান-বিতরণের পন্থা। এই স্বাধীন চিন্তার সুযোগ দেওয়াতেই ব্যক্তি-চেতনা এসেছে, আত্মপ্রসার ঘটেছে। জীবন সম্পর্কে এক নতুন নৈতিকবোধ এবং জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে সামগ্রিক রুচি পরিবর্তনের মূলেও রয়েছেন ডিরোজিও। তাঁরই সমসাময়িক হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ডিরোজিও সম্পর্কে জানাচ্ছেন :

> ...On the other hand he fostered their taste in literature, taught the evil effects of idolatry and superstition: and so far formed their moral conceptions and feelings as to make them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age.[৯]

এই যুগোত্তীর্ণ রুচি নবযুগের বাঙালীর নব জাগরণের প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। ডিরোজিওর শিক্ষক ড্রামণ্ড ছিলেন ক্লাসিক্স-এ পণ্ডিত। তাঁর কাছ থেকেই ডিরোজিও গ্রীক্ সংস্কৃতির প্রতি টান অনুভব করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল কতকটা এই রকম[১১]: 'মনের দিক থেকে মানুষ মাত্রেই সম্রাট্। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে, মানবিক রুচি বিকৃত না করে, আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিকাশের জন্য যা ইচ্ছা করার স্বাধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে। ঈশ্বর যদি কেউ থাকেন ত থাকুন, যাঁদের অফুরন্ত অবসর আছে তাঁরা স্বর্গলোক কোথায় তার হদিশ করুন। কিন্তু ইহজীবনে মানুষই ঈশ্বর, মানুষই তার সর্বময় প্রভু এবং মানব-চিন্তাই ঈশ্বর চিন্তার নামান্তর, মানুষের চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই পৃথিবীতে। ঘোর সংশয়বাদী ও যুক্তিপন্থী ড্রামণ্ড একথা কেবল যে বন্ধুদের বা সমদর্শীদের বলতেন তা নয়, মধ্যে মধ্যে ছাত্রদেরও শোনাতেন।' উনিশ শতকের মানব কেন্দ্রিক জীবন-দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

গ্রীক্ সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়া ডিরোজিও ছিলেন উদীয়মান রোম্যান্টিক কবিদের ভক্ত। এই কারণেই ডিরোজিওর পক্ষে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাধীন চিন্তা, দেশপ্রেম ও সুরুচি – এই গুণগুলি বাঙলা দেশের নবযুবকদের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৯ এই চার বছরে বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলী কলেজ এবং হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষের কাজ

করেছিলেন কবি ও পণ্ডিত ডি. এল. রিচার্ডসন। ইংরিজি সাহিত্য, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র এবং ইংরিজি রচনা-প্রণালী সবই তিনি পড়াতেন বা শেখাতেন; বিশেষ করে ইংরিজি কবিতা পড়ানোতেই তিনি ছিলেন পারদর্শী, শেক্‌সপীয়রের হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিঙ্‌লিয়ার, হেনরি দি ফোর্থ-দু'খণ্ড, পোপের এসে অন্ ক্রিটিসিজম্‌, রেপ অব দি লক, এসে অন ম্যান এবং প্রলোগ টু দি স্যাটায়ার্স—সবই তিনি পড়িয়েছিলেন। বেকনের রচনা পড়াতেও তিনি ভালবাসতেন, পরে ছাত্রদের অনুরোধে তিনি টেমিং অব দি শ্রু, টাইমন অব এথেন্স এবং রোম্যান্টিক চিন্তা ও দৃষ্টির ভঙ্গির উৎস ইয়ং এর নাইট থটস্‌-ও পড়িয়েছিলেন। মেকলের প্রশংসাধন্য রিচার্ডসন তাঁর বিদায়-ভাষণে বলেছিলেন[১১]:

I behold my pupils, old and young, every direction and I am led to make rough calculation of the thousand of oriental intellects that I have contributed to influence or to mould by familiarising them with the thoughts and feelings of the West—with the immortal works of the noblest British authors. It is a triumph to me to have introduced them to such writers as Bacon and Shakespeare and Milton and Addison [পরে রবীন্দ্রনাথের মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় (ভারতী, ১২৮৪) এডিসনের Cato থেকে উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া গেছে] and Johnson and Young [পরে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইয়ং-এর Night Thoughts অনুবাদ করেছেন] and Cowper and Hallam and Mecaulay.

এখন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পর তিন দশকের পড়াশোনার একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে। বিশের দশকে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বেকন, লক, বার্কলে, হিউম, রীড এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্টের রচনা পড়তেন। লালবিহারী দে তাঁর Recollections of Alexander Duff-এ লিখেছেন।[১২]

The young men brought up in the Hindu College, began to study the works of Bacon, of Locke, of Berkley, of Hume, of Read and of Dugald Stewart.

জেনারেল এসেম্ব্লির ছাত্রদের "The Letters of Samuel Rutherford', 'Archbishop Leighton's commentary on the Epistles of St. Peter', 'The Life of Henry Martin' ও তাঁর 'Diary,' বাইবেল প্রায় সম্পূর্ণ, Butler's Analogy, John Herschel-এর Introduction to the study of Natural Philosophy, Locke, এবং Robert Boyle-এর ধর্মীয় সাহিত্য ইত্যাদি পড়ানো হতো।[১৩] ডিরোজিওর মাধ্যমে এই দশকে স্কট বায়রন ও অন্যান্য রোম্যান্টিকদের প্রভাব পড়েছে বলতে পারি। তিনের দশকের প্রথমেই কৃষ্ণমোহন ঘোষণা করেন যে, হিন্দু শাস্ত্রের চেয়ে পোপ-ড্রাইডেনের কাব্য শ্রদ্ধার বস্তু।[১৪] ডাঃ স্মিথের আলেকজাণ্ডার ডাফের জীবনী থেকে জানতে পারি,[১৫] ১৮৩০-এ ওয়াল্টার স্কট, বায়রন ও বার্নস খুব পড়তো ছাত্ররা। চারের দশকে পড়াশোনার প্রমাণ রিচার্ডসনের অধ্যাপনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। শেক্স্পীয়রের রচনা এই দশকেই ছাত্রদের বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। সম্বাদ প্রভাকর-এর ৩.৪.১৮৪৮-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল : 'ওরিয়েন্টাল সিমিনরিতে এইক্ষণে ৫৮২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এবং তাঁহারা অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা মিল্টন, সেক্স্পীয়ার, বেকন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল পাঠ করিয়া থাকেন।'[১৬] এছাড়া এই সময়কার পড়াশোনা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে উমেশচন্দ্র দত্ত ও ব্রজমোহন মল্লিকের স্মৃতিকথায়। সে সময় সাহিত্য বিষয়ক যে সব রচনা পড়ানো হতো তার মধ্যে হোমার সেক্স্পীয়ার মিল্টন, পোপ ড্রাইডেন, ইয়ং, কুপার, স্কট, বেকন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বেল, স্টুয়ার্ট, কীট্লি, গীজো, অ্যাডাম স্মিথ, মিল, মেকলে, নিউটন ইত্যাদি লেখকের উল্লেখযোগ্য রচনা পড়ানো হতো। বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (বিশ্বভারতী সং, ১৩৭৩, পৃ ১৬২, ১৬৭-৮, ১৯১-৪, দ্রষ্টব্য) এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে রঙ্গলাল যখন বাঙলা কবিতার বিষয়ে আলোচনা করছেন, তখন দেখা যাচ্ছে, ইয়োরোপীয় ক্লাসিকস্ ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন। তার সঙ্গে শেক্সপীয়র, মিল্টন, পোপ, ড্রাইডেন, স্কট, বায়রন ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদের রচনাও তিনি পড়েছেন। তবে একাধারে ক্লাসিকস্ ও আধুনিক সাহিত্যকে আত্মসাৎ করবার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন মাইকেল। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ও

বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধের প্রতিভাবান্ বুদ্ধিজীবীরা কেবল বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণই করেন নি। সংস্কৃত ভাষার আধারে যে বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্পদ ছিল তা নতুন ক'রে অর্জন করার জন্যে তাঁরা সংস্কৃতচর্চাও রীতিমতো শুরু করেন। বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের মতো যাঁরা ঐতিহ্যলালিত নন তাঁরা সংস্কৃত শিখেছিলেন আত্ম-গরিমাবোধেই। রামমোহন তো বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫) দিয়েই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তারপর উপনিষদগুলি অনুবাদ করেন (১৮১৬-১৮১৯)। এছাড়া স্মৃতি, তন্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রেও তিনি অধিকার অর্জন করেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান : কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান (তাদের মধ্যে কোনটি অতি অল্পায়ু হলেও) পাশ্চাত্ত্য ভাবনাচিন্তাকে এদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭)। এই সোসাইটির প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল : আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন এবং মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এছাড়া ডেভিড হেয়ার এবং রাধাকান্ত দেবের যুগ্ম সম্পাদনায় ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) স্থাপিত হয়। এই সোসাইটি পুরোনো স্কুলগুলিকে সাহায্য করতো, নতুন স্কুল খোলার চেষ্টাও করতো। ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কথা (১৮২৮) আগেই বলেছি। এছাড়া গৌড়ীয় সমাজ সর্বতত্ত্ব-দীপিকা সভা (১৮৩২), বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮) ইত্যাদি সমিতি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিচিত্র বিষয়ের চর্চা আরম্ভ করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯)-তেও জাতীয়তার ব্যাপক ও উদার আদর্শ দেখা গেল। এই সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) ছিল সে যুগের চিন্তানায়ক। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে স্থির মস্তিষ্কে কীভাবে গ্রহণ করা যায়, তার আদর্শ ছিল এই সভা ও তার মুখপত্র। পরে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে। এছাড়া সর্বশুভকরী সভা, বঙ্গ-ভাষানুবাদক সমাজ, বেথুন সোসাইটি, শিল্প-বিদ্যোৎসাহী সভা, সমাজোন্নতি-বিধায়িনী-সুহৃদ্ সমিতি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বামাবোধিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা জীবনের বিচিত্র বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও অনুশীলনকেই প্রমাণ করে।

বিভিন্ন আন্দোলন : উনিশ শতকের বাংলা দেশের জীবন বিচিত্র-

আন্দোলনে মুখর এবং এই আন্দোলনগুলির জন্মসূত্রে ইয়োরোপীয় ভাবনাচিন্তা সব সময়ে স্পষ্টভাবে না থাকলেও মূল প্রেরণাদায়ক হিসাবে যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

॥ খৃষ্টান মিশন ॥ উনিশ শতকে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ এবং চার্চ অব ইংলণ্ডের পাদ্রিগণ। এই শতাব্দীতে এদেশে পর্তুগীজ মিশনের ক্ষমতা খুব কমে যায়। ফলে পর্তুগীজদের পক্ষ থেকে ধর্ম প্রচারেব বিশেষ কোন চেষ্টাই দেখা যায় নি। যাই হোক্, কেরি ১৭৯৩ সালে কলকাতায় এসে ব্যাপটিস্ট মিশনারিগোষ্ঠীর পরিচালক হন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাঙলা বিভাগের পত্তন করেন। শ্রীবামপুব মিশনের প্রতিষ্ঠাব আগে যে প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনারী এদেশে আসেন তাঁর নাম জন টমাস। তিনি মালদহে একটি ক্ষুদ্র ইয়োবোপীয়মণ্ডলীব পরিচালক হন এবং রামরাম বসুর কাছে বাঙলা শেখেন। এই বামবাম বসু মিশনাবিদের কাজে যথেষ্ট সাহাষ্য করেছিলেন। মিশনাবিদের পন্থা ছিল তিনটি: ১। সুসমাচার, ২। ভারতীয় ভাষায় ধর্ম শাস্ত্রের অনুবাদ ও বিতবণ এবং ৩। শিক্ষাবিস্তার। অনুবাদের কাজে রামবাম বসু অনেক সাহাষ্য করেছিলেন। এছাডা 'হরকরা' বা 'গসপেল মেসেঞ্জার' নামে এক-শো পংক্তিব একটি কবিতা-পুস্তক তিনি রচনা করেন (১৮০০)। ক্রমে হিন্দু সমাজেব মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয় এবং নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের ওপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। খৃষ্টধর্ম প্রচারে যে কেবল হিন্দু ও মুসলমানেবা বাধা দিত তাই নয়, এ দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বাধা হয়ে দাঁাডয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বয়ং। পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে যখন মিশনেব কাজে কোম্পানার প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচবণ শেষ হলো, তখন থেকে মিশনের কাজ দ্রুত এগোতে থাকে। ১৮১৮ সনে ধর্মান্তরিত লোকসংখ্যা দাঁড়ায় এক হাজারেরও বেশী।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে Gospel of St. Mathew অংশ মূল গ্রীক্ থেকে অনূদিত হয়। ১৮০১-এ নিউ টেস্টামেন্টের মুদ্রণ হয়। কেরির মৃত্যুর আগে বাঙলা বাইবেলের অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং চৌত্রিশটি ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল অথবা বাইবেলের অংশ অনূদিত হয়। বই ছাড়াও শ্রীরামপুরের মিশনারীরা সাময়িক পত্রও প্রকাশ করতেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে বাঙলা দেশে বাঙলা ভাষায়

মুদ্রিত 'দিগ্‌দর্শন' নামে মাসিক পত্র জন্মলাভ করে। ক্লার্ক মার্শম্যান তার সম্পাদক হন। এই দিগ্‌দর্শনের আদর্শ ছিল 'পেনি' বা 'স্যাটারডে ম্যাগাজিন'। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দেই শ্রীরামপুর মিশনের অনুসরণে কলকাতায় একটি মিশন ও প্রেস স্থাপিত হয়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জে. ইয়েট্‌স একটি বাইবেল ট্রেনিং স্কুল খোলেন লোয়াব সারকুলাব বোডে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে 'লেডিজ সোসাইটি' স্থাপিত হয়। শ্রীবামপুব মিশনের পাদ্রিগণ অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ও খোলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দেব জানুয়াবিতে ববিনসনের সম্পাদনায় 'The Evangelist' বা 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয। খৃষ্টবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করাই এই পত্রিকাব উদ্দেশ্য ছিল। দু'বছব বাদে এই পত্রিকা উঠে গেলে ১৮৪৭-এ পাদ্রি জে ওয়েঙ্গাবেব সম্পাদনায় 'উপদেশক' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রায বাবো বছব পত্রিকাটি চলেছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের এগাবোই এপ্রিলেব একটি আইনে ঠিক হয়, হিন্দু বা মুসলমান খৃষ্টান হলে পূর্বের মতো উত্তবাধিকাব থেকে বঞ্চিত হবে না। এই সময়ে আলেকজাণ্ডাব ডাফের নেতৃত্বে খৃষ্টধর্ম প্রচাবের আন্দোলনে নতুন উত্তেজনা দেখা দেয়। ডাফ সাহেবেব কার্যকলাপ সম্পর্কে আগে কিছুটা আলোচনা কবেছি। এই প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য উল্লেখ করছি। ডাফ কাজ চালাবার মতো বাঙলা শিখেছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি ক্যালকাটা বিভিউ-এব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাব প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় ডাফের প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। বিষয় ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচাব ও ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু হত্যা। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন সোসাইটির মিশনারিদের নিয়ে একটি সভা গঠিত হয়। ক্রমে ক্রমে এটি ক্যালকাটা মিশনারি কন্‌ফারেন্স নামে পরিচিত হয়। এই সোসাইটিব সভা বসতো প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে। এ ব্যাপারে উদ্যোক্তা ছিলেন ডাফ। এই কন্‌ফারেন্সের মুখপত্র ছিল 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভাব' নামে মাসিক পত্র। এব প্রথম সম্পাদক ছিলেন ডাফ। অবজার্ভাবে খৃষ্টতত্ত্ব ও খৃষ্টানদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো। ডাফের চেষ্টায়, মিশনারিগণের স্ত্রীদের পরিচালনায় কতকগুলি স্কুল খোলা হয়। কতকগুলি অনাথ আশ্রম ও মেয়েদের বোর্ডিং-স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল।

খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাঁরা এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রণী হন, তাঁদের মধ্যে

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫) অন্যতম। হিন্দু ধর্মের সংস্কার বিসর্জন দিয়ে তিনি ডিরোজিওর বাড়িতে পানাহার করতেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ডাফ সাহেবের কাছে কৃষ্ণমোহন খৃষ্টধর্মে দীক্ষালাভ করেন। 'এনকোয়ারার' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করতেন কৃষ্ণমোহন। তাতে হিন্দুধর্মকে নানা ভাবে বিদ্রূপ করা হতো। ডিয়ালট্রি সাহেবের সহায়তায় কৃষ্ণমোহন বিশপস্ কলেজে একটি বৃত্তি নিয়ে কয়েক মাস পড়াশোনা করেন এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিশপস্ কলেজের গীর্জায় পাদ্রি হন। কৃষ্ণমোহনের উল্লেখযোগ্য রচনা হলো 'পারসিকিউটেড' (১৮৩১) নামে এক পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং 'ষড্‌দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭)। নাটকে তিনি হিন্দু সমাজের নানা দোষ দেখিয়েছেন। ষড্‌দর্শন বিষয়ের বইটিতে হিন্দু ধর্মের নতুন এক ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খৃষ্টানদের পরিচালিত 'বঙ্গবন্ধু' নামে এক পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করে আদর্শ হিসাবে দেখানো হয়েছে। 'বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্র বনাম খৃষ্টচরিত্র' নামে প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

এই ভাবে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে খৃষ্টান মিশনারিগণ ধর্ম প্রচারে এগিয়েছেন। তাঁদের এই অগ্রগতি গোঁড়া হিন্দুদের মতো, উদারপন্থী হিন্দুদের মনেও তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

॥ ব্রাহ্মসমাজ ॥ বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ-শাসন এবং শাস্ত্র-নিয়ম অগ্রাহ্য করবার জন্য রামমোহনই প্রথম নির্দেশ দিলেন। শাস্ত্র-বিধির কড়া শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তি-নির্ভর ব্যক্তি-স্বাধীনতাই ছিল রামমোহনের মূল মন্ত্র। পূর্বেই রামমোহন সম্পর্কে মন্তব্য করেছি। এখানে ধর্মান্দোলনের দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। এক সার্বজনীন ঈশ্বরের উপাসনা এবং জীবের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর মতে প্রকৃত ধর্ম। এই বিশ্বজনীন ধর্মকে জাতীয় আকারে প্রচার করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই জন্য তিনি হিন্দু-শাস্ত্র অবলম্বন করে হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেছেন, খৃষ্টান-শাস্ত্র অবলম্বন করে খৃষ্টানদের এক ঈশ্বরের বাণী শুনিয়েছেন, মুসলমান-শাস্ত্র মন্থন করে এক ঈশ্বরের কথা বলেছেন। খৃষ্টধর্মকে অন্যান্য ধর্মমত অপেক্ষা নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় উন্নতির বেশি অনুকূল

বলে স্বীকার করলেও এবং সেমীয় একেশ্বরবাদের পক্ষপাতী হলেও তিনি ব্রাহ্মণ্যসংস্কার বর্জন করতে পারেন নি। পরধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও তার প্রভাব স্বীকার না করে তিনি নিজের মতের পক্ষে বেদান্ত থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও রামমোহন নিজেকে পুরোপুরি হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। তিনি পিতার শ্রাদ্ধ করেছিলেন হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী। যাই হোক্, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'আত্মীয়-সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন রামমোহন। শাস্ত্রীয় আলোচনা, বেদ-পাঠ, ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হতো এই সভায়। কিন্তু দলাদলির ফলে সভা শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' নামক একটি সভা স্থাপন করেন তিনি। সেখানে খৃষ্টীয় মতে উপাসনা হতো। পাদ্রি অ্যাডাম সাহেব তাঁর সহায়ক ছিলেন। এই সোসাইটিও যখন বিশেষ চলল না, তখন তিনি একটি উপাসনা-সভা স্থাপন করলেন। এর নাম 'ব্রাহ্মসমাজ'। সাধারণে একে বলতো 'ব্রাহ্মসভা'। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনা করতে পারতো। কিন্তু 'ধর্মপ্রচারক' অর্থে যা বোঝায় তা রামমোহন ছিলেন না। তিনি একটি যুগোপযোগী ধর্মমত সংকলন করেছিলেন এই মাত্র। তুলনামূলক দর্শনের অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন ধর্ম-সম্প্রদায় তিনি স্থাপন করেন নি।

তাঁর মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) অন্যতম। রামমোহনের সংস্পর্শেই দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভাবের উন্মেষ হয়। উপনিষদ থেকেই তিনি প্রথম সত্যের আলোক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) স্থাপন করেছিলেন। এই সভার কার্যকে সিদ্ধ করবার জন্য তিনি তিনটি উপায়ের উদ্ভাবন করেন। ১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ৩। শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা ও প্রচার। অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মমত গঠনে কেবল প্রাচ্যের দর্শনগুলিই পড়েন নি, তিনি স্কচ দার্শনিকদের রচনা, বেন্থাম থেকে মিল পর্যন্ত ইউটিলিটেরিয়ানদের দর্শন এবং কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। দ্বৈতবাদ থেকে অদ্বৈতবাদের ধারণায় পৌঁছতে হেগেল দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। কিন্তু পুরোপুরি অদ্বৈতমুক্তি তিনি চান নি। কারণ তাতে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কর্তৃত্ব

ও ক্রমিক উন্নতির অবকাশ থাকে না। তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কর্তৃত্বের ধারণায় কাণ্টের The Principle of Autonomy of the Will-এর প্রভাব এবং আত্মার ক্রমিক উন্নতির ধারণায় হেগেলের Dialectics-এর প্রভাব আছে। অন্য দিকে ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে স্থান দিলেন দেবেন্দ্রনাথ। রোম্যান্টিক চেতনার উদ্গাতা রুশো, কাণ্ট এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতি-সংস্পৃষ্ট নতুন বোধ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখা গেল। তার সঙ্গে এলো মরমিয়াবাদ, নানকের দোহা, তুকারামের অভঙ্গ, সাদী-হাফেজের বয়েত। এই সব কিছু মিলে মহর্ষির হৃদয়-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করলো। মহর্ষির সাধনায় বাঙলা দেশের রোম্যান্টিক সাধক-কবিকুলের পথ তৈরি হয়ে গেল।

দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মানতেন। এই নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লাগলো। শেষে বেদ যে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয় এইটিই প্রমাণিত হলো। কিন্তু সভার অন্যান্য সভ্যদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেবেন্দ্রনাথকে পীড়িত করলো। শেষ পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তুলে দিয়ে 'ব্রাহ্ম সমাজ'এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হলো (১৮৫৯)।

দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক যে দু'জন ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৩) এবং রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। পরবর্তী যুগে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে ব্রাহ্ম আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাইবেল থেকে জীবনের উচ্চতর সত্যগুলি তিনি পেয়েছিলেন। ইংরেজ জাতির ইতিহাস ও ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান তাঁকে সহায়তা করেছিল। শেক্স্পিয়ার, মিণ্টন, ইয়ং ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সিঁদুরেপটিতে তিনি ব্রহ্ম বিদ্যালয় খুলে ইংরিজি ভাষায় ধর্মশাস্ত্র পড়াতে লাগলেন। মরেল, কাজিন, হ্যামিণ্টন, পার্কার, নিউম্যান ছিলেন কেশবচন্দ্রের ধর্মগুরু। ইউনিটেরিয়ানদের সঙ্গে [যেমন, নিউম্যান] তাঁর পত্রালাপ চলতো। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য ধর্মশাস্ত্র এ দেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে কেশবচন্দ্র 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন এবং তার মুখপত্র 'নববিধান' (১৮৮০) প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম উপাসনায় ভক্তিভাবের কীর্তন গানের প্রচলন করে পুরাতন হিন্দু সমাজের সঙ্গে নতুন ব্রাহ্ম সমাজের বন্ধন ঘনিষ্ঠ করে তোলেন।

॥ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ॥ উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন রামমোহন হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর নতুন মত ঘোষণা করেন তখন তাঁর অনুসারী

ছিলেন অল্প কয়েকজন। হিন্দুধর্মের স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সেই জন্য স্যার হাইড ইস্ট যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সভা ডাকলেন এবং অন্যতম সভ্য হিসাবে রামমোহন রায়ের নাম করলেন তখন গোঁড়া হিন্দুরা সহযোগিতা করতে নারাজ হলেন। ফলে রামমোহন সরে এলেন। তারপর রামমোহনের নতুন মতকে ব্যঙ্গ করে গোঁড়া হিন্দুরা গান বাঁধলেন। খৃষ্টান মিশনারিদের কার্যকলাপেও গোঁড়া হিন্দুরা বাধা দিয়েছিলেন। ডিরোজিওর নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে যখন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা হিন্দু ধর্মকে অমান্য করতে লাগলেন তখনও ধর্মরক্ষায় সচেতন হিন্দুরা ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করালেন। তারপর ডাফ সাহেব যখন প্রমথনাথ দেবকে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে আহ্বান করলেন তখন জোড়াবাগানে মথুরামোহন সেনের বাড়ীতে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল।

রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রথম সংঘবদ্ধ হয়ে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ধর্মসভা স্থাপন করলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সম্পাদক ছিলেন। সহমরণ প্রথা-নিবারণ-আইনের প্রতিবাদ করার জন্য এই সভা স্থাপিত হলেও নানাভাবে হিন্দু ধর্মের স্বার্থরক্ষা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এর মুখপত্র ছিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রক্ষণশীল হিন্দুরা সাধারণভাবে ইংরিজি শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু ইংরিজি শিখে স্বধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করাকে তাঁরা সমর্থন করতেন না। 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছিলেন যে, বাঙলা-দেশে অনেক মনীষী ভালোভাবে ইংরিজি শিখেও স্বধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নি। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রসময় দত্ত, ভোলানাথ সেন, কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দুরা ভালো ইংরিজি জেনেও নাস্তিক হয়ে যান নি। 'সমাচার চন্দ্রিকার' মতো ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'ও এই মতাবলম্বী ছিল। ইংরিজি শিখে হিন্দু ছাত্রেরা যাতে ফিরিঙ্গির মতো পরিচ্ছদ না পরে এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহার ত্যাগ না করে তার জন্য প্রভাকর কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দিত। ইয়ং বেঙ্গলের অনাচার ও নাস্তিক মনোবৃত্তিকে কটাক্ষ করে গুপ্ত কবি লিখেছিলেন[১৭] :

সোনার বাঙ্গাল করে কাঙ্গাল
ইয়ং বাঙ্গাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে
কানে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা।

এরা না হিন্দু, না 'মোছলমান'
ধর্ম ধনের ধার ধারে না।
নয় 'মগ', 'ফিরিঙ্গী' বিষম 'খিঙ্গী'
ভিতর বাহির যায় না জানা;
ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোনা জল ঢোকালে ঘরে
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।

ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা বাঙলা কাব্যে ব্যঙ্গরস ফুটিয়ে তুললো।

এই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অনেকগুলি মুখপত্র ছিল। তার মধ্যে 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' (১৮৩৬), 'সত্যধর্ম-প্রকাশিকা' (১৮৪৯), 'সর্বশুভকরী' (১৮৫০) 'অক্ষয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা' (১৮৫৬), 'হিন্দু বন্ধু' (১৮৫৭), 'হিন্দুরত্নকমলাকর' (১৮৫৭) এবং 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) উল্লেখযোগ্য। 'সর্বশুভকরী' পত্রিকাটি প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে (১৯০৮) লিখেছেন[১৮]:

'ইনি (মদনমোহন তর্কালঙ্কার) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বশুভকরী নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।'

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) নানাভাবে হিন্দুধর্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশপ্রেম ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্ম-প্রাণতার এক শুভ মিলন দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের কাছে হিন্দুদের কি শিক্ষা করা প্রয়োজন তা তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তখনকার নব্য শিক্ষিতদের মতো ইংরেজদের সব কিছু অনুকরণ করবার প্রবৃত্তিকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' বইয়ের একস্থানে তিনি লিখেছেন[১৯]:

'ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে আমাদের আদর্শ-স্থলাভিষিক্ত করে।...ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা

পাইবার কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে।'

বিদ্যাসাগরের প্রতি ভূদেবের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহের আন্দোলনে ভূদেব সমাজে ক্ষতির আশঙ্কা করতেন। তিনি মনে করতেন বিধবা-বিবাহ প্রবৃত্তি-মার্গের অনুকূলে এবং নিবৃত্তি-মার্গ ও সংযমের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। বাল্য বিবাহকে তিনি সমর্থন করতেন, কিন্তু বহু বিবাহের সমর্থক ছিলেন না। প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও তিনি পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের দাস ছিলেন না।[20] বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষার উন্নতির জন্যই সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে তার মৈত্রীবন্ধনও প্রয়োজন। তাঁর এই ইচ্ছাটি Notes on the Sanskrit College শীর্ষক তাঁরই স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ খসড়া প্রস্তাবের কয়েকটি অনুচ্ছেদে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে (১৮৫২, ১২ই এপ্রিল)। তাব থেকে প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দেওয়া গেল :

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education of Bengal.

2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant, expressive, idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanskrit scholars. Hence the necessity of making Sanskrit scholars well-versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present impossible for them, even if they make

Sanskrit their after-study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanskrit College be made familiar with English Literature they will prove the best and able contributors to an enlightened Bengali Literature.]

বিদ্যাসাগর রচিত এই খসড়া থেকে বোঝা যায় মাইকেলের মতো কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাবের মানসিক ক্ষেত্রটি কীভাবে প্রস্তুত হয়েছিল।

শুধু ব্যবহারিক মূল্যের মাপকাঠিতে প্রাচ্যদর্শনকে মেপে বিদ্যাসাগর তার মূল্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব তিনি মানতেন না' যদিও নিজের মত প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রবাক্য তিনি উদ্ধার করতেন। এই দিক থেকে ইয়ং বেঙ্গলের সংস্কার-প্রয়াসীদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহু-বিবাহ নিরোধ ও বাল্য-বিবাহ নিরোধ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের অসামান্য প্রচেষ্টার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিধবা-বিবাহের সমর্থকদের যে তালিকা তৈরি হয়েছিল তাতে ঈশ্বর গুপ্তের নামও পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেই সময়কার ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনকে বিশেষ সহানুভূতির চোখে দেখতেন। তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'তিনি ব্রাহ্মসমাজেই জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের আশা ভরসা করিতেন।' [পৃ. ৫৩০] কোনো ধর্মমত, শাস্ত্র বা দেশাচার তাঁর কার্যাবলীকে পরিচালিত করেনি। তাঁর ভ্রাতাকে তিনি লিখেছিলেন[২১]:

> 'আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম পর্যায় শেষ হবার পর সমাজ-দর্শন চর্চা ছেড়ে হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনায় ঝুঁকে পড়েন। প্রথমে তাঁর নজর পড়ে সাংখ্যদর্শনের দিকে। কারণ ইয়োরোপীয় দর্শনচিন্তার সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের সাদৃশ্য রয়েছে। সাংখ্যদর্শন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পূর্ববর্তী গুরু কোঁতের প্রভাব কিছু কমলেও সম্পূর্ণ দূর হয় নি। কোঁতের দৃষ্টিতে তিনি হিন্দু শাস্ত্র ও কৃষ্ণ চরিত্রের আলোচনা করতে লাগলেন।

ঈশ্বরকে বঙ্কিমচন্দ্র চরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত মানুষ বা অবতার শ্রীকৃষ্ণের আদর্শে ভেবেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের যে বাণী—নিষ্কামকর্ম ও লোকহিত—তাতেই বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের আদর্শ দেখিয়েছিলেন এবং সেই আদর্শকে পাশ্চাত্ত্য বিচার-পদ্ধতির দ্বারা পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তার ফলেই 'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' বচিত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে' ও 'প্রচারে' ধর্ম, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্য-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ তাঁর প্রকাশিত হতো। এছাড়া রাজনারায়ণ বসু, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইত্যাদি লেখকগণ হিন্দু ধর্মকে সমর্থন করে নানা প্রবন্ধও লিখতেন।

সমাজ: ইংরেজ রাজত্বের সূচনা থেকেই ভাবতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার নিদারুণ অবস্থার প্রতি ইংবেজদের দৃষ্টি পড়েছিল। হেষ্টিংসের শাসনকালে সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত হয়। সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি এক আইন প্রণয়ন করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে এই আইন প্রণীত হয়। ৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রগতিশীল হিন্দু সম্প্রদায় সতীদাহনিবারণের জন্য হেষ্টিংসের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় নি। লর্ড আমহর্স্টের শাসনকালে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ-নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের পিছনে দেশের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকবণের সহযোগিতা ছিল। জে. পেগ্‌স্‌ রচিত **The Suttee's Cry to Britain** বইটি (১৮২৮) দেশেব জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সতীদাহ নিবারণের জন্য যে সচেষ্ট হয়েছিলেন তার প্রেরণামূলে ছিলেন বামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুব প্রভৃতি মনীষিগণ। আগেই বলেছি, সতীদাহ সমর্থন করে 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সে সভা ব্যর্থ হয়েছিল শুধু এই কাবণে যে, রক্ষণশীল সমাজেরই একটি শক্তিশালী অংশ এই প্রথাব বিরুদ্ধে ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন এই দলে।

কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে 'ধর্মসভা'র বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছ্বাসকে এই সভা সংযত কবেছিল। ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের অপসারণের পিছনে এই সভার সভ্যদের হাত অনেকখানি ছিল। বিদ্রোহী মতবাদ পোষণের জন্য যেমন ডিরোজিও অপসারিত হয়েছিলেন, তেমনি নৈতিক অধঃপতনের জন্য রিচার্ডসনকেও হিন্দু কলেজ থেকে সরে যেতে হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সুরাপান-নিবারণের জন্য এক সমিতি স্থাপন করেন প্যারীচরণ সরকার। এই নিবারণ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র,

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ইত্যাদি সকলেই যোগ দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ ইত্যাদি অনেকেই প্রথম জীবনে মদ্য পান করতেন, পরে তা বন্ধ করেন।

এই যুগের বড়ো এবং উল্লেখযোগ্য সামাজিক আন্দোলন হলো বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন এবং তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ংবেঙ্গল এবং প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের সমর্থন পেয়েছিলেন। দেশের মধ্যে এই আন্দোলনের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর'-গ্রন্থে[২২] :

"শান্তিপুরে 'বিদ্যাসাগর পেড়ে' নামক এক প্রকার কাপড় উঠিয়াছিল, তাহার পাড়ে এই গান লেখা ছিল :

সুখে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল আর কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে।'

সমর্থকদের তালিকায় নাম থাকলেও ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করেন নি[২৩] :

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর—
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের 'কুলতরী'—
অকূলেতে কূল পেলে না।
কূলের তরী থাকলে কূলে—
কূলের ভাবনা আর থাকে না।

ব্যঙ্গ করে তিনি আরও লিখলেন :

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।

ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধবাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা—
জ্ঞান হারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে।
কে পড়িবে 'সংবাপ' মায়ের কল্যাণে ॥

দাশরথি রায় গুপ্ত কবিকে কটাক্ষ করে লিখলেন[২৪] :

'ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে, নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।'

শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দেব ২৪শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই বছরেই বহু-বিবাহ-বিষযক আন্দোলনের সূত্রপাত কবেন বিদ্যাসাগব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ উৎসাহী হলেও শেষ পর্যন্ত কিছু করেন নি। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সামাজিক উন্নতিবিধায়িনী সমিতি' বিদ্যাসাগবের পূর্বেই বহুবিবাহ নিবারণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে একটি আবেদন প্রেরণ করে। এই সভা বিদ্যাসাগরেব বিধবা-বিবাহ বিষযক আইন বিধিবদ্ধ করতেও সাহায্য করেছিল। বাল্য-বিবাহের বিপক্ষেও বিদ্যাসাগর সচেষ্ট ছিলেন।

জাতিভেদ নিয়েও এই সময়ে বিভিন্ন আলোচনার সূত্রপাত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করতেন যে, জাতিভেদ প্রথাকে জোর করে ওঠাবার প্রয়োজন নেই, ধীবে ধীরে আপনা থেকেই ওঠে যাবে। রাজনারায়ণ বসু জাতিভেদ প্রথার স্বপক্ষে ছিলেন, কারণ তাঁব মতে দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রবাহ রক্ষা করলে লোকসমাজেরই উপকার হয়।

স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রচেষ্টাব কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় বেথুন সাহেব 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করে স্ত্রীশিক্ষার পথ সুগম কবেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কালীকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। গুপ্তকবি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় নারী জাতির প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিব প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'সাম্যে'র পঞ্চম অধ্যায় রচিত হয়েছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Subjection of Women' বইটির ওপর ভিত্তি করে। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার এবং রবীন্দ্রনাথ—উনিশ শতকের সমস্ত

উল্লেখযোগ্য কবিই নারী-কেন্দ্রিক বিশিষ্ট ভাবনাগুলিকে তাঁদের কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

ইংরেজ শাসনের আগে বাঙলা দেশে স্থানীয় শাসনকর্তারা বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে থেকে স্বাধীনতা ভোগ করতেন। সংঘবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা না থাকার ফলে ইয়োরোপীয় শাসন-ব্যবস্থা, ভাবনা ও চিন্তাধারা এদেশে সহজে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। উনিশ শতকের বাঙলা দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন শ্রেণীবিন্যাস দেখা গেল। শিল্প বিপ্লবের তরঙ্গের আঘাতে গ্রামাঞ্চলের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে গেল। নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির পতাকা উড়তে লাগলো কলকাতায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনে নতুন জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হলো। বণিক, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক এই নতুন শ্রেণীবিন্যাস দেখা গেল। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং ধনিক শ্রেণীর সাচ্ছল্য কমে যাওয়ায় শ্রেণী-বিরোধ দেখা দিল এবং অনিবার্যভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার দেখা গেল।[২৫] বিংশ শতকে ওই সংগ্রাম আরও ব্যাপক রূপ নিল।

রাজনীতি: রামমোহন রায়ের মধ্যেই আমরা রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ দেখতে পাই। এই চেতনা তাঁর এত গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, অন্য দেশের স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে তিনি গৌরব বোধ করতেন। ইংরেজ সরকার যখন নানাভাবে এ দেশের অধীনতার পাশ দৃঢ় করছিলেন তখনই রামমোহন বলেন[২৬]:

> I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducting innumerable divisions and subdivisions among them, has entirely deprived them of political feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them for undertaking any difficult enterprise. It is, I think, necessary that some changes should take place in the religion at least for the sake of their political advantage and social comfort.

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও রামমোহন বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য যখন লাইসেন্স নেবার হুকুম দেন সরকার, তখন প্রতিবাদ করে রামমোহন মিরাৎ-উল আখবার বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যই তিনি লেখেন : **Memorial of the Supreme Court** (১৮২৩) এবং **Appeal to the King in Council** (১৮২৫)। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার চার্লস গ্রের রায়ের বিরুদ্ধে উত্তরাধিকারত্বের নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদে প্রিভিকাউন্সিল সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তিকে রহিত করেন। এছাড়া লাখেরাজ ভূমি-বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে এবং জুরিপ্রথা প্রবর্তনের জন্য তাঁর আন্দোলনও স্মরণীয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে যে সভা হয় তার উদ্দেশ্য ছিল চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য অব্যাহত রাখা এবং ইয়োরোপীয়ানদের ভারতে বসবাসের বাধা দূর করার জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করা। সে সভায় রামমোহন বলেন যে, উন্নততর জাতি ইয়োরোপীয়ানদের সংস্পর্শে এসে আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটবে।

হিন্দুকলেজের শিক্ষার মধ্য দিয়েও রাজনৈতিক চেতনা বিশেষ ভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ডিরোজিওর শিক্ষায় ও প্রেরণায় ছাত্ররা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রণী। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে এঁরাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র স্বদেশপ্রেমিক কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ বেঙ্গল অ্যানুয়াল, ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, লিটারারি গেজেট ইত্যাদিতে কবিতা লিখতেন।

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র মতো উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য বেশির-ভাগ সভাই রাজনৈতিক কার্যে আত্মনিয়োগ করে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'রই পরিণত রূপ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। ওই বছরই দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার প্রধান সভ্য জর্জ টমসনকে এদেশে নিয়ে আসেন। তিনি এখানকার সভার সভাপতি হন। সম্পাদক হন প্যারীচাঁদ মিত্র। এই সোসাইটির মুখপত্র ছিল 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'। এই সোসাইটি বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংঘ

স্থাপিত হয়। সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে ভারত-শাসন সম্পর্কে আবেদন করা হয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু প্রেরণা এতে ছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির শাসন-নীতির আদর্শে ভারতে স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যপদে ভারতীয় নিয়োগের আবেদন জানানো হয় (১৮৫৩)। অনেকটা এই আবেদনপত্রের প্রভাবেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় ভারতের শাসনভার তাঁর হাতে চলে যায়। একজন ভারতসচিব ও তাঁর পরামর্শ সভা নিযুক্ত হন।

এরই এক বছর আগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে। অনেকে এই বিদ্রোহকে বলেন ভাবতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু প্রধান নগর কলকাতায় এর তেমন প্রকোপ ছিল না। বাঙালী মুসলমানকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও শিক্ষিত বাঙালির কাছে এই বিদ্রোহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহীদের কৃতঘ্ন কাজ বলেই গৃহীত হয়েছিল। মুসলমানেরা যে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল তার কাবণ ওয়াহবি আন্দোলনের সঞ্চিত বিক্ষোভ। ১৮৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রামগোপাল ঘোষ এই অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) প্রকাশের পর এই প্রতিবাদ আন্দোলন আরও তীব্র হয়।

ব্ল্যাক অ্যাক্ট্স্ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন বিশেষভাবে বেথুন সাহেব ও রামগোপাল ঘোষ। বেথুন সাহেব এই আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। রামগোপাল বলেন[২৭] :

> **Publicmen in England, I feel persuaded, would rather see the British residents generously cast in their lot with the natives of the land, striving with one united effort to obtain remedies against wrong and oppression.**

পরে শতাব্দীর অষ্টম দশকে ইলবার্ট বিলের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আবার ওঠে (১৮৮২), এবং লর্ড রিপনের হস্তক্ষেপে এই দাবি সফল হয়। এই ইলবার্ট বিল ভারতের জাতীয়তার একটি বিশেষ প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। লর্ড লিটনের প্রবর্তিত **Vernacular Press Act and Arms**

Act (১৮৭৮) যে অসন্তোষ জাগিয়েছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে এবং ভারতীয়কে নিরস্ত্র থাকার আইন করে তা তীব্রভাবে প্রকাশিত হলো লর্ড রিপনের আমলে।

সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে যে মানুষটিকে কেন্দ্র করে জাতীয় বা ন্যাশানাল ভাব উদ্দীপ্ত হয়েছিল তিনি হলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। তাঁবই এক সহযোগী নবগোপাল মিত্র জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ছাপাখানা এবং জাতীয় ব্যায়ামাগার খুলে 'ন্যাশানাল মিত্র' হিসাবে সুপরিচিত হলেন। রাজনারায়ণ, নবগোপাল এবং জ্যোতিবিন্দ্রনাথ—এঁদেরই উৎসাহে দেশহিতৈষীদের সভা প্রতিষ্ঠিত হলো (১৮৬৫) এবং একটি বার্ষিক মেলা—'হিন্দু মেলা'র প্রবর্তন করলেন (১৮৬৭)। এতে মনোমোহন বসুর জাতীয় উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা, জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় শিল্প দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর আয়োজন হতো।

এই স্বদেশী চেতনার প্রসারেব যুগেই নতুন বাঙলা কাব্যের কবিদের আবির্ভাব এবং এই স্বদেশপ্রেম-চিন্তা (নিষ্ক্রিয় হোক বা সক্রিয় হোক) নবাগত কবিদের কাব্যেব কেন্দ্রীয় ভাব বস্তু। ঈশ্বব গুপ্ত, রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সকলেই এই স্বদেশী ভাবে অল্পবিস্তব উদ্বুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এই হিন্দু মেলাতেই। তাঁর প্রথম স্বনামে মুদ্রিত কবিতা 'হিন্দু মেলাব উপহাব' হিন্দু মেলাব বার্ষিক উৎসবেই পঠিত হযেছিল (১৮৭৫)।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিযেশন' স্থাপন করলেন। তাঁব সহযোগী হলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এই সভাব সভাপতি। ভারতীয় জনমত গঠনে এই সভা বিশেষ উদ্যোগী হলো। এই সভা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব-ভাবত জাতীয় সম্মেলনে পরিণত হলো, অ্যালবার্ট হলে। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হলো কলকাতাতেই ১৮৮৫-র ডিসেম্ববে। ঠিক ওই সময়েই বোম্বাইতে এ ও. হিউমের আহ্বানে জাতীয় কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা হলো। ১-৮৬ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ও জাতীয় সম্মেলন একীভূত হলো। ১৮৯৬-এব কংগ্রেস অধিবেশনে একটি শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো। তাবপর থেকে এটি অধিবেশনের অঙ্গ হয়ে গেল। শিল্প ব্যাপারে জাতীয় প্রগতির মোটামুটি পরিমাপ করা হতে লাগলো। ১৮৯৭এর অমরাবতীতে যে কংগ্রেস বসলো তাকে অশ্বিনীকুমার

দত্ত 'তিন দিনের তামাসা' বলে অগ্রাহ্য করলেন এবং কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ঘটছে না বলে অভিযোগ জানালেন। ইতিপূর্বেই শ্রমিক শ্রেণীর স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্রে তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার দাবী করেছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সতীশ মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করলেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ শিল্প-বিজ্ঞান চর্চার জন্য সমিতি স্থাপন করলেন যাতে বাঙালী তরুণ বৃত্তি পেয়ে বিদেশ থেকে কারিগরী বিদ্যায় উন্নতজ্ঞান নিয়ে এদেশে আসতে পারে। ১৯০৫এর সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কার্জন বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ওপর বিরূপ মন্তব্য করায় তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। ২০শে জুলাই বঙ্গ বিভাগ ঘোষিত হলো। ওই দিনই 'সঞ্জীবনী' পত্রে কৃষ্ণকুমাব মিত্র ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শ উচ্চারণ করে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আবেদন জানালেন। নব পর্যায়েব বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রতি জোর দিলেন। উত্তেজনা ক্রমে বাড়তে লাগলো। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে ব্রতী সমিতি, বন্দেমাতরম-গোষ্ঠী, সনাতন সম্প্রদায় আন্দোলন চালাতে লাগলো। বঙ্গ বিভাগের দিনটিতে রাখীবন্ধন উৎসব প্রতিষ্ঠিত হলো। রাখীবন্ধনের মধ্য নিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ ও জাতিগত ঐক্য প্রচার করা হতে লাগলো। ওই দিনই বিকালে অখণ্ড বাঙলার প্রতীক হিসাবে ফেডাবেশন হলের প্রতিষ্ঠা করলেন আনন্দমোহন বসু। এর পিছনে ফরাসী বিপ্লবের ফেডারেশন উৎসবের স্মৃতি জাগরূক ছিল। যাই হোক, নানাভাবে স্বদেশী শিল্প, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা চলতে লাগলো। ছাত্র সমাজকে আন্দোলনে আহ্বান করলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। 'জাতীয় শিক্ষা পবিষদ' স্থাপন হলো ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে। সারা বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় জাতীয়তাবাদের প্রচার চললো। বরিশালে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী সঙ্গীত জনসাধারণকে আকৃষ্ট কবলো।

পূর্ববঙ্গ সরকার বন্দেমাতরম্ ধ্বনিকে বে-আইনী ঘোষণা করেছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে এই আইন অমান্য করা স্থির হলো। ক্রমশঃ স্বদেশী আন্দোলন চরমপন্থীদের হাতে গিয়ে পড়লো। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেই তিলক এলেন কলকাতায়। শিবাজী উৎসব পালিত হলো। সরলাদেবী 'বীরাষ্টমী' নামে যুব উৎসব সম্পন্ন করলেন।

এই সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) তরুণদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা তরুণদের উত্তেজনার খোরাক

জোগালো। তারপব দেখা দিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'অনুশীলন' সমিতির মধ্য দিয়ে চরমপন্থী তরুণেরা তাঁদের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে লাগলেন। নানা অভিযোগে এঁরা তিনজনেই কারাবরণ করলেন। চরমপন্থীরা এর পর হিংসাত্মক পথ নিলেন। মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণে দু'জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা প্রাণ হারালেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মঘাতী হলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন (১৯০৮, আগষ্ট)। যে মাসে মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার করলে পুলিশ।

স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান শ্রেণীর কিছু লোককে দলে টানতে পারলেও সাধারণ মুসলমান সমাজকে হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণী দলে আনতে পারে নি। এই অক্ষমতার দাম দিতে হলো। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গেব পক্ষেই রয়ে গেলেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে এক মুসলিম প্রতিনিধিদল লর্ড মিণ্টোর কাছে গিয়ে পৃথক নির্বাচন-মণ্ডলীর জন্য আবেদন জানালেন (১৯০৬)। ১৯০৯-এর মর্লি-মিণ্টো সংস্কাবে মুসলমানশ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচন-মণ্ডলীর ব্যবস্থা হলো। ১৯১১-এর দববারে বাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গচ্ছেদ বদ কবা হলো। রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তবিত হলো। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদেব কার্যকলাপ কমলো না। দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জ আক্রান্ত হলেন (১৯১২)। ১৯১৪তে প্রথম মহাসমব আরম্ভ হলো। কংগ্রেস মধ্যপন্থীবা যুদ্ধের সময়ে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করতে লাগলেন। কিন্তু চবমপন্থীরা কংগ্রেসে একটা ঐক্য চাইছিলেন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে কংগ্রেস ও লীগেব যৌথ সংবিধান রচনা এই প্রথম এবং শেষ। ১৯১৮তে বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থীদের বিচ্ছেদ হযে গেল। চরমপন্থীরা কর্তৃত্ব পেলেন কংগ্রেসের। ১৯১৯ সালে রাউলাট বিল পাশ হোল। জাতীয় আন্দোলনের নতুন নেতারূপে দেখা দিলেন গান্ধীজী। ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলো (১৯২০)। তারপর সাতাশ বছর ধরে নানা প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের পর স্বাধীনতা এলো (১৯৪৭)। ইতিমধ্যে আর একটি মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) ঘটে যাওয়ায় জীবন সম্পর্কে আমাদের মূল্য বোধ অনেকখানি পাল্‌টে গেল।

শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতির ক্ষেত্রে দেড় শতাব্দী ব্যাপী এই ইয়োরোপীয় সংস্রব ও প্রতিক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সংহত করতে পারি[২৪] :

'যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলেম তা নয়। আমরা পেয়েছিলেম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল মোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে মনোভাবটা নূতন। য়ুরোপের সংগ্রামে একদিকে সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা আর একদিকে ন্যায় অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশ, কোনো প্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্বেও আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে যে কোনো চেষ্টা করছি সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে এবং যে সকল দাবী আমরা কোনোদিন মোগল সম্রাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি, তাই নিয়ে প্রবল রাজ-শাসনের সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে যে তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে।—'A man is a' man for a that।'

---

১. The annals of the College of Fort William, from the period of its foundation, by His Excellency the Most Noble Richard Marquis Wellesley ; K. P. on the 4th May, 1800 to the present Time : Calcutta, 1919।

২. Western Influence in Bengali Literature . P. R. Sen. (1932) Chapter III. page 57-58।

৩. Western Influence in Bengali Literature · P. R. Sen, (1932) Chapter III, Page 59। ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর Bengali Literature in Nineteenth Century গ্রন্থেও এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন। পৃ. ১১২ পাদটীকা।

৪. Bengali Literature in the Nineteenth Century. Page 75।

৫. বাংলার নব্যসংস্কৃতি : যোগেশচন্দ্র বাগল

৬. Henry Derozio, The Eurasian Poet, Teacher and Journalist, Calcutta, 1884. পৃ. ৩২.

৭. বিদ্রোহী ডিরোজিও : বিনয় ঘোষ পৃ. ৫৩।

৭ক. জন লক (১৬৩২-১৭০৪) তাঁর An Essay Concerning Human Understanding (১৬৯০) বইতে রোম্যান্টিসিজমের সূত্রনির্দেশ করে গেছেন বলেই মনে হয়। বিশেষতঃ যা অদৃশ্য তাও যে মানুষের সৃষ্টিক্ষমতাব আওতায় পড়ে এটাই লক জোর দিয়ে বলেছেন। জন লক এবং সমকালীন আরেক জন—টমাস বার্নেট আরও একটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে পুরাণ—স্বর্গ, স্বর্ণযুগ, বন্যা কিংবা ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি করে তা শুধু প্রাচীন সাহিত্য থেকে ধার করা কোনো চিত্রকল্পনা নয়, পুরাণ মানুষের চিরপ্রবহমান চিরবর্তমানের সঙ্গী। তা চিরকালই সক্রিয। তাকে নতুন করে উজ্জীবিত করা যায়। এখানে পুবাণের অর্থ 'পুবা অপি নব ইতি।' অর্থাৎ যা পুরনো হয়েও নতুন। পুরাণের এই নবীনতা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী বা কীট্সের কবিতায় যেমন প্রমাণিত, রবীন্দ্রনাথেও তেমনি।

৮. Poems by H. Derozio. Intro. by F. B. Bradley. Brit Humphrey Milford · Oxford University Press. Page : xlvi-xlvii.

৯. Poems by Derozio page xxxiii-xxxiv.

১০. বিদ্রোহী ডিবোজিও : বিনয় ঘোষ। পৃ. ১৪।

১১. Western Influence in Bengali Literature, P. R. Sen, Page 83-84.

১২. Recollection of Alexander Duff. Lalbehari Dey : পৃ. ২৮।

১৩. Recollection of Alexander Duff. Page 166-176

১৪. Calcutta Review, 1881. 'Henry Louis Vivian Derozio দ্রষ্টব্য।

১৫. Alexander Duff : Thomas Smith : London, 1883.

১৬. সাময়িকপত্রে বাঙ্গালার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড : বিনয় ঘোষ।

১৭. ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, পৃ. ১৩৫। বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

১৮. আত্মচরিত, কলিকাতা, ১৯০৮, পৃ. ৩৩।

১৯. সামাজিক প্রবন্ধ : ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৭। পৃ. ৮৮-৮৯।

২০. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ : বিনয় ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪৩৪-৪৪৯

২১. বিদ্যাসাগর জীবন চরিত : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ১৮৯১, পৃ. ২১০।

২২. বিদ্যাসাগর : বিহারীলাল সরকার, কলিকাতা, ১৮৯৫।

২৩. ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী, পৃ. ১১৭। এ ছাড়া সজীবকুমার বসু রচিত 'ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। গুপ্ত কবি সম্পর্কে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

২৪. দাশরথি রায়ের পাঁচালি, [১৯০১], পৃ: ১৯৫৯।

২৫. এই শ্রেণীচেতনার প্রকাশ আমাদের আলোচ্য কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' বইএর (১৩১৪) 'রাজা' কবিতায় দেখা গেছে। পরে এই শতকের চল্লিশের দশকে (১৯৪১) সাম্যবাদী প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কবিতায় দেখি শ্রেণীবিন্যাসের কৃত্রিম বন্ধনের মধ্যে কবি অস্বস্তি বোধ করেছেন। উচ্চসমাজের মঞ্চের 'সংকীর্ণ বাতায়নে' বসে তিনি সর্বত্রগামী না হতে পারার জন্য আক্ষেপ করেছেন। কৃষাণের শরিক যে কবি তাকে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে pose না ক'রে profess করতে বলেছেন।

২৬. The English Works of Raja Rammohon Roy, Allahabad, 1906, Pp. 929-30.

২৭. Speeches of Ram Gopal Ghosh, Calcutta, 1923. P. 65.

২৮. কালান্তর, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৫, পৃ. ১৬-১৭।

দুই

প্রাচীন যুগের শেষ ও নতুন যুগের আরম্ভ

॥ অন্তবর্তীকালীন কাব্যধারা ॥

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই যেমন নতুন ভাবনা-চিন্তা বাঙলা কাব্যের আদর্শকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করতে লাগলো, তেমনি সেই নতুন ধারার পাশাপাশি আঠারো শতকের পুরোনো ধারারও জের চলছিল। এখানে সেই পুরোনো কাব্য ধারার অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ছাড়াও এই আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ এই পুরোনো ধারার কয়েকটি শাখা প্রতীচ্য সংঘাতে সৃষ্ট উদীয়মান সভ্যতার পরিবেশেই পুষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে[১]:

> 'তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলা বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যবস চাহিত না। কবিব দল তাহাদেব সেই অভাব পূরণ কবিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য ভাঙ্গিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার ও ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন ঝন শব্দে ঝংকার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠকঠক শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ রাজার মনোরঞ্জনার্থে এ এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারেব সৃষ্টি হইল।'

এই পুরোনো কাব্য ধারাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি শাখা দেখতে পাই[২]: ক) ভারতচন্দ্রের অনুসারী কবিগোষ্ঠী, খ) রামায়ণ মহাভারত ও কৃষ্ণভক্তিমূলক রচনার ধারা, গ) উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা—পদ্যে বা গদ্যপদ্যে রচিত, ঘ) রামনিধি গুপ্ত ও অন্যান্য কবির রচিত আখড়াই গানের ধারা, ঙ) কবিওয়ালা, চ) পাঁচালি, ছ) রামপ্রসাদের অনুসারী কবিগোষ্ঠী, জ) অন্যান্য গীতিরচয়িতা।

প্রথম ধারায় ভারতচন্দ্রের মতো দেবদেবী-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্য রচনায় উল্লেখযোগ্য হলেন 'গৌরীমঙ্গল' (১৮০৬-৭) রচয়িতা পৃথ্বীচন্দ্র, 'কলা কৈবল্যদায়িনী' (১৮৩১) রচয়িতা নন্দকুমার কবিরত্ন, 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা (১৮৪৪-৪৫, ১৮৬০) জগমোহন মিত্র এবং দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, 'শীতলামঙ্গল' (১৮০৯-১০) রচয়িতা নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। এঁরা সকলেই বাংলা মঙ্গলকাব্য রীতির পুরানো ঢঙটিকে কোনোরকমে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

দ্বিতীয় ধারায় উল্লেখযোগ্য রচনা হলো রামকমল দত্তের 'রামায়ণ' (১৮৪২), রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ণ' (১৮৪১), 'শ্রীরাধামাধবোদয়', 'গীতমালা', ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশীখণ্ডে'র অনুবাদ (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ আরম্ভ হয়) এবং অল্পখ্যাত কিন্তু সুলিখিত তাঁরই রচনা 'করুণা নিধান বিলাস' [স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ১৮২১ এর আগে রচিত পুস্তকের তালিকায় প্রাপ্ত]। বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ ও পদাবলী সাহিত্য, যা এই সময়ে রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণদাসের বাংলা 'ভক্তমাল' [তৃতীয় দশক], নিগমানন্দ দাসের 'পদরসসার' [প্রথম দশক], এবং কমলাকান্ত দাসের সংকলন 'পদরত্নাকর' (১৮০৭) উল্লেখযোগ্য। কমলাকান্ত দাসের কতকগুলি পদ 'কমলাকান্তের পদাবলী' নামে ১৮৮৫-তে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মেজয় মিত্র 'সঙ্গীত রসার্ণব' নামে স্বরচিত পদের যে সংকলন প্রকাশ করেন তাতে তাঁর পিতামহ পীতাম্বর মিত্রেরও কয়েকটি পদও ছিল।

তৃতীয় ধারা হলো পদ্যে বা গদ্যপদ্যে রচিত উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা-কাব্যের ধারা। গদ্য ছাড়া পদ্যেও অনুবাদ দেখতে পাওয়া যায়। অভয়াচরণ তর্কবাগীশের 'ভূপাল কদম্ব', রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের Gay's Fable বইএর অনুবাদ, নন্দকুমার রায়ের 'ব্যাকরণ দর্পণ' প্রভৃতি বই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পদ্যকাহিনী এবং গদ্য উপন্যাসের মধ্যবর্তী রচনা হলো গদ্যেপদ্যে রচিত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেম নাটক' (১৮২০) এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা' (১৮৪৪)। এ ছাড়া আগাগোড়া পদ্যে রচিত রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১৮২৮-২৯), উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের 'গোলে বেকাঅলি ইতিহাস', নন্দকুমার কবিরত্নের 'শুকবিলাস' (১৮৪৪), মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬-৩৭), বিশেষভাবে স্মরণ করার যোগ্য। পদ্যে লেখা ভবানীচরণের 'দূতী বিলাস' (১৮২৫) এবং 'আশ্চর্য উপাখ্যান'ও (১৮৩৫) এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের অনুচরদের মধ্যে যে ক'জন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাঁদের মধ্যে কুলুইচন্দ্র সেন ছিলেন অন্যতম। প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই উনিশ শতকের প্রারম্ভে খেউড়গান ওস্তাদি ঢঙে মণ্ডিত ও মার্জিত হয়ে আখড়াই নামে পরিচিত হয়। এই আখড়াই 'টপ্পা' নামে পরিচিত। নিধু-বাবু [রামনিধি গুপ্ত] কুলুইচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন এবং এই টপ্পা রচয়িতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। প্রধানত রামনিধিই (১৭৪১-১৮৩৯) এই অন্তর্বর্তীকালীন কাব্য-সাহিত্যের চতুর্থ ধারাটির উদ্বোধক। বিষয় ও বর্ণনা ভঙ্গিতে প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের অনুযায়ী হলেও তাঁর রচনা ব্যক্তিগত আবেগে, কল্পনা শক্তিতে ও প্রকাশ ভঙ্গিতে আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে মহাশয়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে[৩] :

> With the tappā-writers came an outburst of the personal element, an overflow of sensibility, an enfranchisement of tho passion and the imagination. .
>
> Regarded from the standpoint of form, their songs incline more to the old than to the new. They wrote with ease and naturalness, no doubt, but the varying measures and melodies of the coming age were not for them. In ideas and general tone also they did not venture to go beyond certain limits. They preserve in a degree the old posture and tho old manner , but in spirit and temper. if not anyting else, they hearld the new age. The contrast between them and writers like Jayanarayan Ghośal, who was almost contemporaneous, will exhibit the whole difference between the old and the new poetical instincts. They were, therefore like intermediaries between the old and the new poets and, although casting a lingering look behind, they stand at the threshold of the new age of poetry.

নিধুবাবুর সমসাময়িক শ্রীধর কথক প্রণয়গীত লিখে রসিকমহলে জনপ্রিয়

হন। পরে আখড়াই ভেঙে হাফ আখড়াই সৃষ্টি করলেন বাগবাজারের মোহনচাঁদ বসু।

পঞ্চম ধারাটি হোল কবিগানের ধারা। এই ধারায় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এই সময়ে। রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) কবিগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। খুব অল্প বয়সে তাঁকে কবিওয়ালা ভবানী বেনে তাঁর গানগুলি নিজের দলে গাওয়াবার জন্য গ্রহণ করলেন। এই দল থেকে তিনি নিলু ঠাকুর, ঠাকুরদাস সিংহ ও অন্যান্য কবিওয়ালাদের দলে যোগদান করেন। পরে তিনি নিজেই দল গঠন করেন। তাঁব বিরহের গানগুলি সেকালে সারা বাংলা দেশ মাতিয়েছিল। অন্যান্য কবিওয়ালাদের মধ্যে হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮২৪), নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮১০), নীলু ঠাকুর (?-১৮২৫) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম। পরে ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবির গান বেঁধে দিতেন।

ষষ্ঠ ধারাটি হলো পাঁচালি রচনার ধারা। দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) এই ধাবার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কৃষ্ণকমল গোস্বামীও (১৮১০-১৮৮৮) পাঁচালি এবং কৃষ্ণ যাত্রার পালা রচনা করে কীর্তনের ঢঙে গেয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানের পরিবেশে দাশরথি রায় ধর্মমূলক আখ্যান-উপাখ্যানের ওপর নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু যুগের অন্য একটি প্রবল প্রবণতা—মানবিকরস—দাশরথিব রচনার মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে। বিশেষ করে শিব বিবাহের পালা, হরধনু ভঙ্গ, দক্ষযজ্ঞ, অক্রুর সংবাদ, দ্রৌপদীব বস্ত্রহবণ ইত্যাদি পালা এই প্রবণতার প্রমাণ দেবে। প্রাচীন বিষয়বস্তুর কাঠামোয় মানবিক কৌতূহলকে অগ্রাধিকার দানে দাশরথি ভারতচন্দ্রের চেয়ে যেন একধাপ এগিয়ে এসেছেন। কৃষ্ণযাত্রার লুপ্তপ্রায় ধারাটিকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন কৃষ্ণকমল। 'স্বপ্নবিলাস' (১৮৬০) ও 'রাই উন্মাদিনী' (১৮৬১)—রচয়িতা কৃষ্ণকমল এই সময়কার সাহিত্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

রামপ্রসাদের অনুসরণে এই সময়ে যাঁরা ভক্তি-সঙ্গীত লিখেছিলেন তাঁরাই সপ্তম ধারার প্রতিনিধি। রামপ্রসাদের পূর্বে কেউ মাতৃসাধনাকে কবিত্বের আবেগে প্রকাশ করেছেন বলে জানা নেই। যাই হোক, তাঁরই অনুসরণে যাঁরা এই ধরনের গান লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং নবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি তাঁরই পরিবারভুক্ত ব্যক্তি, কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পুত্র শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র, দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (-?) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ধমান রাজসভাকে কেন্দ্র করে

কমলাকান্তের ভক্তিসঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। মহাতাব চাঁদ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত [তাঁর মৃত্যুকাল ১৮৯৮] এই শাক্ত সঙ্গীতের ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহাতাব কমলাকান্তের নিজের পাণ্ডুলিপি থেকে যে প্রায় আড়াই শত পদ মুদ্রিত করেছিলেন, ১৮৮৫ সনে কলকাতার শ্রীকান্ত মল্লিকের সম্পাদনায় তার পুনর্মুদ্রণ হয়েছিল। এই সব ভক্তিসঙ্গীতের মধ্যে শাস্ত্রীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রকাশ করা হয় নি, নৈয়ায়িকের বুদ্ধিগত কসরতও এতে নেই, এসব গানে জীবনব্যাপী ধর্মভাব-ধারণার প্রকাশ হয়েছে। এই কবিরা ভগবদ্‌ভক্তির প্রেরণায় পরিচিত জগৎ ও বিষয় থেকেই অপরিচিত সত্তার প্রকাশ অনুভব করেছেন। গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও মনে মেজাজে এই কবিরা আসলে secular, তাই ধর্মসাধনাকেও কবিত্বের আবেগে শিল্পসম্মত রূপ দিয়ে বিশ্বজনীন আবেদন আনতে পেরেছিলেন। শেষ ধারাটি হলো পৌরাণিক এবং লৌকিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রিক ছড়া-জাতীয় রচনা, অধ্যাত্মিক এবং দেহতাত্ত্বিক গানের ধারা। এই শতাব্দীতে বাউল, দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লেখা অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়েছে।

এই কাব্য-সাহিত্যের ধারা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষাকে বাংলা কাব্যে প্রয়োগ-পরীক্ষার ব্যাপারে কোন প্রতিভাবান সচেষ্ট হন নি। যেটুকু পরিবর্তন বাংলা কাব্যে দেখা যাচ্ছিল, সেটুকু যুগের পরিবর্তনে আপনা থেকেই ঘটছিল। সচেতন কোনো চেষ্টা ছিল না। নব্য শিক্ষা প্রচাবের ব্যাপারে, চিন্তাব মুক্তিতে বা ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠায়, ধর্মসংস্কারে, সমাজসংস্কাবে এবং সেই সূত্রেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে গদ্যসংস্কারে প্রতিভাবানদের যতটা মনোযোগ দেখা গিয়েছিল, কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁদের ততটা মনোযোগ দেখা যায় নি। তবে নতুন আবহাওয়ায় বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে কতকগুলি স্থূল বিষয়গত পবিবর্তন ঘটেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ক। অধ্যাত্মগীতে, খ। নীতিমূলক কবিতায়, গ। ঋতু ও প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনাময় কবিতায়, ঘ। সামাজিক রীতি বিষয়ক কবিতায়। এই যুগসন্ধির সবচেয়ে স্পষ্ট পরিচয়পত্র বহন করে আনলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ঈশ্বর গুপ্তের কাছে ঈশ্বর উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার মুক্ত ঈশ্বর। তাঁর প্রেম-প্রণয়ের কবিতা বিশুদ্ধ মানব-রসের কবিতা। তাঁর নীতিবিষয়ক কবিতার মধ্যে একজন ভোগী অথচ ঈশ্বরভক্ত মানুষের আভাস পাচ্ছি যা নতুন পরিবেশে সৃষ্ট হয়েছে বলতে পারি। জীবনের প্রেয় ও শ্রেয় যাচাই করেছেন তিনি কতকটা যেন

রামমোহন রায়ের জীবনাদর্শে—সংসারসুখ মিথ্যা নয়, ইন্দ্রিয়ের ভোগ মায়া নয়। ঋতু বা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে নিয়মবলম্বনরূপে দেখবার রীতিটিও তাঁর নবলব্ধ দৃষ্টি-প্রসূত। সামাজিক রীতিবিষয়ক কবিতা রচনার পিছনেও ছিল সেই লৌকিক দৃষ্টি ও সাংবাদিক মনোভাব যা তিনি নব্যশিক্ষিতেরা পশ্চিমী জ্ঞানসাধনা ও প্রচার-পদ্ধতি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় সুশীলকুমার দে ঈশ্বর গুপ্তের মর্ত্য-দৃষ্টিকে অভিনন্দন জানিয়ে সেই জন্যেই লিখেছেন[৪] :

> 'তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতার বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ সাধারণ মানুষ—'রঙ্গভরা বঙ্গদেশের' সাধারণ বাঙ্গালী। দেবদেবীদের মাহাত্ম্য নয়, 'পৌষ পার্বণ', 'তপসে মাছ', 'পাঁঠা', 'আনারস', 'বড়দিন' প্রভৃতি দৈনন্দিন বাঙ্গালী জীবনের অকিঞ্চিৎকর বস্তু বা ব্যাপার সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়ের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল।'

এছাড়া অন্য যে দুটি গুণে তিনি নবযুগের কবিদের বরণীয় তা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত নয়। প্রথমটি হলো ইতিহাসচেতনা। এই চেতনার বলেই তিনি কবি-জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন। এই ইতিহাস চেতনার মূলে ছিল স্বদেশপ্রেম। আর দ্বিতীয়টি হলো কবিতার স্থূল গঠন। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি অনেক লেখকেরই কৈশোরের কাব্য-রচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর 'প্রভাকরে'ই আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন এই সব কবিরা। কাব্যের ক্ষেত্রে যে পোষাকি পরিবর্তন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেখা গিয়েছিল তা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেরই অনিবার্য ফল এবং সে পরিবর্তন তিনি পরোক্ষে বা অজ্ঞাতসারেই এনেছিলেন। তিনি মোটামুটি ইংরিজি জানতেন। কিন্তু একেবারে ইংরিজি না জানলেও তাঁর কাব্যে ওই পরিবর্তন আসতো। কারণ তাঁর কাব্যের পরিবর্তন ইংরিজি জানা-না জানার জন্য নয়, তাঁর ব্যক্তিগত প্রস্তুতির ফলও নয়, পরিবেশের অনিবার্য প্রভাব। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে মোটেই প্রসন্নচিত্তে বরণ করেন নি। পরিবর্তনশীল সমাজ তাঁকে ব্যঙ্গের খোরাক জুগিয়েছে। এদিকে আবার নবযুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎসাহ দিতেও তিনি বি-কুণ্ঠ ছিলেন। ব্যক্তি হিসাবেই ঈশ্বর গুপ্ত টানাপোড়নে পুরাতন যুগধারা ও নবযুগের সাধনার সঙ্গে যুক্ত। এই দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি বোধ হয় মূল্যবান[৫] : 'স্থূল কথা তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই।' নবীনদের কাব্য-পরীক্ষায় প্রশ্রয় দিলেও নিজের কাব্যের

মধ্যে সচেতন ভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে রূপ দিতে তিনি চাননি। গ্রাম্য ছড়া ও লোক-সঙ্গীতের প্রেমিক ঈশ্বর গুপ্ত সব সময় নতুন যুগরুচির মর্যাদা রাখতেন না।

কাব্য রীতির দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের কিছু কৃতিত্ব আছে। নতুন যুগের বাংলা কাব্যের ভাষাকে মৌখিক রীতির দিকে তিনি টেনে নিয়ে গেলেন। তৎসম শব্দ তাঁর কবিতায় আছে, কিন্তু তার সঙ্গে নতুন ইংরিজি সমাজ-ব্যবস্থার শব্দ, বিশেষ করে বাঙালী উচ্চারণের ইংবিজি শব্দ এবং বাংলা স্ল্যাঙ-শব্দ মিশিয়ে সমসাময়িক উঠতি সমাজের উচ্ছল স্ফূর্তিকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুললেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি[৬] :

যত কালেব যুবো, যেন সুবো,
ইংবাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোবে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখাবী কি অন্নপাবে ?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসী ধ'রে ওঠেন তবে।
ব'লে গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে ?
যাদের পেটে হেডা, মেজাজ টেডা,
তাদেব কাছে কেটা চাবে ?
বলে জো বাঙ্গালি ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।

ছন্দের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সুদূর প্রসাবী প্রভাবের সূচনা ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই দেখা গেল। ছাপাখানার প্রবর্তনের ফলে শ্রাব্য গীতিকবিতা পাঠ্য কবিতা হয়ে গেল। কবিতার বিন্যাসেও ছন্দস্পন্দন ও স্তবকের কারুকার্য ফুটে উঠলো। এ বিষয়ে ড. নীলরতন সেনের সুচিন্তিত মন্তব্য এখানে উদ্ধার করছি :

'এতদিন ছন্দের শৈথিল্য কথক বা গায়কেব সুরাশ্রয়ী গঠনের দ্বারা সংশোধনের যে অবকাশ ছিল, পাঠ্য কবিতায় সেই সুযোগ আর থাকল না। ছন্দের যতি বিভাগ এবং উচ্চারণ-রীতিকে এমন একটি সার্বজনীন মানে [Universal Standard] আনতে হল যে, সকল পাঠকই

অনায়াস পঠনে তার প্রত্যাশিত ছন্দবোধ ধরতে পারেন। শ্রাব্যগীতির এই পাঠকাব্যে রূপান্তর এই যুগে ছন্দ-বিবর্তনে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। গুপ্ত কবি একদিকে যেমন ভারতচন্দ্রের আদর্শে পদবন্ধ রচনা করেছেন এবং ছন্দের আলঙ্কারিক ধ্বনি অনুপ্রাস বৃদ্ধি করেছেন, অন্য দিকে বাক্‌ধর্মী উচ্চারণ-দৃঢ়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের শব্দ-গ্রন্থন রীতিতে সুনির্দিষ্টতা এনেছেন।'

ঈশ্বর গুপ্ত নিজে নানারকম সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদ বাংলায় করেছেন। লৌকিক বা ছড়ার ছন্দের চর্চাও কিছু করেছেন, কিন্তু তিনি নতুন যুগের কবিদের বাংলা কবিতা রচনায় ও অনুবাদে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন পুরস্কার ঘোষণা করে। তার ফলেই ইংরিজি কাব্যচর্চার প্রভাবে 'প্রভাকরে' একান্তর মিলের কবিতা রচনার উৎসাহ দেখা গেছে। এই নতুন মিলকে তাঁর শিষ্য-কবিরা বলেছেন 'গৌণ পয়ার' :

Then, pilgrim, turn, thy cares forego ,
All earth-born cares are wrong,
Man wants but little here below,
Nor wants that little long.

এই চার পংক্তির অনুবাদ করা হয়েছে এই ভাবে :

ফেরো তবে, ত্যজ তব ভাবনা পথিক,
লৌকিক ভাবনাচয় অলীক নিশ্চয় ,
মহীজ অভাব মনুজের অনধিক,
যে কিঞ্চিৎ, তাও নাহি বহুদিন রয়।

অনুবাদক শ্রীদ [খুব সম্ভব দীনবন্ধু মিত্র] টীকা দিয়ে বলেছেন :

'পারিতোষিকদাতার অভিপ্রায় অনুভবে আমি উক্ত কবিতা ইংরাজী মূলের ন্যায় গৌণ পয়ারে অনুবাদ করিলাম, অর্থাৎ প্রচলিত পয়ার ছন্দকে মুখ্য পয়ার বলা যায়, কিন্তু প্রস্তাবিত কবিতায় এক চরণ অন্তর অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল আছে, অতএব ইহার নাম গৌণ পয়ার বলা যাইতে পারে, এইরূপ ছন্দ সচরাচর ব্যবহার না থাকায়, প্রথমতঃ কর্ণের সহিত কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ক্রমে সেই দ্বন্দ্ব অবশ্যই বন্ধ হইয়া কেবল আনন্দের হেতু হইবেক।'

ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর স্তবক

গঠনের পরীক্ষা। সমসাময়িক ইংরিজি কাব্যচর্চার পরিবেশেই ঈশ্বর গুপ্ত এই পরীক্ষার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কয়েকটি স্তবকের উদাহরণ দিচ্ছি :

ক। প্রবৃত্তির আমরা সন্তান—
মহামোহ সবার প্রধান ॥
বিবেকাদি ভ্রাতাচয় নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তারা নহে বলবান্‌। কামের উক্তি।

খ। প্রণয় সুখের সার প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ প্রেমিকের ধন ॥
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
প্রমোদিত করে যাহে যত সব সুরে ॥
উথলয় সুখসিন্ধু পানে এক বিন্দু।
যার আশে গ্রাসে রাহু পূর্ণিমার ইন্দু ॥
সে সুধার ক্ষুধামাত্র নাহি এককণ ॥
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥ প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

গ। ধনবল জনবল, সহায় সম্পদ্‌, বল,
পদ্মদলগত জলচিহ্ন নাহি রয়।
কারে বলি আমি আমি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়। কিছু কিছু নয়।

মিলের বিশেষ বাহাদুরি না থাকলেও এক-একটি স্তবকে পৃথক পৃথক ভাবমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকরে' ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। এই কবিতাগুলির মধ্যে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের' কিছু কবিতা ছিল। এই কবিতাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই চিরাচরিত রীতিকেই আশ্রয় করে রচিত। গোপালচন্দ্র সেন নামে হুগলি কলেজের এক ছাত্রের কবিতায় তৎকালীন কলেজের বিপুল পাঠ্যতালিকার বিরুদ্ধে অনুযোগ আছে : 'হোমারাদিড্রাইডেন/সেক্স্‌-পিয়র মিলটন/ইম্মিতাদি যত ফিলজাফি ॥' কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারীর ('সুধীরঞ্জনে'র অন্তর্গত, ১৮৫৫) একটি কবিতার বিষয় ছিল 'বঙ্গভাষার সহিত ইংরেজী ভাষার কথোপকথন'[১]। বঙ্গাব্দ ১২৬৬তে বৈশাখ মাসে 'সম্বাদ প্রভাকরে' লেখা হয়েছিল :

'ইংরাজী কবিতার অনুবাদ বিষয়ে অভ্যাস রাখা অত্যন্ত আবশ্যক যদিও প্রথমতঃ তাহা কিঞ্চিৎ কঠিন হয় বটে কারণ অপরের মনের ভাব ও অভিপ্রায়ের দাসত্ব স্বীকার না করিলে অনুবাদ উত্তম হয় না কিন্তু তাহাতে অভ্যাস জন্মিলে এবং তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলে আহ্লাদের সীমা থাকে না ইংরাজী উত্তমোত্তম কবিতা সকল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করণে বিশেষ রূপেই মনোযোগী হইবেন, তাহা কদাচ তাচ্ছিল্য করিবেন না।'

এই ব্যাপারে ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহ বরাবরই ছিল। 'প্রভাকরে'ই গ্রে-র 'এলিজি রিটন্ অন এ কান্‌ট্রি চার্চইয়ার্ড', গোল্ডস্মিথের 'হার্মিট', ক্যাম্পবেলের 'প্লেজার্স অব হোপ', গ্রে-র 'ওড টু অ্যাডভার্সিটি', ক্যাম্পবেলের 'লাস্টম্যান সোলজারস্ ড্রিম', লোগানের 'ওড টু কাকু', বিটির 'হার্মিট', পোপের 'ইউনিভার্সাল প্রেয়ার', কুপারের 'আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক' (১৮৫৪, ১৫ নভেম্বর, সম্বাদ প্রভাকর) ইত্যাদি অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু এই সব অনুবাদের মধ্যে ছন্দের যে মিল-বৈচিত্র্য, যমক-অনুপ্রাসহীন ভাবপ্রধান রচনা ও বিষয়বৈচিত্র্য ধরা পড়ছিল তা প্রভাকর সম্পাদকের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন প্রাচীন পন্থার পক্ষ সমর্থন করে লিখেছিলেন[১০]:

'বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে যমক অত্যন্ত শ্রুতি সুখকর। বিশেষতঃ নানার্থবাচক একশব্দে যে সকল পদ্য প্রচরিত হয় তাহা সর্বাপেক্ষা আরো অধিক প্রীতিকর হইয়া থাকে। কিন্তু এ প্রকার বাঙ্গালা কবিতা অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়।'

অর্থাৎ কবিতার ভাবনাচিন্তা ও ভাষার ক্ষেত্রে অনেকদিক থেকে নতুন সুরের আমদানি করেও ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কাব্যরীতির বাহ্যিক ধ্বনিবাহুল্যকে ছাড়তে পারেন নি।

---

১. লোকসাহিত্য, পৃ. ২৯।

২. Bengali Literature in the Nineteenth Century : (2nd edition) : S. K. De দ্রষ্টব্য।

৩. Bengali Literature in the Nineteenth Century : (2nd edition) Pp 352-3

৪. দীনবন্ধু মিত্র : পৃ. ১৭।

৫. বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সমগ্র সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা : পৃ. ৮৫৯।

৬. দুর্ভিক্ষগীত [১] বসুমতী সংস্করণ, পৃ. ১৩৩।

৭. আধুনিক বাংলা ছন্দ, পৃ. ১৮–১৯।

৮. সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬৫।

৯. কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ; উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : কৃষ্ণনগর কলেজ পত্রিকা ১৯৫৩, পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৬ : পৃ. ৫৫।

১০. সংবাদ প্রভাকর, ১৯ আগস্ট, ১৮৫৩।

তিন

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সচেতন ভাবে বাংলা কবিতায় উন্নতি কামনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৬-৮৭)। ঈশ্বর গুপ্তের অন্য দুই উল্লেখযোগ্য শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্র কৈশোরে কাব্যচর্চা করলেও ক্রমশঃ তাঁরা সাহিত্যের অন্য বিভাগে উৎসাহ দেখালেন, কাব্যচর্চায় থেকে গেলেন রঙ্গলাল। রঙ্গলালকেই আমরা প্রথম বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের অনুবাদক রূপে পাচ্ছি। বাঙালী কবি হিসাবে তাঁর মধ্যেই এই প্রথম সক্রিয়তা দেখা গেল এবং এই সমাজেরই উদ্যোগে মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, তাতে গ্রাহ্য হলো একটি বাংলা কাব্য আর একটি 'উপন্যাস'। সেই বাংলা কাব্যটি হলো পদ্মিনী কাব্য।[১] এর কিছু পূর্বে ১৮৫২-তে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পড়েছিলেন রঙ্গলাল। বাংলা কবিতায় অশ্লীলতার ওপর জোর দিয়ে সভায় পূর্বে যে প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল, তারই প্রতিবাদে রঙ্গলালের এই প্রবন্ধটি রচিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ইত্যাদি যতগুলি সভা তখন ছিল, তার মধ্যে কেবল বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ এবং বেথুন সোসাইটি বাংলা কাব্যচর্চার প্রতি নজর দিয়েছিল। আর পত্রিকাগুলির মধ্যে ছিল গুপ্ত কবির 'প্রভাকর'। 'প্রভাকর'-এ কবিতা অনুবাদের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হতো সে কথা আগে বলেছি।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট না হবার কারণ বোধহয় কবিদের ইংরিজি সাহিত্যের প্রতি অতিরিক্ত মোহ। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা সকলেই তখন ইংরিজি ভাষার কবি হবার হাস্যকর মোহে বিমূঢ়। রঙ্গলাল হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না, পুরাতনের শিকড় তাঁর মধ্যে একেবারে নির্মূল না হবার কারণও বোধ হয় এই। ১৮৫২-তে বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের উপসংহারে রঙ্গলালের যুগান্তকারী ঘোষণা এ ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয়:[২]

'অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙলা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না,

বাঙ্গালা কবিতাহার যাহাতে সভ্য কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক। অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহ-সলিল সেচন করুন, পরিশ্রম-হল চালনা করুন, দ্বেষ প্রভৃতি জঙ্গল-কণ্টক-বৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্য লাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনাদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুল বৃক্ষে আম্র মুকুল উদয় হয় না—সেইরূপ বাঙ্গালী কর্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবে না কেন, অশ্বতর শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনাকল্পে যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ পরিশ্রম ও সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙ্গালী কবি হইতে পারিতেন এবং তাহা হইলে কত বড় আস্পর্ধার বিষয় হইত?'

এই ঘোষণার ফলেই রঙ্গলাল তৎকালীন উদীয়মান বাঙালী কবিদের মোহভঙ্গ ঘটালেন। নিজেও সচেতন ভাবে কাব্যের সমৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। কিন্তু যে বিপ্লবী জীবনচেতনা ও কবিপ্রতিভা রাতারাতি কাব্যের ভোল পালটাতে পারে, তা কিছু পরেই মধুসূদনের মধ্যেই দেখা গেল। আর রঙ্গলাল ও মধুসূদন এই উভয়কেই যিনি মোহমুক্ত করেছিলেন, বলেছিলেন ইংরিজি সাহিত্যের কবি হবার প্রায় অসম্ভব চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য বোধকে কাজে লাগাতে, সেই বেথুন সাহেবকে স্মরণ করে রঙ্গলাল উপসংহারে বলেছিলেন:

'আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎমাস পূর্বে আকিঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।'

জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী ও বহুবাজারের দত্ত পরিবারের উমেশচন্দ্র দত্ত গোল্ড স্মিথের ও পার্নেলের 'দি হার্মিট' নামক কবিতা দুটির উৎকৃষ্ট অনুবাদের

জন্য যথাক্রমে দশ টাকা ও পঁয়ত্রিশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ যে, রঙ্গলাল উভয় পুরস্কারই পেয়েছিলেন। তাঁর রচনা সর্বতোভাবেই উত্তম হয়েছিল এবং সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত হয়েছিল।[৩] কাজেই ইংরিজি কবিতা অনুবাদের মধ্য দিয়েই রঙ্গলালের কাব্যচর্চার সূত্রপাত।

'পাঁচ বছর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়া পাঠশালায় প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে তিনি স্থানীয় মিশনারী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইলে উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা দিবার মানসে [জ্যেষ্ঠ মাতুল] রামকমল ভাগিনেয়দিগকে চুঁচুড়ায় নব প্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহসীন কলেজে [হুগলী কলেজে] ভর্তি করাইয়া দেন। হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন'।[৪]

স্কুল-কলেজের বিদ্যার কথা ছেড়ে দিলে বলতে হয়, রঙ্গলালের যা কিছু পড়াশোনা সবই নিজের চেষ্টায়, বাড়িতে বসে। ইংরিজি সাহিত্য বেশ ভালোরকমই পড়েছিলেন তিনি, 'বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধে' তার প্রমাণ রয়েছে। সংস্কৃতও তিনি ভালো শিখেছিলেন। রচনাবলীর বসুমতী সংস্করণে রঙ্গলালের জীবনীতে পাচ্ছি, 'ইউরোপীয় তিন-চারটি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল।' কথাটি মিথ্যা নয়। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ওব্রায়েন স্মিথের কাছ থেকেই রঙ্গলাল গ্রীক ও ল্যাটিন শিখেছিলেন। মধুসূদনের সমকালে একমাত্র রঙ্গলালই বোধহয় ভালোভাবে গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন। ভারতীয় ভাষাতেও তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তার প্রমাণ বীম্‌স্ তাঁর ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ রচনায় রঙ্গলালের সাহায্য নিয়েছিলেন।

হিন্দু কলেজে পড়লে রঙ্গলাল হয়তো Brown Englishman-এর দলে ভিড়তে পারতেন। সে সুযোগ তাঁর হয়নি বলেই বাংলা কাব্যের অবলুপ্তপ্রায় ধারাটির সম্পর্কে মাইকেলের তুলনায় তিনি বেশী ঘনিষ্ঠ, অর্থাৎ রক্ষণশীল। প্রথম জীবনে কবিগানকে কিছুদিন পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অন্য দিকে বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের রস তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কাব্যকলাকে নবযুগের উপযুক্ত করে তুলতে পেরেছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের [১৮৫৮] ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছিলেন:

> 'আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের

অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।'

নবযুগের দুটি বিশেষ লক্ষণ—সুরুচি ও স্বদেশপ্রেম রঙ্গলালকে তাঁর এই নতুন কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর সুরুচিবোধ ইংরিজি কাব্য-সাহিত্য পাঠেরই ফল। এই বোধের টানেই পদ্মিনী-কাব্যের ভূমিকায় লিখেছিলেন :

'মদনুগ্রাহকবরস্বদেশহিততৎপর সুনির্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্য নিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক-বৃদ্ধ-বনিতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্যরচনার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন।'

এবং পাশ্চাত্ত্য কাব্যের মাধুর্যবসে অপূর্ব সুখানুভব করা যায় বলেই তিনি 'ভেক-মুষিকের যুদ্ধ' [১৮৫৮] কাব্যের ভূমিকায় বলেছিলেন :

'ফলত ইউরোপীয় মহাকবিদিগেব কবিত্বচ্ছটার প্রতিবিম্ব, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত।'

এই রুচিবোধের জন্যই পদ্মিনী-কাব্য সমাপ্ত হলে রঙ্গলাল রেভারেণ্ড ওয়ায়েন স্মিথ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইত্যাদি মার্জিত বন্ধুর অনুমোদন নিয়ে কাব্য প্রকাশ করেন। স্বদেশপ্রীতির পবিচয় আমরা রঙ্গলালের মধ্যেই প্রথম পাচ্ছি না। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে আগেই আমরা সে পরিচয় পেয়েছি। 'মাতৃসম মাতৃভাষা' এই উক্তি ঈশ্বর গুপ্তেরই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ-প্রীতি ছিল কিছুটা রক্ষণশীল, রঙ্গলালের স্বদেশ-প্রীতি ছিল প্রগতিশীল। তার সঙ্গে ইংরিজি সাহিত্য-পাঠের রসবোধ তাঁব ছিলই। সেই জন্যই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল :

'কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষকতা আবশ্যক, এতাবতা, আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না।' [ঐ]

রঙ্গলালের কবি-জীবনের ইতিহাস এই প্রশ্নেরই সদুত্তর দেবার চেষ্টা। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে আখ্যায়িকা কাব্যের প্রতি সাধারণের একটা ঝোঁক ছিল। মঙ্গলকাব্যের ধর্মাশ্রিত আখ্যায়িকা নয়, বিশুদ্ধ মানবিক

কীর্তিকলাপের কাহিনীই যুগরুচির উপযুক্ত ছিল তখন। ফারসী ও হিন্দী আখ্যায়িকা, ইয়োরোপীয় কবি ভার্জিলের ইনিদের প্রথম সর্গের অনুবাদ (১৮০৫), হোমারের ইলিয়াদের প্রথম সর্গের অনুবাদ, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের অনুবাদ 'স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য' ও 'সুখদ উত্থান ভ্রষ্টকাব্য' (১৮৫৪) ইত্যাদি বই আখ্যায়িকা কাব্যের আসর জমিয়েছিল। ঐতিহাসিক গবেষক রঙ্গলাল টডের রাজস্থান কাহিনীর মধ্যে বাঙালীর দেশগৌরব প্রকাশ করবার অবলম্বন পেয়েছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছিলেন:

> 'পুরাণেতিহাস বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাব অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুবাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যা কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। অতএব স্বদেশীয় লোকেব গবিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে ভাবেব আশু চিত্তাকর্ষক এবং তদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসবণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান বাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক বচিত করিলাম।'

এই নতুন বিষয় নির্বাচনের পিছনে যে ইতিহাসপ্রিয় মন এবং স্বদেশ-প্রীতিব ধারণাটি কাজ করেছে—দুটিই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবের ফল।

কাব্যরুচি সম্পর্কেও বঙ্গলাল বিদেশীদের মতানুসারী। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যেব ভূমিকায় বঙ্গলাল রিচার্ডসনের Literary Recreation নামক বই-এর Poetry and Utilitarianism নামক প্রবন্ধটির কিছু অংশ অনুবাদ করে দিয়েছেন। সে অংশে রিচার্ডসন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, সুরুচি ও অসীম আনন্দের বাহন হিসাবে কবিতাকে দেখছেন। রঙ্গলাল সেই অংশটুকুই তুলে দিয়েছেন:

> 'কবিতার আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্মসকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে—কবিতার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয়. ভোগ শক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে

যে, জাগতীয় সামান্ত প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্মল নিত্য সুখসন্তোষের সম্ভাবনা আছে।'

রঙ্গলালের কাব্যেই কবি-চিন্তা-নিরপেক্ষ প্রকৃতি বর্ণনা এই প্রথম পাওয়া গেল। এই নতুন প্রকৃতি-চেতনার মূলেও রিচার্ডসনের প্রভাব রয়েছে মনে হয়। উদ্ধৃত অংশের পরেই রঙ্গলাল বলছেন :

'কবিতা এক প্রকার ধর্ম বিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপ-ধর্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতীস্বরূপ কার্যের ক্রমপ্রদর্শনপূর্বক তৎকর্তার সত্তা সংস্থাপন করেন, তাঁহারা মানুষের নিকট ঐশিক ক্রিয়া-প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করতঃ তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতন-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি।' তথাপি :

'তরুলতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থভাব ধরে॥
উপদেশ দান করে পাষাণ সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্ফল॥'

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র সূচনাংশেই আমরা এই বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটিতে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট দেখতে পেলুম।

'ধরাধর অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর॥
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুলকুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝল মল ভানু করে করে অনিবার॥
বিবিধ বিহঙ্গ নানা স্বরে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর মন প্রাণ হরে॥'

এই সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার ক্ষমতা সকলের নেই। কবি বলছেন :

'দৈব অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয়।' যেহেতু কবিরাই নিসর্গের পুরোহিত, সেই হেতু তাঁরাই এই অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন। প্রকৃতির মধ্যে এই যে দৈব-শক্তি কাজ করছে, বিশ্বস্রষ্টা যে এই প্রকৃতির মধ্য দিয়েই বিচিত্র সৌন্দর্য প্রকাশ করছেন এই ধারণা তৎকালীন বিদেশী দার্শনিকদের ধারণা থেকেই এসেছে। রুশো, কাণ্ট, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই নতুন প্রকৃতিবোধের উদ্বোধন করেছিলেন। টমাস পেন, টোলাণ্ড ইত্যাদির রচনাতেও প্রকৃতি যে বিশ্বসত্তার অংশ, সেই কথাই অনুভব করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে'-ও এই কথাই বলেছিলেন[৫]:

> 'তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য-অদ্বিতীয় অনাদি পরমকারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। তিনি বিশ্বকর্তার জ্ঞানশক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্বস্থানে দেদীপ্যমান দেখিতে পান।'

পদ্মিনী উপাখ্যানের মূল ভাব যে দেশপ্রেম, তা আগেই বলেছি। এই দেশপ্রেম ভাবনা বিদেশী দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য ও কাব্য থেকেই অধিকাংশক্ষেত্রে গৃহীত। বিশেষ করে ইংরেজ কবি ওয়াল্টার স্কট ও টমাস মূরের দেশ-প্রেমমূলক কবিতা এবং ইয়ংবঙ্গ সমাজের কবি ডিরোজিওর কবিতা রঙ্গলালকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সূচনাংশে:

> 'মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন,
> যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥'

ইত্যাদি অংশ ডিরোজিওর To India, My Native Land কবিতার ভাবানুসারী এবং ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য টমাস মূরের Glories of Brien the Brave এবং From Life without Freedom অনুসরণে লেখা।

'পদ্মিনী উপাখ্যান'-কাব্যের কাহিনী-বর্ণনাতে রঙ্গলাল স্কটের মিনস্ট্রেলের অনুসরণে চারণের মুখে কাহিনী শুনিয়ে নতুনত্ব এনেছেন, কাহিনী বর্ণনার আদর্শ হলো ইংরিজী metrical romance। এই ধরনের গাথা-কাব্যে বিশেষ বিশেষ ঘটনার ওপরেই জোর দেওয়া হয়। এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে যুদ্ধ। এই metrical romance-এর আদর্শই বাংলা কাব্যে বীর-রসের প্রাধান্য এনেছিল। পরে মাইকেল এই রস-সৃষ্টির জন্য হোমারের দ্বারস্থ হয়েছেন মাঝে মাঝে। যাই হোক, রঙ্গলালের কাব্যে নারীর রূপ বর্ণনায় শেক্‌সপিয়রের অনুসরণ কোথাও কোথাও আছে, 'পদ্মিনী বর্ণন' অংশে 'কোন মূঢ় চিত্রকরে

কাব্যদেহ চিত্র করে' ইত্যাদি শেক্‌সপিয়রের কিঙ জন-এর (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য) 'To gild refined gold, to paint the lily' ইত্যাদি ছ-পংক্তির ভাবানুবাদ[৬]।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দেই রঙ্গলালের অপর একটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ'। কাব্যটি হোমারের ইলিয়াডের প্যারডি। কাব্যটির নাম Batramyomachia [Battle of the Frogs and Mice]। এটির ইংরিজি অনুবাদ করেন পার্নেল। খুব সম্ভব এই ইংরিজি অনুবাদ অবলম্বনেই রঙ্গলাল 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' রচনা করেন। কিংবা এও হতে পারে, মূল গ্রীক থেকেই তিনি অনুবাদ করেছিলেন। কারণ আগেই বলেছি, ওব্রায়েন স্মিথের কাছে গ্রীক-ল্যাটিন শিখেছিলেন তিনি। মূল কাব্যটির বিশুদ্ধ ব্যঙ্গরস আমাদের ব্যঙ্গাশ্রিত অশ্লীল কাব্যের পরিবেশে রঙ্গলালকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ' বাংলা কাব্যের ইতিহাসে প্রথম mock-heroic কাব্য। এই ধারার পরবর্তী কাব্য 'মেঘনাদবধ' অনুসরণে জগদ্বন্ধু ভদ্রের রচিত 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য'।

পরবর্তী কাব্য 'কর্মদেবী'র (১৮৬২) কাহিনীও ইংরিজি রোম্যান্টিক গাথা কাব্যের মিনস্ট্রেলের মতো ব্রাহ্মণের দ্বারা বর্ণিত কাহিনী রাজপুত ইতিহাস থেকেই নেওয়া। কর্মদেবীর পূর্বরাগ ও ভ্রমণ কাহিনী সম্ভবতঃ মূরের Lalla Rookh-এর অনুসরণে লেখা। বিপাশার তীরে বণিক বাহিনীর ছাউনি পেতে রণসজ্জা, চন্দনা নদীর তীরে অরণ্য কমলের সঙ্গে সাধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা ইংরিজি রোমান্সের নাইটদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কর্মদেবী' প্রকাশের পূর্বেই মাইকেল কবিতায় যুগান্তর এনেছিলেন। মাইকেলের প্রতিভার কাছে রঙ্গলালকে হার মানতে হয়েছিল। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' সর্গবন্ধ ছিল না। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যের অনুসরণে 'কর্মদেবী' চারটি সর্গে গাঁথা হয়েছে। চতুর্থ কাব্য 'শূরসুন্দরী'ও (১৮৬৮) চারটি সর্গে বিভক্ত। এখানেও বিষয় রাজপুত ইতিহাস। কাব্যের মঙ্গলাচরণরূপে 'কবিতাশক্তির প্রতি' নামে যে অংশটি আছে, তাও ইয়োরোপীয় মহাকাব্য ও অন্যান্য ইংরিজি কাব্যের invocation-এর অনুসরণ। এর আগেই 'মেঘনাদবধকাব্যে' এই invocation আমরা দেখেছি। সেখানে দেবী 'অমৃতভাষিনী' বলে বন্দিত হয়েছেন। পঞ্চম কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'তে (১৮৭৯) প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যের অনুসরণ থাকলেও প্রাচীন কাব্যটির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে রঙ্গলালের

আধুনিক দৃষ্টি কাব্যখানিকে কত পরিবর্তিত করেছে। প্রথমত রঙ্গলাল কাব্যটিকে সাতসর্গে গেঁথেছেন। তারপর, নতুন ঐতিহাসিক সচেতনতায় একটু ঐতিহাসিক ভূমিকাও করেছেন। কাহিনীর যুদ্ধ বর্ণনাকে রাজপুত কাহিনীর ছাঁচে ঢেলেছেন, অর্থাৎ সেই ইংরিজি রোমান্সেরই রস কিছুটা আছে। মূল কাহিনীর মধ্যে 'ইষ্টদেব গণপতির যুদ্ধে অবতরণ' অংশটি রঙ্গলাল আধুনিকতার খাতিরে অর্থাৎ মানবিক রস ক্ষুণ্ণ হবে এই আশঙ্কায় বাদ দিয়েছেন। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে, প্রাকার-আক্রমণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, [flash and spirit of battle action—যা স্কটের কাব্যের বৈশিষ্ট্য], প্রেমিকাকে দর্শন পাবার আশায় যাত্রা, সঙ্ঘবদ্ধতা এবং ফিউডাল আদবকায়দা—রঙ্গলালের কাব্যের এই সব লক্ষণ স্কট-বায়রনের হিরোইক ভার্স টেলের পরিবেশ, বক্তব্য, বর্ণনাভঙ্গি এবং দৈর্ঘ্যকেই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। স্কটের কাব্য ও অন্যান্য ওই জাতীয় কাব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে[৭] : 'they use all the romantic resources of chivalry, warfare, pathos, sentiment, and the glamour of an imagined past.' একথা রঙ্গলালের কাব্য সম্পর্কেও নিখুঁতভাবে সত্য। বায়রনের চেয়ে স্কটের সঙ্গে শিক্ষা ও রুচির দিক থেকে রঙ্গলালের সাদৃশ্য বেশি নিকট। স্কটের জীবনে 'Latin Schooling', 'Antiquarian Study', লেক-কবিদের 'innovations and inbred fanaticism'-এর প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য এবং অন্য দিকে রঙ্গলালের পাঠশালায় পড়াশোনা, কবিগানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, হুগলী কলেজে [হিন্দু কলেজে নয়] তাঁর পড়াশোনা, ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক এবং ঐতিহাসিক গবেষণার নিষ্ঠা, এবং এই সমস্ত কারণে পরবর্তীকালের আত্ম-নির্ভরশীল দেশী-বিদেশী নানা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা সত্ত্বেও মানসিক মুক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব এবং সবশেষে মাইকেলের মতো নতুন শক্তিশালী কবির কাব্যসৃষ্টির প্রতি অনীহা—ইত্যাদি চারিত্রিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি সমান্তরাল সাদৃশ্য এনে দুই কবিকে নিকটতর করেছে।

অন্য দিকে দেশীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাবান রঙ্গলাল কালিদাসের কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহারের অনুবাদ করেছিলেন। 'নীতি-কুসুমাঞ্জলি' নামে একটি কবিতার বইও প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া দেশ-বিদেশের প্রবাদ সংগ্রহ রঙ্গলালের এক আশ্চর্য কীর্তি।

কাব্য-রীতির দিক থেকে রঙ্গলাল বিশেষ নতুনত্ব আনতে পারেন নি। ভাষার ক্ষেত্রে প্রচলিত অলঙ্কারকেই তিনি আশ্রয় করেছেন, বিশেষ করে

ভারতচন্দ্রের ও ঈশ্বর গুপ্তের অলঙ্কার-মোহও তিনি ছাড়তে পারেন নি। অথচ কাব্যভাষার অলঙ্কার বহু-ব্যবহারে তখন দ্যুতিহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রঙ্গলাল সেই দিক থেকে কোন বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন নি।

'মহা ঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে।
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে॥
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরের পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে॥'

এই ভারতচন্দ্রীয় রীতি আর যাই হোক, নতুন যুগের বাংলা কাব্য-ভাষার আগমনী নয় মোটেই। এ ব্যাপারে মাইকেল রঙ্গলালের উচিত সমালোচনাই করেছিলেন (১৫ মে, ১৮৬০):

'My opinion of his is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps imagination, but his style is affected and execrable.'

ছন্দের দিক থেকে রঙ্গলালের যা কিছু চেষ্টা—ভাষাকে বাক্‌ধর্মী করবার চেষ্টা বা ভাবের মুক্তি—সবই চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডির মধ্যেই ঘটেছে। তাই এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে প্রাচীন ধারার টানটাই ছিল বেশী। মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হবার পরেও রঙ্গলালের 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' ইত্যাদি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি Blank Verse-এ লেখা নয়। কাজেই Blank Verse-কে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। মাইকেল একটি চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন [তারিখ নেই]:

I don't know if you read the Education Gazette. If you do, you have no doubt seen the Editor's remarks on blank verse. I don't think R.—either reads or can appreciate Milton, otherwise he would not have made those remarks in the concluding portion of his article.

রাজনারায়ণ বসু একটি চিঠিতে (১৮৬০) Blank Verse সম্পর্কে রঙ্গলালের গোঁড়ামির উল্লেখ করে লিখেছেন:

I had a long talk with Rungolal last evening on the subject of versification in general and Blank Verse in particular · he said—'I acknowledge Blank Verse to be the

noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the poetry of England would appreciate it for years to come'

এই গোঁড়ামির জন্যই রঙ্গলাল অমিত্রাক্ষরের মধ্যেকার ভাবমুক্তির আদর্শকে গ্রহণ করেন নি। তবে পয়ার-বন্ধের মধ্যে যেটুকু ভাবমুক্তি সম্ভব তার প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং তার পরবর্তী কাব্যগুলিতে তিনি অনেক ক্ষেত্রে আট-ছয়েব মাত্রা ভাগের সুনির্দিষ্ট যতি তুলে দিয়ে কেবল পংক্তির শেষে যতি এনে ভাবমুক্তির চেষ্টা করেছেন। যেমন:

ক) অধার্মিক | বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।

(ভীমসিংহের বন্ধন দশা। পদ্মিনী উপাখ্যান।)

খ) দেখিব তখন | কেটা কবিবেক ত্রাণ।

(পদ্মিনী উপাখ্যান।)

গ) এই দেখ পত্র | পৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর।

(পদ্মিনী উপাখ্যান।)

ঘ) কোথা সে অভাগা | কোথা তুমি ভাগ্যবতী:

(কুমারসম্ভব। ৭৩।)

ঙ) ধনহীন উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন।

(শূরসুন্দরী, দ্বিতীয় সর্গ।)

এছাড়া অনেক সময়ে নির্দিষ্ট মাত্রাভাগের মধ্যে রঙ্গলাল বাক্‌ধর্মী দৃঢ়তা এনেছেন। বলা যায় Blank Verse এর পথ সুগম করে দিয়েছেন:

ক) এই কি যোদ্ধার ধর্ম রে রে দুরাচার?
এই কিরে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার?

(ভীমসিংহের বন্ধন দশা, পদ্মিনী উপাখ্যান)

খ) অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর।
যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর॥

(শিবিরে গমন। পদ্মিনী উপাখ্যান।)

ঈশ্বর গুপ্তের ললিত মিল-প্রয়োগ রঙ্গলাল যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। দেখা গেছে, সমগ্র পদ্মিনী কাব্যে কবি ৭০৮টি পয়ার পংক্তি লিখেছেন।[৮] তার মধ্যে ৮২ বার কবি আট-ছয় মাত্রা ভাগের প্রচলিত বিভাগ ভেঙেছেন। অর্থাৎ প্রতি নয় পংক্তিতে একবার করে ভেঙেছেন। সুতরাং এ ব্যাপার আকস্মিক

নয়। এ রীতিমতো ভাবমুক্তির পরীক্ষা। এই পরীক্ষার আরও প্রমাণ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের অরিসিংহের যুদ্ধ বর্ণনা অংশ। এই অংশে বাক্‌ধর্মী ভাব-প্রকাশক পূর্ণাঙ্গ মহাপয়ার ব্যবহার করা হয়েছে :

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার। ইত্যাদি।

এছাড়া 'কর্মদেবী'তে বাইশ মাত্রার পংক্তি রচনার প্রয়াস ও মুক্তক রচনার ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করা যায়। দুটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

ক) শোকস্বর উঠে, উভয় মেলায়, নিবাশ্বাস অরণ্য কমল।
কর্মদেবী জীবন ত্যজিলা শুনি, হলো অতি হৃদয় বিকল॥

[জয়তঙ্গের উক্তি]

খ) কাতরা কপোত বধূ বিরহের কালে
কিবা আশ্বাস পরানে?
উদয় অচলে দিনকর,
হেরি হাস্যমুখী হয় কমলিনী।
হাসিতে না প্রকাশিত মুখ
মেঘরাশি আসি করিল মলিনী॥

[জয়তঙ্গের উক্তি]

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে আমরা যে স্তবক রচনার প্রচেষ্টা দেখেছি তার অনুসরণ রঙ্গলালেও পাই। দ্বিপদী ও ত্রিপদী পংক্তির সমন্বয়ে স্তবক রচনায় কবি দীর্ঘ আট ও দশ মাত্রার পদের চমৎকার প্রযোগ করেছেন :

ক) যেখানে পদ্মিনী পৌর্ণমাসী,
প্রকাশিতা হইবেন আসি।
সেইস্থান এইরূপ রচনা করেছেন ভূপ
বিহিত গোপন অভিলাষী॥

[পদ্মিনী প্রদর্শন]

খ) দর্পণের চারু আবরণ,
ভীমসিংহ করেন মোচন।
হইল মহেন্দ্রক্ষণ অস্থির শাহার মন
সচকিত হইল লোচন॥

করিতেছ ছায়া দরশন
যেন সব মায়ার রচন
কাচেতে কাঞ্চন কান্তি চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনীমুরতি বিমোহন ॥ [পদ্মিনী প্রদর্শন]

বারো আটমাত্রার পদের সংমিশ্রণে গঠিত স্তবকেব পবিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে :

দিনকর, দয়া কব তমোহব :
হর মম তাপ, তমোনিকব।
তুমি হে প্রভু সবিতা জীব শিব প্রদায়িতা
সর্বসুখ প্রেরয়িতা, পোষযিতা পবাৎপর ॥
তরুণ অরুণাশ্রয়, করুণা বরুণালয়,
দেহি মে করুণাময়, করুণাবারি শীকর।
তুমি হে কালজনক, মুরতি তপ্ত কনক,
সকল ক্ষণ গণক ত্বংহি ত্রিকাল ঈশ্বর।
মনোমত প্রিয়বরে পেয়েছি তোমাব বরে,
অরুন্তুদ অরিকরে রক্ষো প্রভো প্রভাকর ॥
[কর্মদেবী, গীত]

যাই হোক ইংরিজি কবিতার ভাবধর্ম ও দৃঢ বাক্‌পর্বিক প্রকাশভঙ্গি রঙ্গলালকে আকৃষ্ট করেছিল এবং নির্দিষ্ট যতিবিভাগ লঙ্ঘন, দীর্ঘ পংক্তি ও মুক্তক বচনার পিছনে সেই আকর্ষণই কাজ করেছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় ইংরিজি কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে রঙ্গলালের অনেক বেশী পরিচয়, সে তুলনায় মিল ও স্তবক রচনার কৌশলে কবি আরও সজাগ হবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ততটা সজাগ তিনি ছিলেন না।

---

১. বাঙলার নব্য সংস্কৃতি : যোগেশচন্দ্র বাগল : পৃ. ৪৭।

২. বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১০ দ্রষ্টব্য।

৩. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য-সাধক চরিতমালা।

৪. রঙ্গলালের গ্রন্থাবলী [বসুমতী সংস্করণ] এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

৬. ড. সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬২, পৃ. ১১১-২-তে এগুলির উল্লেখ করেছেন।

৭. A Short History of English Literature : Ifor Evans স্কট সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮. আধুনিক বাংলা ছন্দ : ড. নীলরতন সেন : রঙ্গলাল সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

❋

চার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে মাইকেল নিজেই একবার রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন : 'the first poem in the language'[১]। ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের কাব্যের পরে মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' এবং তার পরেই 'মেঘনাদবধ কাব্য,' এ কথা কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না। সেই 'প্রথম' বাংলা কাব্যের কবি মধুসূদন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্য-পাঠের রুচি নিয়ে বাংলাকাব্যের সৃষ্টিতে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সুরুচি, স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনচিন্তা ও মানবিকবাদ এই স্থূল লক্ষণগুলি মাইকেলের মধ্যে বিশেষ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। 'ভারত ভূমি' ও 'বঙ্গভূমি' একটিকে অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করে মাতৃসম্বোধনে নিজের মিনতি জানিয়েছিলেন। বায়রনীয় ভঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃরূপী native land-এর কাছে তিনি বিদায় চেয়েছিলেন। খৃষ্টান হয়েও পিতৃপুরুষের mythology-র আকর্ষণে 'তিলোত্তমা সম্ভব', 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' এবং অজস্র সনেট লিখেছিলেন। তবে সে mythology তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনা-শক্তিতে নবজাগ্রত মনুষ্যত্ব-মহিমার গাথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'তিলোত্তমা সম্ভব' লিখলেন রোমান্টিক ছাঁদে, 'মেঘনাদবধ' লিখলেন বিদেশী এপিকের আদর্শে ও মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণায়, 'বীরাঙ্গনা' লিখলেন হিরোইক এপিস্‌লসের ঢঙে, 'ব্রজাঙ্গনা'কে ode-এর ছাঁচে ঢাললেন, স্বদেশের প্রতি nostalgia প্রকাশ পেল বিদেশী চতুর্দশপদীর নিরেট কঠিন বন্ধনে।

বিদেশী কাব্যের রসে মত্ত হয়ে মাইকেল (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর বাঙালি ঐতিহ্য ও পরিবেশকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডেই তাঁর জীবনের সমস্ত সার্থকতা রূপ নেবে এই দৃঢ় ধারণা ছিল তাঁর। ইংল্যাণ্ডে গেলে ইংরেজ কবিদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন এ আশাও তাঁর ছিল। তিনি ভাবতেই পারতেন না যে, 'বিলেত দেশটা মাটির, সে খাঁটি সোনার নয়।' খৃষ্টান ধর্মের প্রতি তাঁর যে ঘোর আসক্তি ছিল এমন নয়, কিন্তু সাহেব হতে পারবেন এবং বিলাত যাবার সুবিধাও হবে এই জন্যই তিনি খৃষ্টান হয়েছিলেন

(১৮৪৩)। দেশের ধর্মানুষ্ঠান ও তীর্থ-সংস্কারে তাঁর আন্তরিক টান ছিল। তবে খৃষ্টান হয়ে তিনি জীবনে যে মস্ত ভুল করেছিলেন তা নয়। ডক্টর সুকুমার সেনের ভাষায় বলি[২]: 'ইহা তাঁহার উৎকেন্দ্রিক জীবনের বোধকরি একমাত্র শুভ সংঘটন। কেন না ইহার জন্যই তাঁহার ছন্নছাড়া প্রতিভা অন্যথা অসুলভ শিক্ষা ও অনুশীলনের সুযোগ পাইযা কিছুকালের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টান হইলেন কিন্তু বিলাত যাওয়া ঘটিল না—অদৃষ্টের এই পরিহাস তাঁহাব ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যতই মর্মান্তিক হোক, তাঁহার সাহিত্য-জীবনে কল্যাণের হেতু হইয়াছিল। খৃষ্টান হইয়াছিলেন বলিয়া মধুসূদন প্রথমে বিশপ্‌স্ কলেজেব ছাত্র হিসাবে, পবে মাদ্রাজে স্কুল শিক্ষকরূপে গ্রীক্ ল্যাটিন সংস্কৃত প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষা ও সাহিত্য ভালো করিয়া পড়িবার সুযোগ যদি না পাইতেন তবে 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেব ও 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেব কবিকে আমরা বোধ কবি পাইতাম না।'

হিন্দু কলেজেব মেধাবী ছাত্র মধুসূদন ডিরোজিয়ান ঐতিহ্যকে একেবারে বিস্মৃত হতে দেখেন নি। ইয়োরোপেব প্রতি মোহের অনিবার্য টানেই তাঁব মনে বিজাতীয় হবার বাসনা জেগেছিল। এবং তাঁব ওই বিজাতীয় জীবনাদর্শ স্বেচ্ছাচাবী ভোগী ইতালীয় হিউম্যানিস্ট্‌কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাডা মাইকেল ছিলেন হিন্দু কলেজেব বিশিষ্ট অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসনের ছাত্র। শেক্‌স্‌পিয়রেব সাহিত্য ও রোম্যান্টিক কাব্যসাহিত্যেব প্রতি শ্রদ্ধা মাইকেলের মনে তিনিই এনে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যগুলি ও অন্যান্য ক্লাসিক্‌স্ সাহিত্য মাইকেল নিজেই পড়েছিলেন। এ ছাডা মাইকেল ছিলেন মিল্টনের পরম ভক্ত। এবং যেহেতু ক্লাসিক্‌সের নির্যাস নিয়েই মিল্টন তাঁব 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যেব রূপ দিয়েছিলেন, সেই হেতুই মাইকেল কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মূল বচনার কাছে ঋণী, কোন্ ক্ষেত্রে মিল্টনের অনুসাবী, তা নির্ণয় করা শক্ত। কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রভাব যে মূলগত তা স্পষ্ট, কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে মূল কবি, মিল্টন এবং মধুসূদন একই কাব্যরীতি প্রয়োগে আমাদের বিভ্রান্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এ আলোচনা করা যাবে।

মাইকেলেব ছাত্রজীবন এবং ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কথা এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করে পরবর্তী জীবনে তাঁর সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে আসা যাবে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন যখন দ্বিতীয়

সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে রামগোপাল ঘোষ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে দুজন স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে ইংরিজিতে প্রবন্ধ লিখতে পারবে গুণানুসারে তাদের দুটি পদক দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পান। সিনিয়র শ্রেণীতে পড়বার সময় মধুসূদন বহু ইংরিজি কবিতা রচনা করেন। সে সব রচনার কিছু কিছু ইংরিজি-বাংলা জ্ঞানান্বেষণে, লিটারারি গেজেটে, লিটারারি ব্লিনারে প্রকাশিত হয়। ইংল্যাণ্ডে বেণ্ট্‌লিস মিস্‌লেনি ও ব্ল্যাকউড্‌স ম্যাগাজিনে মধুসূদন কবিতা পাঠাতেন। এই সব কবিতা রচনায় রিচার্ডসনের বিশেষ উৎসাহ তিনি পেয়েছিলেন। মহাকবি হবার এবং বিলাত যাবার ইচ্ছা তাঁর হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই হয়েছিল।

খৃষ্টান হবার পর তিনি বিশপস্‌ কলেজে ভর্তি হন। কারণ হিন্দু কলেজে খৃষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। এই কলেজেই তিনি গ্রীক-ল্যাটিন-সংস্কৃত প্রভৃতি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে মাদ্রাজ গিয়ে তিনি চারখানি ইংরিজি সংবাদপত্র পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। ১৮৪৮-৪৯ সালে Madras Circulator পত্রে মধুসূদনের 'A Vision' এবং কিছু পরে 'Captive Ladie' কাব্য ও অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। বন্ধু গৌরদাসের অনুরোধে মধুসূদন একখণ্ড 'Captive Ladie' কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি বেথুন সাহেবের কাছে পাঠালেন। বেথুন বইটি পেয়ে গৌরদাসকে যা লিখেছিলেন তার মধ্যেই অনতিপরবর্তীকালে রঙ্গলালের ঘোষণার [রঙ্গলাল সম্পর্কিত আলোচনায় উদ্ধার করেছি] মূল উৎস পাওয়া যাচ্ছে[৩] :

> I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater services to his country and have a better chance of achiev-

ing a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry, at all events he must write.

By all that I can learn of your Vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর হেমচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন :

'দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে বিদেশীব ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হওয়ার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে তাহা Captive Ladie-র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদক কিছু অভদ্রভাবে এবং ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কিছু ভদ্রভাবে মধুসূদনকে বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।'

বেথুনের অভিমত পেয়ে উল্লসিত হয়ে গৌরদাস মধুসূদনকে লিখছেন[৪] :

We do not want another Byron or another Shelley in English ; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali Literature.

এইভাবে বেথুন ও গৌরদাসের মিলিত অনুরোধে মধুসূদন বাংলা কাব্যের চর্চায় মনোযোগী হন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসংকল্প হয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষা-শিক্ষায় মনোযোগী হন। গৌরদাসকে লেখা একটি চিঠিতে [১৮ই আগষ্ট, ১৮৪৯] আছে :

Here is my routine : 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?

এরপর থেকে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাব ও পদ্ধতিকে আত্মসাৎ করাতেই মধুসূদন আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সাহিত্যের ধর্ম বজায় রেখে যদি তার মধ্যে বিদেশী ভাবকে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাতে নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হয় না। সম্পূর্ণটাই বিদেশী হলে তা এদেশীয় সাহিত্যে চলতে পারে না, কিন্তু কৌশলে উভয় সাহিত্যের মিশ্রণে দেশীয় সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি গৌরদাসকে যা লেখেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য [তারিখ নেই। ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৯এর মধ্যে লেখা]:

I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism? Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking; and that is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit. .

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world in borrowed clothes. I may borrow a neck-tie, or even a waist-coat, but not the whole suit.

এই রকম দেশী-বিদেশী আদর্শের সুসমঞ্জস মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মধুসূদন বাংলা কাব্যচর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন। এই ধরনের প্রগতিশীল মনোভাব কোনো বাঙালী কবির ছিল না। বিদেশী কাব্য-সাহিত্য তিনি যা পড়েছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ তাঁর চিঠিপত্রে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করবার প্রস্তুতি হিসাবে সে পরিচয় জানা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮৪১-৪২-এর মধ্যে লেখা চিঠিপত্রের মধ্যে ল্যাটিন কবির উদ্ধৃতি রয়েছে [O tempus !—O Mores]। তখন ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন। পরে মাদ্রাজে থাকতে ল্যাটিন শিখেছিলেন। শেক্স্‌পিয়ারের

বই আদান-প্রদান চলছে গৌরদাসের সঙ্গে সে সময়ে। বায়রনের কাব্য ফেরত দিচ্ছেন গৌরদাসকে। ব্ল্যাকউড্স্ ম্যাগাজিনে কবিতা পাঠাচ্ছেন, উৎসর্গ করছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে। ল্যাটিনে লেখা রোমান ইতিহাসের বই Eutropius চেয়ে পাঠিয়েছেন। ক্রাবের কাব্য ফেরত পাঠাচ্ছেন। বার্নসের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, ক্যাম্পবেল পড়েছেন বলে জানাচ্ছেন, মিউজ বা কাব্যসরস্বতী নিয়ে ঠাট্টা করেছেন, টমাস মুরের লেখা তাঁর প্রিয় কবি বায়বনের জীবনী পড়ছেন। ওথেলো-হ্যামলেট বারবার পডতে চাইছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল রাজনারায়ণকে লেখা এক চিঠিতে 'তিলোত্তমা সম্ভব' রচনা কালে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বলতে গিয়ে মিল্টন, ভার্জিল ও হোমারের কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। পনেরোই মে, ১৮৬০-এর চিঠিতে বলেছেন যে, বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ' না মেনে ইয়োবোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণ করবেন। ইয়োরোপীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যাদর্শ নিয়েও আলোচনা করেছেন। এরিস্‌টট্‌ল, লংগাইনাস, কুইন্টিলিয়ান, সাহিত্যদর্পণ, বার্ক, কামেস (Kames), এলিসন, এডিসন, ড্রাইডেন, ব্লেয়ারের বক্তৃতা, শ্লেগেলের রচনা রাজনারায়ণকে পড়তে বলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ বুঝতে হলে প্যারাডাইস লস্ট বারবার পড়তে হবে বলেছেন। আবার শুধু বায়বন, মুর আর স্কটেব ভক্ত বলে রঙ্গলালকে করুণাও করেছেন। বলেছেন (১ জুলাই, ১৮৬০) :

> As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton, These কবিকুলগুরু-s ought to make a fellow a first rate poet—if Nature has been gracious to me.

পরেব চিঠিতে (১৪ জুলাই, ১৮৬০) লিখছেন, ইটালিয়ান Ottava Rima-তে স্তবক রচনা করে একটি রোম্যান্টিক গাথাকাব্য রচনার অভিপ্রায় তাঁর আছে। ওই চিঠিতেই বলছেন রামের যদি মানুষ সঙ্গী থাকতো তাহলে মেঘনাদের মৃত্যুর ওপর দ্বিতীয় ইলিয়াড লিখতে পারতেন। এই সময়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রথম সর্গ লিখে শেষ করেছেন। পরের চিঠিতে [তারিখ নেই] বলছেন :

> It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own ; in the present poem,

I mean to give free scope to my inventing Power (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki.

আরও বলেছেন :

I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. Before I began this letter, I wrote the following opening lines for the second book of মেঘনাদ।—These lines ought to give you some idea of the Episode that is to follow .

কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি
মেঘনাদ ? কোন দেব, মোহের শৃঙ্খলে,
(কিনা তুমি জান সতি ?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে-এ বিপত্তি কালে ?…

You will at once see whom I imitate

"Who of the Gods impelled them to contend ?
Latona's sons and Jove's"—Cowper's Homer's Iliad.

Milton has imitated this—

"Who first seduced them to that foul revolt ? The infernal serpent"—Book I

পরের চিঠিতে বাংলা ভাষার দ্রুত জড়তামুক্তি এবং নিখুঁত শিল্পকর্মের দিকে সে ভাষার অগ্রগতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ইটালীয় কবি ভিত্তোরিয় আলফায়েরি [১৭৪৯-১৮০৩]-র একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

Really what rapid advances our Language (I feel half-tempted to use the words of Alfiery and say 'Nostrra Divina Lingua') is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

আশ্চর্য এই, মধুসূদন নিজেই এই ঘুম ভাঙানোর কাজ করেছিলেন।

পরে রাজনারায়ণকে লিখছেন যে [১৮৬০ই হবে, তারিখ নেই] মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ পড়তে পড়তে ইলিয়ডের চতুর্দশ সর্গের কথা অবশ্যই মনে পড়বে :

...I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's Visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible.. . .I fancy the versification more *Melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *Roughish* elevation of its predecessor.

এডুকেশন গেজেটে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সম্পর্কে রঙ্গলালের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তরে (১৮৬২ পর্যন্ত রঙ্গলাল গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) মাইকেল একটি চিঠিতে লিখেছেন :

I do not know if you read the Education Gazette If you do, you have no doubt seen the Editor's remark on Blank verse I do not think R. either reads or can appreciate Milton , otherwise he would not have made the remarks in the concluding portion of his article. He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest School of poetry, except, perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better.

ওই চিঠিতেই তারপরে লিখছেন :

I am just now reading Tasso in the original,—an Italian gentleman having presented me with a copy. Oh ! what luscious poetry. If God spares me for some years yet, I shall write a poem, a Romantic one, in the *Ottava Rima* or stanzas of eight lines like this. Perhaps I shall write your "সিংহল বিজয়" in that measure.

পরের চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখছেন যে মেঘনাদবধের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ শেষ করে অষ্টমে হাত দিয়েছেন। ইনিয়াসের মতো রামকেও নরকের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে পিতা দশরথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আর একটি চিঠিতে নিজেই বিস্মিত হয়ে লিখছেন :

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue, would place at my disposal such exhaustless materials; and you know I am not a good scholar.

ওই চিঠিতেই লিখছেন যে হিরোইক পোইট্রি আর লিখবেন না, রোম্যাণ্টিক ও লিরিক কবিতার প্রশস্তক্ষেত্র পড়ে রয়েছে, নিজের মধ্যেও লিরিক্যাল প্রবণতা অনুভব করছেন। আর একটি চিঠিতে মহাকবিদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, সংস্কৃতের কালিদাস, ল্যাটিনের ভার্জিল, ইটালির তাসোকে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। ইংল্যাণ্ডে এমন কোন কবি নেই, যাঁদের এই তিনজনের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসানো যেতে পারে। অবশ্যই মিল্টন ছাড়া। মিল্টন এঁদের চেয়েও মহত্তর (রাজনারায়ণকে লেখা, তারিখ নেই):

Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts, but has little or nothing that may be called amiable He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but he never touches the heart. .. .He is Satan himself.

পরে বলেছেন:

Homer is nothing but battles I have, like Milton, only one That is in Book VII.

তার পরের চিঠিতেই ব্রজাঙ্গনা-প্রকাশের কথা আছে। ব্রজাঙ্গনাকে তিনি নিজেই 'Odes' বলেছেন। এই ধরনের অসমচরণ, প্রশস্তি-মূলক কবিতা আমাদের কাব্যে ছিল না। তারপরে মিল্টন এবং শেক্স্পিয়ার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন কী ভাবে ধ্বনি-সৌন্দর্য ও ছন্দসংগতি বজায় রেখে তিনি তাঁর কাব্যে বিদেশী ভাব গ্রহণ করেছেন। পরের চিঠিতে চিন্তিত হয়েছেন, আর মহাকাব্য লিখলেও মেঘনাদবধকে অতিক্রম করতে পারবেন না হয়তো, হয়তো শেষ কটা দিন লিরিক আর সনেট লিখেই কাটিয়ে দিতে হবে। তবু, মহাকাব্য লেখার নেশা যায় না। বলছেন: 'The idea is intolerable. Give me the সিংহল, old boy.

পরের চিঠিতেই জানিয়েছেন, হিরোইক এপিসিলস্ লিখছেন 'বীরাঙ্গনা' নাম দিয়ে। কেশব গাঙ্গুলিকে একটি চিঠিতে লিখছেন যে, সুভদ্রার প্রথম সর্গ পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্গ পাঠাচ্ছেন। এটিকে অভিনয় করবার নাটক না বলে

নাট্য-কবিতাই বলা উচিত বলছেন। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপীয় ধরনে বাংলায় এই নাট্য-কবিতা ধারার উৎসও তিনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে লিখছেন (তারিখ নেই):

Take my word for it, that Blank Verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, over classic writers . My motto is 'Fire away, my boys'. The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chandra—our Pope, who has 'Made poetry a mere mechanical art, And every warbler has his tune by heart !'

ইয়োরোপের ভের্সাই থেকে লিখছেন (৯ জুন, ১৮৬৪):

Though I have been very unhappy and full of anxiety here, I have nearly mastered French. I speak it well and write it better. I have also commenced Italian and mean to add German to add to my stock of languages—if not Spanish and Portuguese, before I leave Europe.

বিদ্যাসাগরকেও আর একটি চিঠিতে লিখছেন (১১ জুলাই, ১৮৬৪):

You cannot imagine what beautiful poetry there is in Latin. Tasso is really the Kalidasa of Europe. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day, but he has replied it in English.

চারের দশকে মাইকেলকে রোম্যাণ্টিক কাব্য পড়তে দেখা গেছে। তখন, ইংরিজিতেই তাঁর কবিতা রচনার যুগ চলছে। তখন বার্নস, স্কট, বায়রন, শেলি, কীট্‌স্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁদের কাব্যের ছাদেই মধুসূদন তাঁর নিজের কাব্যের কাঠামো তৈরি করেছিলেন। ভাবেও রোম্যাণ্টিকদের উচ্ছ্বাস ও দীর্ঘশ্বাস শোনা যেত, বিশেষ করে বায়রনের উচ্ছ্বাস তাঁকে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু তারপরে বেথুন সাহেবের বা গৌরদাসের অনুরোধে যখন মাতৃভাষায় কাব্যচর্চায় মন দিলেন তখন তিনি বিদেশী মহাকবিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন, এবং তখন থেকেই বন্ধু রঙ্গলাল মিল্টন না পড়ে শুধু রোম্যাণ্টিক কাব্য পড়েন বলে তাঁকে তাচ্ছিল্য করেছেন, আর অনুসরণ করতে

হলে মহাকবিদের highest school of poetry-র অনুসরণ করাই উচিত বলে মনে করেছেন। সমসাময়িক যুগের রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্য, মিল্টন ও শেক্‌স্‌পিয়ারকে অতিক্রম করে কী ভাবে মধুসূদন গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির দেহলিস্পর্শ করলেন তা মোহিতলালের ভাষাতেই প্রকাশ করতে পারি[৫] :

'যে ভাবচিন্তার আঘাতে সেকালের বাঙ্গালী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ চরিত্র ও ইংরেজের শাসননীতিগত আদর্শ—একথা পূর্বে বলিয়াছি; কিন্তু ইংরেজী বিদ্যার মূলে যেমন, তেমনই ইহারও মূলে ছিল সেই গ্রীক্-রোমক সংস্কৃতি—যাহা সেমিটিক বা খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতিকেও অভিভূত করিয়া আত্মার উপর দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত প্রাণমনকে স্থান দিয়াছিল, অতীন্দ্রিয়ের উপবে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা যুক্তি-বাদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সেই সংস্কৃতিই সেকালের বাঙ্গালী মনকে —যে মন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় মধ্য যুগের সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই মনকে আঘাত করিয়াছিল, তাহার সেই পারলৌকিকতা ও mysticism-কে এই নূতন দেহাত্মবাদ বা স্বভাবধর্মবাদ নিরতিশয় বিচলিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের নব ভাবরাজিও তখন পরোক্ষভাবে ইংরেজ পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুর মারফতে নব্য বাঙ্গালীর চিত্তে সংক্রমিত হইতেছিল। অতএব যে সংস্কৃতি একদা য়ুরোপে নবজাগরণ আনিয়াছিল, যাহার ফলে humanities বা মানববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার উপরে স্থান পাইয়াছিল, এবং মনুষ্যজীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা humanismই মানুষকে এক নবধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিল আমাদের পক্ষে তাহা সঞ্জীবন মন্ত্রের মত কাজ করিয়াছিল, সেই মানবতা বা মর্ত্য-প্রীতির প্রেরণাই আমাদিগকে চঞ্চল করিয়াছিল।...

'রামমোহন রায় যাহাকে মনীষার দ্বারা সর্ব প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধুসূদন তাহাকেই প্রাণের মধ্যে লাভ করিয়াছিলেন—সে অনুভূতি যেমন সরল—তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তিনি য়ুরোপের উনবিংশ শতাব্দীকে, এমন কি শেক্‌স্‌পিয়র ও মিল্টনকেও অতিক্রম করিয়া, আরও আদি ও অকৃত্রিম উৎস-বারিতে তাঁহার প্রাণ-পাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি হোমারকে ভুলিতে পারেন নাই, বাংলা গদ্যে হোমারের মূল মহাকাব্যের অসমাপ্ত অনুবাদই তাঁহার শেষ সাহিত্য-কর্ম। য়ুনানীর কবির সেই আদি-কাব্য-প্রেরণার মধ্যেই তিনি আপন প্রাণের

প্রতিধ্বনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিন্ত জীবন-ধর্মের অনুধ্যানে তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি···এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা মানব প্রকৃতির আদিধর্ম, যাহা শাস্ত্রবিধি অপেক্ষাও সত্য ও বলবান, পৃথিবীর মতই যাহা নিত্য নূতন ও চির পুরাতন, যাহা ফুলের মত আপন স্বভাবধর্মেই সুন্দর, পার্থিবতাই যাহার স্বাস্থ্য, বীর্যে ও জীবনবেগে যাহা মহিমাময় এবং পরিপূর্ণ বিকাশের পরে কালের নির্মম কুঠারাঘাতে যাহা করুণ। মেঘনাদবধের কাহিনী ইহারই একটি রূপক,—কবি মানবজীবন ও মানবভাগ্যের সেই পার্থিবতাকে পরমশ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়াছেন।·'

মধুসূদনের মন ক্লাসিক্‌সের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এমনভাবে যে, ছাত্র-জীবনের আদর্শ রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের উল্লেখ পরবর্তীকালের চিঠি-পত্রেও বিশেষ নেই। রঙ্গলাল প্রসঙ্গে দু-একবার মাত্র উল্লেখ আছে। একবার নিজের ভেতরকার লিরিক প্রবণতাকে যখন বুঝতে পেরেছেন, তখন রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র যে পড়ে রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এছাড়া সমসাময়িক রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের সম্পর্কে তাঁর কোনো উৎসাহ দেখি না। আর একটি ব্যাপারেও তাঁর সমসাময়িক যুগের প্রতি উদাসীনতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তিনি ফ্রান্স থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন (২রা জুন, ১৮৬৪ থেকে ২৬শে এপ্রিল, ১৮৬৫) তাতে ইটালিয়ান, জার্মান ও ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করবার সংবাদ আছে। পেত্রার্কের সনেট পড়ে চতুর্দশপদী রচনার প্রেরণা পাচ্ছেন এও জানতে পারছি। কিন্তু স্যাঁৎ বোভ্, র‍্যাঁবো, ত্যেন, ফ্লবেয়ার, গোতিয়ে, বোদল্যের, ল্য কঁৎ দ্য লীল ইত্যাদি তখন ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত লেখক। বিশেষ করে বোদল্যেরের কথা মনে হয়। তাঁর Les Fleurs du Mal ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে, ফ্রান্সের সাহিত্যিক মহলে হৈ চৈ হয়েছে এবং ওই বছরই Les Fleurs du Mal-এর ছটি কবিতাকে অশ্লীল বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি মধুসূদন যখন প্যারিসে, বোদল্যেরও তখন প্যারিসে রয়েছেন। ১৮৬৪তে মধুসূদন ভের্সাইতে গেছেন। বোদল্যেরও প্যারিস থেকে ওই বছরই এপ্রিল মাসে বেলজিয়ামে গেছেন। কিন্তু মধুসূদনের মানসিকতায় এবং চিঠিপত্রে তার কোন স্পর্শ নেই। এসব কথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করা যে, মধুসূদন সেই 'আদি

ও অকৃত্রিম উৎস বারি'তে এমনই নেশাগ্রস্ত হয়েছিলেন যে, সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্য তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করতে পারে নি। হয়তো তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, নতুন বাংলা কাব্য প্রতিষ্ঠায়, যে ক্ষেত্রে 'there is nothing like cultivating and enriching our own tongue'-ই উদ্দেশ্য, সে ক্ষেত্রে ক্লাসিক্‌স্‌ই আদর্শ হওয়া উচিত, যেহেতু সেই আদর্শ সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আগেই বলেছি, বিদেশে গিয়েও তাঁকে দেখেছি, ফরাসী, ইটালিয়ান ও জার্মান —এই তিনটি ভাষা আয়ত্ত করছেন এবং সে ভাষাগুলির ক্লাসিক সাহিত্য পড়ছেন। তিনি বলেছেন: 'I have already opened the door'। কেবলই নতুন নতুন সাহিত্যের রাজ্য আবিষ্কারের দিকে মন তাঁর, নতুন নতুন ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্‌সের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে চলেছেন তিনি। এদিকে দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছেন, এবং তাঁর নিজের ভাষায়, সৃষ্টি-প্রতিভার 'fit' চলে গেছে। কাজেই যে ফ্রান্স ল্যাটিন সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র সেখানে গিয়ে ক্লাসিক্‌সের পাঠক ও ভক্ত মাইকেল কেবল ক্লাসিক্‌সের চর্চাতেই নিবিষ্ট থেকেছেন। এবং ইংরিজি সাহিত্যের সমসাময়িকদের সম্পর্কে যতটা তিনি সচেতন, ইটালিয়ান ফরাসি ও জার্মান সাহিত্যের সমসাময়িকদের সম্পর্কে ততটা হতে পারেন নি, কারণ এই তিনটি ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নতুন, মানসিক স্থৈর্যও অব্যাহত ছিল না।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) মাইকেল যখন লেখেন তখন তাঁর ছাত্র-জীবনের রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শ মন থেকে দূর হয়নি। মাতৃভাষায় তখনও ক্লাসিক আদর্শকে পুরোপুরি প্রয়োগ করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি আসে নি। 'তিলোত্তমাসম্ভব' যখন লেখা হলো তখন মহাকবিদের সঙ্গে তিনি যে পরিচিত তার প্রমাণ চিঠিতেই আছে। কিন্তু সে কাব্যকে পাছে লোকে মহাকাব্য মনে করে ভুল করে সেই জন্যই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন: 'it is a tale heroically told'-এই মাত্র। দেব-দৈত্য মহাকবির দৃষ্টিতে মানুষোচিত হয়ে ওঠেনি, দেব-দৈত্যই আছে, তিনি নিজেই বলেছেন: 'I could not by any means shove in men and women.' রোম্যান্টিক কাহিনীকাব্যের ছাঁদেই দেব-দৈত্যের দ্বন্দ্ব যথাস্বরূপে বর্ণিত হয়েছে।

মাইকেল 'তিলোত্তমাসম্ভব' যখন লিখছেন তখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনারও প্রস্তুতি চলছে। অর্থাৎ গ্রীক পুরাণ তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র 'ব্রহ্মা'র ভূমিকায় গ্রীক দেবপতি জিউসের প্রভাব

আছে। জিউসের মতো মধুসূদনের ব্রহ্মা স্বেচ্ছাচারী, দেবতারা তাঁর প্রজা। 'বিশ্বকর্মা' হোমারের হেফাইস্‌টোসের মতো সূক্ষ্ম শিল্পী। 'নিদ্রা' ও 'স্বপ্নদেবী' গ্রীক ছাঁচে গড়া। তাদেরই অনুসরণে 'ভক্তি', 'আরাধনা' প্রভৃতি দেবীর কল্পনা[৫]। 'বায়ুপতি' হলো গ্রীক দেবতা এওলাস। দেবদূতী এবং দৈববাণীও গ্রীক পুরাণের নকলে। এক্ষেত্রেও বিধির নির্বন্ধ যে অখণ্ডনীয় এই গ্রীক বিশ্বাস দেবতাদের মুখে শুনতে পাওয়া গেছে।

প্রথম দুটি সর্গে এবং চতুর্থ সর্গের প্রারম্ভে বীণাপাণির আহ্বান হোমারের অনুসরণে 'শ্বেতভুজা' শব্দটিও গ্রীক 'লেউকালেনোস' শব্দের অনুবাদ।[৬] কয়েকটি উৎপ্রেক্ষাও হোমার থেকে গৃহীত। যেমন:

> ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,
> মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
> গগনে,·· ··· ১ম সর্গ।

এ উৎপ্রেক্ষা হোমারের ইলিয়াড থেকে নেওয়া[৭]:

> As the dust, when it lies thick in the roadways on a stormy day, is caught up by the blustering wind and rolled into a great and solid cloud. Book XIII.

পবন দেব যখন বিশ্বকর্মাকে আনতে চলেছে তখন যে যমপুরীর দৃশ্য তার চোখের সামেনে পড়েছে তার সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অষ্টম সর্গের প্রেতপুরীর বর্ণনার কোনো পার্থক্য নেই। দান্তে, ভার্জিল ও মিল্টন তখন মাইকেলের মনের প্রেত-পুরীর ধারণা স্পষ্ট করে দিয়েছে। 'মেঘনাদবধে'র মেঘনাদ ও রাবণের মতো 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'ও রাক্ষসদের ওপর ট্র্যাজিক মহিমা আরোপের চেষ্টা হয়েছে। সুনাসীরের উক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে:

> সুন্দ উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
> অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
> অকালে কপাল দোষে। আর কারে ডরি?
> তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
> নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
> অস্ত্র? উচ্চতরু-সেই ভস্ম ইরম্মদে।
> বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
> জিনিল যে বাহুবলে দেবকুল রাজে,

কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীর শ্রেষ্ঠ যারা
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে! চতুর্থ সর্গ।

এই মহিমাই স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে। অচিরেই মহৎ সৃষ্টির উদ্যোগে যে শিল্পী রাশীকৃত উপকরণ সংগ্রহ করছেন, সেই উপকরণের সামান্য কিছু দিয়ে যেন অবহেলায় একটি ক্ষুদ্র প্রতিমা নির্মাণ করলেন। নির্মাণে নিখুঁত বস্তুরূপ নেই, বাহুল্য-আতিশয্যও আছে, তবে তার থেকেই মহাকাব্যের পরিমাণ জ্ঞান তাঁর হয়ে গেল। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই আতিশয্য ও অপরিমাণের কারণ মাইকেলের ছাত্রজীবনের রোম্যান্টিক আদর্শ। 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে' বর্ণনা ঘটনাকে চাপা দিয়েছে। যেন গ্যালারির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যে ছবি দেখছেন সেই ছবিব প্রশংসাতেই মুখর হয়ে উঠছেন। প্রথম সর্গের প্রারম্ভে সরস্বতীকে সম্বোধন করে হৃত দেব-বৈভবের জন্য যে বিলাপ আরম্ভ করেছেন তা অতিদীর্ঘ হয়ে পড়েছে। স্বর্গের প্রতিটি অনুপস্থিত দ্রষ্টব্যের প্রতি পৃথক মনোযোগ দিতে দিতে চলেছেন। তারপর দেবতাদের দুরবস্থার জন্য বিলাপ, দেবকুলপতির বিবাদ, তাঁব পত্নীকে আনবার জন্য স্বপ্ন দেবীর যাত্রা, ধবল শৃঙ্গে সৌন্দর্য-স্বরূপিনী ইন্দ্রাণীর আবির্ভাব, তাঁর যাত্রাপথের বিচিত্র সৌন্দর্য কবিকে অনেকক্ষণ আকৃষ্ট করেছে। তারপর ব্রহ্মলোকের বর্ণনা, সেখানে স্বর্গোদ্ধারের জন্য দেবতারা ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা জানালেন। অতঃপর দৈব-বাণীতে জানা গেল, বিশ্বকর্মার সৃষ্ট তিলোত্তমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সুন্দ উপসুন্দ পরস্পর বিবাদ করে বিনষ্ট হবে। বিশ্বকর্মাকে আনতে চললো পবন। এই যাত্রার সুযোগে কবি ঝড়ের প্রতিক্রিয়া, যমপুরীর বর্ণনা, অবশেষে বিশ্বকর্মার পুরীর বর্ণনা এবং তাঁর ঐশ্বর্যের বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মপুরে এলেন বিশ্বকর্মা। সেখানে তিলোত্তমা সৃষ্টি হলো ধীরে ধীরে। জীবন দান করলেন তিনি। কাম্যবনে বসন্ত এলো, তিলোত্তমা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কবি এই ভ্রাম্যমান সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তিটির নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। লক্ষণীয় যে, পরিবেশের মধ্যে আদিরসের স্পর্শ থাকলেও তিলোত্তমার এই গতিশীল সৌন্দর্য বর্ণনায় সে রসের কোন স্পর্শ নেই। নিছক সৌন্দর্য উপভোগের এই হলো সূচনা। যাই হোক, দৈত্যগণ অতঃপর বিলাসে মত্ত হলেন। জয়ের পূর্ব-স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তিলোত্তমাকে দেখে কাম-মোহিত হয়ে সুন্দ-উপসুন্দ পরস্পর যুদ্ধে রত হলেন, সুন্দ মরলেন। বিলাপে বিলাপে প্রাণ হারালেন উপসুন্দ।

এই কাহিনী কল্পনার জালে চারটি বিস্তৃত সর্গে বাহুল্য পেয়েছে। বর্ণনা মানেই কল্পনার ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে মাইকেল নিজেকে সংযত করেন নি, সমগ্র কাব্যের সামঞ্জস্য রক্ষার কথাও ভুলে গেছেন। গ্রীক পরিবেশ, হোমারিক মহোপমা, রোম্যান্টিক সৌন্দর্য-তৃষ্ণা, উপভোগের তীব্রতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বর্ণনা-বাহুল্যের আশ্রয়, আদিরসাত্মক পৌরাণিক উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির মিশ্রণে নতুন বাংলা কাব্য রচিত হলো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন: 'আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।'[৮]

রঙ্গলালের পদ্মিনী কাব্যে বিষয় ও ভাব প্রকাশের রীতি যে অনেক ক্ষেত্রে নতুন তা আগেই দেখেছি। কিন্তু মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' প্রাচীন বিষয়বস্তুকে রোম্যান্টিক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং উপস্থাপনের বাহন যে ভাষা ও ছন্দরীতি—তাও দেশী-বিদেশী রীতির মিশ্রণে এক নতুন বস্তু।

মধুসূদনের এই বেহিসেবী রোম্যান্টিক মন সংযত হয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১)। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবি প্রথমেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে চলে এসেছেন। মেঘনাদবধ যে সাধারণ সম্মুখ সংগ্রামের ব্যাপার নয়, কৌশলের ব্যাপার, সে ইঙ্গিতও করেছেন কবি। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' প্রায় শত পংক্তি অতিক্রম করে প্রতিপাদ্য বিষয়কে পাওয়া গেছে। সে ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্গে মূল ঘটনা ঘটেছে, তবে তার প্রস্তুতি চলেছে তিন সর্গব্যাপী। 'মেঘনাদবধে' কবিকে অনেক বেশী চরিত্র, বেশী ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই কবি তা আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। কোনো বর্ণনা মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও সংযমকে অতিক্রম করে যায় নি। প্রত্যেকটি verse paragraph অনতিদীর্ঘ, প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও চরিত্র বিকাশ ঘটিয়ে শেষ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন অভিপ্রায়, ভবিষ্যৎ-বাণী বা সঙ্কল্পকে সংহত করা হয়েছে। প্রথম সর্গ থেকেই verse paragraph-এর শেষে 'কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে', 'কত যে মরিল আর কে পারে গণিতে', 'হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিয়া আপনি', 'অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি', 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে' ইত্যাদি পংক্তিগুলি মহাকাব্যিক সংযমের পরিচয়। এই পরিচয়ের প্রশংসা করে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন[৯]: যাঁহারা তীরে বসিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছেন,

তাঁহারা নিশ্চয় দেখিয়াছেন যে নিরন্তর প্রহত তরঙ্গমালা কিভাবে ফেণপুঞ্জে পরিণত হইয়া ওঠে। মধুসূদনের পংক্তি-ব্যূহের পরিণামও সেইরূপ সুদীর্ঘ বক্তব্যের ঘনীভূত ফেণীভবন।...এ গুণের মূলে আছে ক্লাসিক্যাল রীতির আত্মসংযম ও আতিশয্যবিসর্জন। এ গুণে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'

বলা বাহুল্য, এ গুণ ক্লাসিক্স্ পাঠেরই ফল। লঙ্কাপুরীতে ধীরে ধীরে শোকের ছায়া নেমেছে, একে একে বীরের পতন হয়েছে, কিন্তু তাতে কোথাও পরিবেশের তারল্য ঘটেনি। এক একটি শোক যেন এক একটি সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে তুলেছে। যে রাবণ দুঃখ করে বলেছেন: 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' সেই রাবণই সঙ্কল্প নিয়েছেন: 'অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি'। তৃতীয় সর্গে যে প্রমীলাকে আমরা দেখেছি 'পতি-বিরহে কাতরা যুবতী', সেই প্রমীলাই বলেছে: 'পশিব নগরে / বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে / রঘুশ্রেষ্ঠে, এ প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা মম: / নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!' মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের বিলাপকে 'বিলাপ' না বলে নিঃশেষিত শক্তির 'আক্ষেপ' বলাই ভাল। সে আক্ষেপে মথিত ফুলদলের ক্রন্দন-রস নেই,—বজ্রাহত শাল্মলী তরুর সারগর্ভহীন পতনের শব্দ আছে।

হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে!

এ গাম্ভীর্য মহাকাব্যোচিত। দেশী-বিদেশী ক্লাসিক্যাল কবিদের কাছ থেকেই এই সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর মাইকেল চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। তবে কোথাও কোথাও ক্লাসিক্সের মর্যাদা রাখতে গিয়ে কাব্যের সামঞ্জস্য রাখতে পারেন নি। যেমন 'ইনিডে'র অনুসরণে প্রেতপুরীর বর্ণনা। মহাকাব্যের প্রথানুসরণের কথা মনে রেখেও একথা বলা চলে যে, প্রায় সাড়ে তিন শো পংক্তির নরক বর্ণনা প্রাসঙ্গিক দৃশ্য বর্ণনার পক্ষে অবান্তর ও অতি দীর্ঘ মনে হয়। এক্ষেত্রে বিদেশী আদর্শ অনুসরণ তাঁর মতো শিল্পীর পরিমিতিবোধকে নষ্ট করেছে।

যখন 'মেঘনাদবধ কাব্য' লেখা চলছে, তখন মাইকেল রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন:

It is my ambition to engraft the exquisite graces of Greek mythology on our own : in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done.

কিন্তু যে যুগ অতিক্রান্ত তাকে হুবহু ধরে রাখা সম্ভব নয়। সে যুগের মত করে লেখাও অসম্ভব। মাইকেল গ্রীক জানতেন এবং গ্রীককাব্যরসিক ছিলেন। ইলিয়াড ও ওডিসির কাহিনীর উত্তেজনায় তাঁর নেশা হতো। তাই রামায়ণ কাহিনীর 'মহৎ ও স্নিগ্ধ কবিত্বের উপর ইলিয়াড কাহিনীর কঠিন ও দীপ্ত শৌর্যের রঙ' মিশিয়ে 'মেঘনাদবধে' নতুন কাব্য-কল্পনার শক্তি দেখালেন মাইকেল। এর চেয়ে বেশী গ্রীকদের মত করে লেখা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। কারুব পক্ষেই সম্ভব নয়। হোমারের কোনো কোনো চরিত্র ও ঘটনা, গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রীক মহাকাব্যের কোনো কোনো উপমা উৎপ্রেক্ষা 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে সমৃদ্ধ করেছে।

শিব-উমা অনেকটা জিউস-হেরার মতো। জিউসের কন্যা এথেনার মত মহামায়াকে স্বতন্ত্র দেবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে। মেঘনাদবধের স্কন্দ জিউস-হেরার পুত্র আরেসের (যুদ্ধের দেবতা) মতো। মেঘনাদের অন্তিম পরিণতি হেক্টরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের ব্যবহার পাট্রোক্লাসের মৃত্যুতে আখিল্লেওসের, আর খানিকটা হেক্টরের মৃত্যুতে প্রিয়ামোসের আচরণের মতো। প্রমীলা কতকটা হেক্টরের স্ত্রী অ্যাণ্ড্রোম্যাকির মতো এবং কতকটা তাসসোর কাব্যের রণরঙ্গিণী ক্লোরিণ্ডার মতো। আর গ্রীক সাহিত্যের দৈবনির্বন্ধবাদ সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে ঘিরে আছে। হোমারিক দেবতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১০] :

There is a limit to their power, a basic 'so far and no farther' That limit is death. No God can restore life to a man once dead, no will of the gods can reach into the shadowy realm of the departed.

শিলারের Name যখন বলেছিল :

Nor did his immortal mother save the hero divine.

When, falling at Scaean gate, he fulfilled his doom.

তখন গ্রীক দৈবকেই ইঙ্গিত করেছিল। ওডিসিতে এখেনা বলেছে ::

Death is certain and when a man's fate (moira) has come, not even the gods can save him, no matter how they love him ! [moira was a daimon of doom and death.]

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিটি সর্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে, রাবণের মুখে তো বটেই, আমরা সেই 'দারুণ বিধি'র (moira)কথা বারবার শুনেছি।

কয়েকটি ঘটনার ওপরেও ইলিয়াডের ছায়া পড়েছে। ইলিয়াডে যেমন দেব-দেবীরা ছদ্মবেশ ধরে গ্রীকদের বা ট্রোযানদের পরামর্শ দিয়েছে, মেঘনাদ-বধেও তাই। 'মেঘনাদবধে'র দ্বিতীয় সর্গে উমার প্রসাধন এবং শিবকে ভুলিয়ে তাঁকে রাবণের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টা ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের হেরার প্রচেষ্টার স্মৃতি নিয়ে আসে। হোমারের দেবী থেটিস দেবশিল্পী হেফাইস্‌টোসকে দিয়ে দিব্য অস্ত্র গড়িয়ে পুত্র আখিল্লেওসের কাছে দিলেন হেক্টরকে বধ করবার জন্য। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র মহামায়ার কাছ থেকে দিব্য অস্ত্র নিয়ে দেবদূত গন্ধর্ব চিত্ররথকে দিয়ে লক্ষ্মণের কাছে পাঠালেন ইন্দ্রজিৎ বধের জন্য। ইলিয়াডে দেতারা প্রথমে কেউ গ্রীক, কেউ বা ট্রোযানদের পক্ষ নিয়ে অলক্ষ্যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। পরে জিউস তাঁদের ক্ষান্ত করেন। 'মেঘনাদবধে' দেবতারা পুত্রশোকাতুর দুর্জয় রাবণের আক্রমণ থেকে রামকে বাঁচাবার জন্য তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন। শেষে বিষ্ণুর আদেশে গরুড় তাঁদের তেজ হরণ করায় তাঁরা যুদ্ধে বিরত হন। মেঘনাদবধের শেষ সর্গে ইন্দ্রজিতের সৎকার, ইলিয়াডের শেষ সর্গে বর্ণিত হেক্টরের সৎকার অনুষ্ঠানের অনুযায়ী।

গ্রীক্ দৃষ্টিভঙ্গি যে কিছু পরিমাণে মাইকেল আয়ত্ত করেছিলেন, তারও প্রমাণ 'মেঘনাদবধে'র মধ্যে পাই। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'মাইকেল রচনা সম্ভারে'র ভূমিকায় এই গ্রীক-দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মাইকেলের কাব্যকে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সার্থকভাবে দেখিয়েছেন যে, অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টি, পূর্ব সংস্কার মুক্তি, মানবরস এবং ঋজু দৃষ্টি গ্রীক জীবনের এই চারটি বিশিষ্টতা মাইকেলের কাব্য রচনার মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। সৌন্দর্যের সমগ্র-বোধ থেকেই মাইকেলের প্রায় ছ-হাজার শ্লোকের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রায়

নিখুঁত শিল্পই হয়ে উঠেছে। পূর্ব সংস্কার মুক্তির বলে রামায়ণ কাহিনীকে নতুন করে ঢেলেছেন এবং বিদেশী কাব্য-রীতিকে বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করেছেন। মানবরসের রসিক কবি দেব-দানব নির্বিশেষে মানব-স্বভাব আরোপ করেছেন। ঋজু দৃষ্টির বলে জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে কোনো বীরের মুখই থেকে অনাবশ্যক হা-হুতাশ প্রকাশ পায়নি। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের উক্তিই তার প্রমাণ।

কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব 'মেঘনাদবধে' রীতিমতো অনুভব করা যায়, সে হলো গ্রীকদের 'হিরোয়িক কোড'। সে 'কোড' হলো ব্যক্তির বীরত্ব, অহঙ্কার ও খ্যাতির পূর্ণ বিকাশ: 'To strive always for excellence and to surpass all others'[১১].

এই 'ব্যক্তি'র বীরত্ব দেখা গেছে বিশেষ করে মেঘনাদ ও রাবণের মধ্যে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র অবস্থায় যখন মেঘনাদ আক্রান্ত হয়েছেন, তখন তিনি ভয় পান নি। লক্ষ্মণের কাছে তিনি বলেছেন যে, অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সংগ্রাম করতে তিনি রাজি আছেন। এবং সেই ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রকাশ দেখাবার সুযোগ লক্ষ্মণ দিতে চান নি বলেই লক্ষ্মণকে 'তস্কর' বলে নিন্দা করেছেন। মৃত্যুর সময় লক্ষ্মণকে তিনি বলেছেন:

> দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
> ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে রাবণ রুষিলে? ষষ্ঠ সর্গ।

রাবণ যখন যুদ্ধে চলেছেন, তখন মন্দোদরীকে তিনি বলেছেন:

> বাম এবে, বক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি
> আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি
> এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
> মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;—
> রণক্ষেত্রে যাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে?
> বিলোপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব। সপ্তম সর্গ।

মেঘনাদ নিরস্ত্র অবস্থায় যেমন কোনো দেবতাকে স্মরণ করে উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্মণকে আঘাত করেন নি তেমনি রাবণও যখন প্রতিবিধিৎসার জন্য সংগ্রামে নেমেছেন, তখনও কোনো দেবতার আশীর্বাদে ধন্য হন নি। এই আত্মনির্ভরশীলতাই হোমারিক বীরত্বের বিশেষ লক্ষণ[১২]:

> The most striking single feature of the Homeric ethos is the enormous importance attached to individual prowess,

individual pride, individual reputation. Heroes of other epics prize their individuality also, but in none is the drive for self-assertion so ruthless and pride so paramount as in Homer. In Roman or Christian or Indian Epic, it is a function of heroism to submit individuality, however, grandiose, to a higher sanction ; the Homeric hero may not compromise loyalty to his own being with loyalty to any other, human or divine.

এই ব্যক্তিগত কীর্তিকে বৃহৎ ভাবে দেখবার সূত্রেই গ্রীকরা তাদের বীরদের স্মৃতিকে পরবর্তী কালের মানুষের আদর্শ ও উৎসাহের প্রেরণা হিসেবে দেখেছে। সেই জন্য তাদের মূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি বাস্তবের অনুকৃতি নয়, আদর্শেরই রূপায়ণ :[১৩]

The Greek memorial was not for use of the dead but of the living, as an example and as an encouragement to emulation That is why classical Greek portrait statues are not realistic but idealised. Men are not shown old or sick or troubled even if they were so when the statue was carved, but in their idealised prime, with individual blemishes glozed over.

মেঘনাদের চিতার ওপর যখন :

ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে
ভেদি অভ্র, মঠ চূড়া উঠিল আকাশে। নবম সর্গ

তখন কি গ্রীক আদর্শে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কথাই মনে হয় না! কিন্তু মাইকেলের দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে-জ্ঞান এখানে প্রখর। হেক্টরের চিতা নির্বাপিত হয়েছিল জলে নয়, মদ ঢেলে। মেঘনাদ চিতা-ধৌত হয়েছে জাহ্নবীর জলে। হেক্টরের স্মৃতিস্তম্ভ বা মেমোরিয়াল এখানে হয়েছে 'মঠ'।

ইটালিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে মূলেই পরিচিত ছিলেন মাইকেল। বিশেষ করে দান্তে এবং তাস্সোর ভক্ত ছিলেন তিনি। এ সংবাদ তাঁর চিঠিতেই:যে

পাওয়া যায় তা আগেই উল্লেখ করেছি। মনে হয়, মিল্টনের মধ্য দিয়েই এ দু'জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। অষ্টম সর্গের নরক বর্ণনার ক্ষেত্রে মাইকেল একই সঙ্গে দান্তে, ভার্জিল ও মিল্টনকে অনুসরণ করেছেন। দান্তের কাছে মাইকেলের ঋণ এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ মনে হয়। দুটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে।

মাইকেলের পরিকল্পিত তোরণের মুখে লেখা ছিল :

এই পথ দিয়া—
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখভোগে,
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা প্রবেশ এদেশে। অষ্টম সর্গ।

দান্তের নরকের মুখে লেখা ছিল :

Abandon all hope, ye who enter here.

প্যারাডাইস লস্টে [Book I] মিল্টন তাঁরই অনুসরণে বলেছেন : Hope never comes that comes to all.

দ্বিতীয় উদাহরণটি ওই বিষয়েরই। মাইকেলের পরিকল্পিত নরকের তোরণের সম্মুখে রামচন্দ্র দেখেছিলেন :

কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণতনু
থরথরি, ঘোর দাহে কভু বা দহিছে
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি। অষ্টম সর্গ।

নরকের বর্ণনায় এই রকম শীত ও উত্তাপের সংমিশ্রণের ছবি মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে। প্যারাডাইস লস্টের টীকায় Verity উদ্ধৃতি দিয়েছেন Keightly থেকে[১৪] :

This idea of making the pains of Hell consist in cold as well as heat (i e., by alternative) was current in the middle ages. . it seems to have come from the Rabbin (Jewish commentators), for they make the torments of Gehena to consist of fire and of frost and snow.

দান্তের Inferno-তে Charon বলেছে : Woe to you ! depraved spirits ! I come to lead you ...into the eternal darkness, into fire and ice. (III, 86, 87) দান্তের Purgatario-তে রয়েছে : To suffer torments both of heat and cold that Power ordains, (III 31, 32).

প্যারাডাইস লস্টের Book II-এর নরক বর্ণনাতে পাওয়া যাচ্ছে যে পাপীরা

feel by turns the bitter change
Of fierce extremes, extremes by change more fierce
From beds of raging fire to starve in ice
Their soft ethereal warmth, and there to pine
Immovable, infixed and frozen round
Periods of time, thence hurried back to fire,

II. 598-603

এইভাবে মাইকেল মিল্টনের মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে দান্তের কাছে ঋণী। তাসোর কাব্য মাইকেলকে ইতালিয়ান কাব্যরস ও বিশেষ করে ottava rima-র প্রতি আকর্ষণ জাগিয়েছে। প্রথম সর্গে লঙ্কার চরম সঙ্কটে প্রমোদে মত্ত রয়েছেন বলে প্রবল আত্মগ্লানিতে মেঘনাদ বিলাসের উপকরণ, পুষ্পমালা ও অলঙ্কার ইত্যাদি দূরে নিক্ষেপ করেছেন। Gerusalemme Liberata-তে (Book XVI, 31.) এরকম ঘটনা দেখছি। সেখানে Rinaldo-কে দেখছি :

His nice attire in scorn he rent and tore,
For his bondage vile that witness bore ;—
That done,—he hasted from the charmed fort

এ ছাড়া প্রথম সর্গে প্রমীলার বিলাপ আর্মিডার বিলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রমীলা-চরিত্রের ওপর সাধারণভাবে আর্মিডা ও ক্লোরিণ্ডার প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

ল্যাটিন কবি ভার্জিলের কাছে প্রত্যক্ষভাবে মাইকেল অনেক বেশী পরিমাণে ঋণী। অষ্টম সর্গে নরক দর্শনের পূর্বে রামচন্দ্র দেখছিলেন :

অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে, রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বসিয়া ধূমপুঞ্জ, তপ্ত অগ্নিতেজে।

ইনিদের [Aeneid] Book VI-এ দেখতে পাচ্ছি[১৫] :

Aeneas looked off to the side and suddenly saw under a cliff to the left a far-scattered castle surrounded by a

triple wall. Around this, Phlegethon, the rapid river of Hell, flows with rolling flames and hurls up surrounding rocks.

প্যারাডাইস লস্টের Book I-এ পাওয়া যাচ্ছে :

......he views
the dismal situation, waste and wild ,
A dungeon horrible, on all sides round,
As one great furnace flamed, yet from the flames
No light, but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe . .

মাইকেল বলছেন :

সহসা পুরিল—
ভৈরব আরাবে বন, পলাইল রড়ে
ভূতকুল শুষ্ক পত্র, উড়ি যায় যথা,
বহিলে প্রবল ঝড় ।

এই উপমা হোমার, ভার্জিল ও দান্তের মধ্যে আছে । ইনিদের Book VI এ পাচ্ছি : 'Thick as the leaves in autumn strew the woods ......the army stands'. প্যারাডাইস লস্টেও পাচ্ছি : [Book I]

....and called
His legions, Angel forms, who lay embraced,
Thick as autumnal leaves that strew the books
In Vallombrosa . .

ইনিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় । যেমন প্রেতপুরী বর্ণনাতে । প্রথম যখন রামচন্দ্র প্রেত-পুরীর দিকে চলেছেন তখন মাইকেল বর্ণনা দিচ্ছেন :

চলিলা রাঘব শ্রেষ্ঠ, তিমির কানন
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে ।
আগে আগে মায়া দেবী চলিলা নীরবে ।

ইনিদের Book VI-এ Descent to Hades বর্ণনাতে পাওয়া যাচ্ছে :

It was such a trip as one takes in the forest under the trecherous light of a feeble moon, when Jupiter has hid the heavens in shadow and the dark night has taken away colour from nature.

নরক বর্ণনার অন্য একস্থানে মাইকেল বলছেন :

যমদূত হানে দণ্ড মস্তক প্রদেশে,
কাটে কৃমি, বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়া দেহে ছিঁড়ে নাড়ি ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে।

ইনিদের মধ্যে পাচ্ছি :

A huge vulture with a hooked beak, plucking the evergrowing lover and the vitals, tears at the feast and lives under the high breast of Tityus.

নরক অতিক্রম করে রামচন্দ্র দেখতে পেলেন রম্য কানন আর স্বর্ণ সৌধ। পশ্চিমদ্বারে গিয়ে রামচন্দ্র দেখলেন, বংশের নিদান দিলীপ সুদক্ষিণার সংগে বসে আছেন স্বর্ণাসনে। এইখানেই অন্যান্য পূর্ব পুরুষেরা এসে বসেন। পূর্ব পুরুষের এই বাসস্থান ও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-বর্ণনায় মাইকেল ইনিদের Book VI-এর Elysian Fields বর্ণনার অনুসরণ করেছেন। Aeneas তাঁর পিতা Anchises-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে এই fields-এর মধ্যে পৌঁছেছিলেন। মাইকেল বলেছেন :

সত্যযুগরণে
সম্মুখ সমরে হত রথীশ্বর যত
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি ক্ষত্র চূড়ামণি।

ভার্জিলও সেই fields-এ-'the ancient race of Teucer, a most illustrious progeny, great heroes born in better years'-এর বর্ণনা দিয়েছেন। দশরথের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন দৃশ্যটি Anchises-এর সঙ্গে Aeneas-এর মিলনদৃশ্যের প্রায় মর্মানুবাদ।

সবশেষে মিল্টনের কথা। মিল্টন ছাড়া পূর্ববর্তী যে কবিদের কথা আলোচিত হয়েছে তাঁরা সকলেই মাইকেলের শ্রদ্ধেয় কবি। কিন্তু মিল্টন ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। তিনি চিঠিতে এক জায়গায় লিখছেন :

> The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton, many say it licks Kalidas, I have no objection to that. I don't think it is impossible to equal Vergil and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets , Milton is divine.

অন্য চিঠিতে লিখেছেন যে, মিল্টনের Satan-এর মহত্ত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছে। সে মহত্ত্ব মনকে উঁচুতে টানে হৃদয়কে স্পর্শ করে না। মিল্টনের মহাকাব্য-প্রতিভা যেন Satan-এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত এবং প্যারাডাইস লস্টের একটি মাত্র যুদ্ধের অনুসরণেই সপ্তম সর্গে মাইকেল যুদ্ধ এনেছেন। কোন সন্দেহ নেই, Satan-এর মহত্ত্ব মাইকেল রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন রাবণের মধ্যে। সর্বত্রই তিনি elevation of mind-এর দিকে নজর দিয়েছেন। চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে, দ্বিতীয় সর্গ যখন লিখেছেন, তখন কুপার-এর ইলিয়াডের অনুবাদ এবং তারই অনুসারী মিল্টনের প্রারম্ভিক কৌশলটিকে তিনি আয়ত্ত করেছেন। আর একটি চিঠিতে শেক্‌স্‌পিয়ার ও মিল্টনের ব্যবহৃত একটি আদিরসাত্মক উপমাকে কী ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায় তারই পরীক্ষা করেছেন। ইতিপূর্বে মিল্টনের মধ্য দিয়ে কী ভাবে হোমার, ভার্জিল, দান্তে ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করেছেন সেকথা আলোচিত হয়েছে। প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গ মিল্টনের 'Comus' কাব্যের সেবার্ন নদীব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাব্রিনা এবং তাঁর সঙ্গী লিজিয়ার কথোপকথনের অনুসরণে রচিত। তৃতীয় সর্গে প্রমীলা ও মেঘনাদ মৃত্যুপুরী লঙ্কায় যখন সুখী-দম্পতির মতো সোনার সিংহাসনে বসলেন তখন চারদিকেব নৃত্যোৎসবের সঙ্গে মাইকেল তুলনা দিলেন: 'ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর মাঝারে,/গায় পাখী'। আসন্ন বিচ্ছেদের এই সংকেতদানে মধুসূদনের দক্ষতা প্রায় মিল্টনেরই সমধর্মী। মিল্টনও প্যারাডাইস লস্টের চতুর্থ সর্গে আদম ও ইভের মিলনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে ইভের সঙ্গে প্যানডোবার তুলনা এনে তিনি ওই একই ট্র্যাজেডির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাছাড়া প্যারাডাইস লস্টের পঞ্চম সর্গেও দেখি অ্যাডাম ও ইভের নিদ্রা ভঙ্গের বর্ণনার অনুসরণে মাইকেল ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার জাগরণ বর্ণনা করেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুতে যেমন বাবণ খেদ করেছেন, ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন, মিনতি করেন নি ভগবানের কাছে:

'কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।'

প্যারাডাইস লস্টে Satan বলেছে:

Since by fate the strength of Gods
And this empyreal substance cannot fail......

এই গ্রীক fate-এর লীলা মিল্টনকে যেমন আকৃষ্ট করেছে, মাইকেলকেও তেমনি আকৃষ্ট করেছে। এই fate-এর সুযোগ নিয়েই মাইকেল মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত লীলা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে এই বিচিত্র আদর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এইটুকু মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে এই বিচিত্র স্ব-বিরোধী প্রভাবের [গ্রীক অদৃষ্টবাদ ও খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব] ঊর্ধ্বে চলে গেছে মাইকেলের হিন্দুমন। প্রেত-পুরীর কল্পনায় পৃথিবীর তলদেশে যে ভৌতিক-দেশ কল্পিত হয়েছে সেখানে পৌঁছে রাম যখন মায়াদেবীকে প্রশ্ন করছেন যে লঙ্কার যুদ্ধে হত রাক্ষসবীরগণ ও সদ্য নিহত মেঘনাদকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন, তখন মায়াদেবী বলেছেন:

অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত,
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহী পতি।
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যতদিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে, বিধির বিধি কহিনু তোমারে।

কিন্তু ভার্জিলের এই প্রেতপুরী শেষ পর্যন্ত হিন্দু কল্পনার শিবলোকে পরিণত হয়েছে। মেঘনাদের সৎকারের সময় দেখি:

ইরম্মদ বেগে অগ্নি ধাইলা ভূতলে।
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিত সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসব বিজয়ী
দিব্য মূর্তি। বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে,
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে!
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে,

বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি,
পুরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।

এই জন্যই রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন[১৬] :

'ইহাতে [নরক বর্ণনা] হোমর, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অনুকরণ আছে, কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণকারী নহেন। মিল্টন যেমন অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছেন।'

শুধু নরক বর্ণনা নয়, সাধারণভাবেই এই কথা সত্য। সমস্ত বিদেশী অনুকরণের ওপর তাঁর দেশীয় সংস্কার জয়ী হয়েছে। রাজনারায়ণ বসু আরও বলেছিলেন[১৭] :

'পাঁচ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত যে অল্পকালের মধ্যে স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমারের ইলিয়ড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের ন্যায় এবং স্থলবিশেষে করুণ রসের বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি অমিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে!'

এই কারণেই মাইকেল যখন নিজের কাব্য সম্পর্কে রায় দিয়ে বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের কাব্য এই প্রথম, তখন রাজনারায়ণ তাতে সায় দিয়েছিলেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের আগেই [১৮৬১] 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হয়। প্রাচীন বাংলা কাব্যে রাধার অবৈধ প্রেম আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ব্রজাঙ্গনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা। সে রীতি আর কিছু নয়, ওই পুরোনো আধ্যাত্মিক আবরণটিকে রাধার মানবিক দেহ থেকে খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস মাইকেলে নেই। কিন্তু বিরহকে প্রকাশ করবার আন্তরিকতা আছে। কতকগুলি বিষয় অবলম্বন করে (বংশীধ্বনি, জলধর, যমুনাতটে, ময়ূরী, পৃথিবী, প্রতিধ্বনি, উষা, কুসুম, মলয় মারুত, গোধূলি, গোবর্দ্ধন গিরি, সারিকা, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি) সেগুলির অনুষঙ্গে রাধার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে একেবারে মানবিক রূপে প্রকাশ করবার পদ্ধতিটি যুগ-পরিবেশের অনিবার্য ফল। বিদেশী সাহিত্য-রসিক কবির চোখে পদাবলীর মানবিক রস নতুন করে পরিবেশিত হলো।

এরপর ওভিদের Heroides কাব্যের অনুসরণে মধুসূদন লিখলেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য' [১৮৬২]। খৃষ্টের সমসাময়িক যুগের কবি ওভিদ তাঁর উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন অথচ কৃত্রিম রচনারীতির দ্বারা মধ্যযুগের ও রেনেশাঁস যুগের বহু কবির প্রিয় হয়েছিলেন, এমন কি রোমান্টিক যুগের পরবর্তী কবিরাও তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে মাইকেলই ওভিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওভিদের কাব্যে একুশটি চিঠি আছে [তার মধ্যে শেষ ছটি ওভিদের নয় বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন]। মধুসূদনেরও ইচ্ছা ছিল একুশটি চিঠি সম্বলিত কাব্য লিখবেন। কিন্তু এগারোটি সম্পূর্ণ হয়েছিল। পরে কয়েকটির সূচনা করেছিলেন, শেষ করতে পারেন নি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নারী-সমাজের সম্মান ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে রামমোহন থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্য দিয়ে সে আন্দোলন সার্থক হলো। নারীর আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার পিছনে বিদেশী চিন্তাশীলদের বিশেষ দান অবশ্যই ছিল। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের একটা প্রধান অঙ্গ নারী-স্বাধীনতা—এই হলো চিন্তাশীলদের মত। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমর্থন করে মাইকেল তাঁর আয়ের কিছু অংশ চাঁদা বাবদ পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই নারী সমাজের উদ্বোধন প্রচেষ্টার পরিবেশেই বীরাঙ্গনাদের উদ্ভব। এবং উদ্ভাবক তাঁর কাব্যটি উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। ওভিদের মতো মাইকেলও তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে নায়িকাদের ভাব প্রকাশে লিরিক উচ্ছ্বাসের সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু ওভিদের অনুসরণ থাকলেও বর্ণনা-ভঙ্গিতে উভয়ের পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে। ওভিদের চিঠির প্রারম্ভিক পংক্তিগুলি তেমন নাটকীয় নয়, ঘটনার উপস্থাপনেও নাটকীয়তার বিশেষ অভাব। Heroides থেকে কয়েকটি চিঠির প্রারম্ভিক পংক্তি উদ্ধার করে দেখানো যেতে পারে[১৮]:

ক. I, your Phyllis, who welcomed you to Rhodope, Demophoon, complain that the promised day is past, and you not here.

Phyllis to Demophoon.

খ. From stolen Briseis is the writing you read, scarce charactered in Greek by her barbarian hand. Whatever

blots you shall see her tears have made ; but tears too have none the less the weight of words.

Briseis to Achilles.

গ. All fearful, I read what you wrote without so much as a murmur, lest my tongue unwittingly might swear by some divinity. Cydippe to Acontius.

পাশাপাশি বীরাঙ্গনার পত্রিকাগুলির কয়েকটি প্রারম্ভিক পংক্তি বিচার করা যাক :

ক. কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা? গুরুপত্নী আমি
তোমার,...... 'সোমের প্রতি তারা'।

খ. একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
'দশরথের প্রতি কেকয়ী।'

গ. বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি
হ্রেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য, কিন্তু কোন হেতু?
'নীলধ্বজের প্রতি জনা।'

মাইকেলের এই চিঠিগুলি সত্যিকারের dramatic monologue। 'In medias-res'-এ কাহিনীর মাঝখান থেকে কোন একটি চরিত্রকে তুলে ধরে তার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা কিংবা মনোবেদনার ইতিহাস, সামাজিক সম্পর্ক বা পরিবেশের বর্ণনা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। প্রসঙ্গত অন্য চরিত্রের উপস্থিতি, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং উক্তিও বক্তার বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠা চাই। বিদেশী-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি অবলম্বন করে মাইকেল তাঁর যুগের একটা বিশিষ্ট ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার চিঠিগুলির রচনাভঙ্গি ওভিদের রচনা-রীতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। যেমন শকুন্তলা তাঁর চিঠির শেষের দিকে লিখছেন :

কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে!
জীবনের আশা হায়, কে ত্যজে সহজে!

Phyllis বলছেন:

Hope, too, has been slow to leave me, we are tardy in believing, when belief brings hurt. Even my love is loath to let me think you wrong me.

তারপর Phyllis যেমন বলেছেন:

Oft have I been false to myself in my defence of you; oft have I thought the gusty breezes of the South were bringing back your white sails.

তেমনি শকুন্তলাও প্রতারিত হয়েছেন:

হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ আকাশে;
পবন স্বনন যদি শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি, ...
পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!

Phyllis যেমন অভিমানে বলেছেন:

....after all these, under your own image let be inscribed these words; This is he whose wiles betrayed the hostess that loved him.

তেমনি অভিমানবশে কেকয়ী বলেছেন:

লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,
পরম অধর্মচারী রঘুকুল পতি!

Briseis যেমন বলেছেন:

Whatever blots you shall see, her tears have made, but tears too, have none the less the weight of words.

মাইকেল অনেকটা যেন তারই অনুসরণে বলেছেন তারার মুখ দিয়ে:

লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন কাজলে
লিখিনু.........

Phaedra যেমন অনুপস্থিত Hippolytus-কে বিচলিত করার জন্য কৌশল করে বলেছেন :

> I mingle with these prayers my tears as well, The words of her who prays, you are reading, her tears, imagine you behold !

মাইকেলের তারা এবং সুর্পণখা ঠিক এই কৌশলই নিয়েছেন।

Briseis যেমন তার বিরহক্লিষ্ট শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন Achilles-কে, শকুন্তলাও সেই অবস্থার কথা জানিয়েছেন দুষ্মন্তকে। Brsieis বলছেন :

> Gone is my flesh, and gone my colour, what spirit I still have is but sustained by hope in vain.

শকুন্তলা বলছেন :

> মলিন বাকলে
> আবরি মলিন দেহ, নাহি অন্নে রুচি,
> না জানি কি কহি কারে হায় শূন্য মনে !

এছাড়া ওভিদের নায়িকারা যেমন স্বপ্ন দেখেছেন এবং সে স্বপ্নের বিবরণ জানিয়ে তাঁদের মিলনেচ্ছাকে তীব্রতর করে তুলেছেন, তেমনি মধুসূদনকেও শকুন্তলা ও রুক্মিণীর মধ্যে এই কৌশল অবলম্বন করতে দেখেছি।

কিন্তু ওভিদের অনুসরণ করলেও মধুসূদন কোথাও দেশীয় ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করেন নি। বরং চিঠিপত্রের সম্ভাবনাময় মুহূর্তগুলিকে নায়িকাদের জীবনে আবিষ্কার করে আশ্চর্য দক্ষতায় অনৌচিত্য দোষ এড়িয়ে প্রত্যেকটি নায়িকাকে দেশীয় পরিবেশে জীবন্ত করেছেন। এবং, হোমারিক যুগের সমুদ্র-তীরবর্তিনী প্রতীক্ষাবতাদের থেকে পৃথক করে তুলেছেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার সময়েই [১৮৬০] মাইকেলের সনেট রচনা করবার ইচ্ছা জেগেছিল। রাজনারায়ণ বসুকে তিনি তাঁর প্রথম রচিত সনেটটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। মাইকেলের হাতেই এই নবাগত ইটালীয়ান কাব্যরীতি —'সনেটের' প্রতিষ্ঠা হলো। ছাত্রজীবনে এবং মাদ্রাজে থাকতে ইংরিজিতে তিনি সনেট লিখেছিলেন। বিদেশে গিয়ে পেত্রার্কের রচনায় অনুপ্রেরিত হয়ে বাংলায় 'scribbling' করতে আরম্ভ করেন। তারপর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হলো। মাইকেল তখন ভের্সাইতে।

স্বদেশের প্রতি nostalgia এই বিদেশী কাব্যরীতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। 'উপক্রম' নামক সনেট দুটির শেষেরটিতে কবি বলেছেন যে, পেত্রার্ক যে 'সনেট' লিখে ইটালিতে, তার স্বদেশে, প্রশংসা পেয়েছিলেন, তিনি তাঁরই অনুসরণ করে 'ভারতে ভারতী পদ উপযুক্ত গণি' সেই কাব্যরীতি-রত্নকে উপহার দিয়েছেন। প্রথম সনেটটি লিখেই চিঠিতে লিখেছিলেন:

'In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would rival the Italian.'

বাংলা সনেটের ইতিহাসে ইটালিয়ান আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত সর্বত্র হয়নি, কিন্তু সনেটের কাব্যশিল্পে মাইকেলের অনুসরণে বহু বাঙালী কবি আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্যকে অমূল্য গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাইকেল মোট একশো আটটি সনেট লিখেছেন। নানা বিষয়ে সনেটগুলি লেখা। কোনোটি আত্মকথামূলক, কোনোটি প্রেমমূলক, কোনোটি প্রকৃতি-বিষয়ক, কোনোটি পৌরাণিক বা মানবিক প্রশস্তিমূলক, কোনোটি বা সাহিত্য ও কাব্যবিষয়ক। এ ছাড়াও নানা বিষয়ে সনেট লিখেছেন তিনি। বাংলা দেশের নানা উৎসব ও প্রকৃতি তাঁর বিষয় জুগিয়েছে। রেনেসাঁস যুগে সনেট ছিল প্রধানত প্রেমানুভূতির বাহন। মিল্টনই প্রথম সনেটকে রাজনৈতিক ও নৈতিক জিজ্ঞাসার বাহন করে তুললেন। সাম্প্রতিক কালের কবিরা যে কোনো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত লিরিক উচ্ছ্বাসকে সনেটের আকারে রূপ দেন। মাইকেলও রেনেসাঁস যুগের আদর্শ মানেন নি, মিল্টনের হাতে যে সনেটের বিষয় সার্বজনীন হবার সূচনা দেখা দিয়েছে, তাকেই মাইকেল গ্রহণ করেছেন।

লক্ষণীয় যে, এই সনেটগুলির মধ্যে একটি মিল্টনের অন্যতম গুরু দান্তের উদ্দেশ্যে, একটি সমসাময়িক ফ্রান্সের রোম্যান্টিক-যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি উগোর উদ্দেশ্যে এবং আরেকটি সমসাময়িক ভিক্টোরিয়ান ইংল্যাণ্ডের অন্যতম কবি টেনিসনের উদ্দেশ্যে লেখা। এছাড়া 'ভাষা' ও 'ভারত ভূমি' এই দুটি কবিতায় যথাক্রমে হোরেস থেকে এবং ফেলিকায়া থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং এই উদ্ধৃতির অন্তর্গত ভাব দুটিকে স্বদেশের ভাষা ও স্বদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনায় বিস্তারিত করেছেন। উগো এবং টেনিসন এই দুই জীবিত কবিই মাইকেলের বন্দনা পেয়েছেন। তাছাড়া ছাত্রজীবনে বন্দনা পেয়েছিলেন তৎকালীন জীবিত কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আগেই বলেছি, মাইকেল যখন

ফ্রান্সে, তখন সেখানে উগো-পরবর্তী লেখকদের প্রাধান্য, কিন্তু তাঁদের কোনো উল্লেখ মাইকেলে নেই।

এ ছাড়া কতকগুলি নীতিবিষয়ক কবিতা লিখে বাংলা কাব্যের নতুন দিক-নির্দেশ করে গেছেন মাইকেল। ভের্সাইতে থাকতে 'ভরসেল্‌স্‌ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান' নামক সনেটে মাইকেল পূর্বতন ফরাসী কবিদের কথা স্মরণ করেছিলেন। সনেট রচনার সময়েই তাঁর নীতিকবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল :

> '…আমরা উপর্যুক্ত সুভদ্রাহরণ, তিলোত্তমা ও হিতোপদেশের যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা 'অসমাপ্ত কাব্যাবলি' শিরোনাম দিয়া চতুর্দশপদীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়াছিলাম।'

এই হিতোপদেশ অংশে 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামে তিনটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি সংস্কৃত হিতোপদেশের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নয়। ফরাসী কবি লা ফঁত্যোনের [১৬২১-১৬৯৫] ইসপের গল্প অবলম্বনে কতকগুলি কবিতা আছে।[১৯] লা ফঁত্যোনের 'ওকগাছ ও নলখাগড়া' [Le Cheene et Le Roseau] অবলম্বন করে মাইকেল লিখেছিলেন 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'জুনোর কাছে ময়ূরের নালিশ' [Le paon se plaignant a Junon] অবলম্বনে লিখেছিলেন 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগাল' [Le Corbeau et le Renard] কবিতার অনুসরণে লিখেছিলেন 'কাক ও শৃগালী'র কাহিনী। তবে লা ফঁত্যোন প্রাচীন গল্পের মধ্যেই সবলভাবে নীতি-উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সরল কথার আড়ালে একটু কৌতুকের হাসির আভাসও ছিল। সে সব মাইকেলে নেই।

বাংলা কাব্যরীতি মাইকেলের হাতে নতুন রূপ নিল। শব্দ-চয়নে, শব্দ সৃষ্টিতে, বাক্যের মধ্যে শব্দ সজ্জায়, ছন্দরীতিতে, প্রকৃতি ও আকৃতির দিক থেকে [আকৃতি বলতে ছন্দবন্ধ, পর্ব, পদ ও মিল বোঝাচ্ছি] —বাংলা কাব্যভাষা একেবারে অপরিচিত রূপে বাঙালির অনভ্যস্ত কানে আঘাত করলো। বহু ব্যবহৃত শব্দ, পরিচিত রূপক-উৎপ্রেক্ষা-উপমার বন্ধন কেটে তিনি সংস্কৃত থেকে এবং লৌকিক জীবন থেকে শব্দ নিয়ে, বিদেশী এবং দেশী আদর্শে শব্দ তৈরি করে এবং প্রয়োজন

মতো শব্দকে গড়েপিঠে নতুন শক্তি দিয়ে বাংলা কাব্যকে নতুন রূপে ও গতিচাঞ্চল্যে মণ্ডিত করলেন। লক্ষণীয় এই, নতুন শব্দকে প্রয়োগচাতুর্যের বলে তার অর্থকে স্বয়ংপ্রকাশ করে তুলেছেন মাইকেল। যেমন :

ক। অনন্তর পথে—
চলিল কনক রথ মনোরথ গতি।

খ। ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব গর্জিল অশনি।

গ। উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে।

ঘ। অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ।

ঙ। রসানে মার্জিত
হেমকান্তি সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল।

অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক শব্দ ব্যবহারে শ্রুতিকটুতা দেখা দিলেও [যেমন 'টানিল হুড়কা ধবি হুড় হুড করি', 'ফাঁফব হইয়া সখি, খুলিনু সত্বরে কঙ্কণ বলয়'] কোথাও কোথাও ভাব প্রকাশের পক্ষে অনুকূল হয়েছে। যেমন :

ক. আমি কি ডবাই সখি ভিখাবী রাঘবে ? তৃতীয় সর্গ।

খ. যেমতি তস্কব আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে
পুঁতি যথা রত্নরাশি বাখে যে গোপনে পবধন। চতুর্থ সর্গ।

বিদেশী প্রকাশভঙ্গির অনুযাযী যেসব শব্দ সৃষ্টি করেছেন তার পিছনে রয়েছে গ্রীক বিশেষণভঙ্গি। 'শ্বেতভুজা'র কথা আগেই বলেছি। এছাড়া কারারুদ্ধ বায়ুদল জলদলপতি, দেবাকৃতি, দেবকুলপ্রিয়, রাক্ষস-ভরসা, অগ্নিময় তেজঃ বাজী [fiery steed], উর্মিলা-বিলাসী, বাসবত্রাস, বীরযোনি, জগত-কামনা, দম্ভোলি-নিক্ষেপী ইত্যাদি শব্দগুলি সমাসবদ্ধ, সংক্ষেপিত। মহাকাব্যের ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে এই সংক্ষেপিত বিশেষণগুলির দ্বারা চরিত্রদ্যোতনা করে কবি হোমারের সমধর্মী হতে চেয়েছেন।

প্রবহমান পয়ারবন্ধে ইংরিজি রচনাদর্শ গ্রহণ করেছেন মাইকেল। ফলে বহু ক্ষেত্রে ইংরিজির মতো শব্দ-সজ্জা, ইংরিজির মধ্য দিয়ে ইটালিয়ান ঐতিহ্যের অনুসবণ বহু ক্ষেত্রেই দূরান্বয় ও বন্ধনীপ্রয়োগে ছন্দের প্রবহমানতার মধ্যে ধীর ও দ্রুত লয়ের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ইংরিজির মতো শব্দসজ্জার কথাই ধরা যাক।

ক. যেমতি, মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)

যবে খরতর শরে, গহন কাননে
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি ! প্রথম সর্গ।

খ. কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে,
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধিগৃহ, গিয়াছেন গৃহে। প্রথম সর্গ।

গ. কিন্তু ভেবে দেখ, বীব, যে বিদ্যুৎ ছটা
বমে আঁখি, মবে নব, তাহার পরশে। তৃতীয় সর্গ।

বিশেষ করে যেখানেই উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই ইংরিজি clause-এর মতো করে তাকে প্রকাশ করেছেন। যেমন :

১। দ্বিরদ-রদ নির্মিত গৃহদ্বাব দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা,— দ্বিতীয় সর্গ।

২। হায়, দেবী, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূল শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। প্রথম সর্গ।

বাংলা কাব্যের শব্দ-সজ্জা-রীতিব মধ্যে বিপর্যয় এনে মাইকেল ভাবকে কখনও তরঙ্গিত, কখনো সীমাবদ্ধ, কখনও বা প্রবাহিত করবার চেষ্টা করলেন। একে বলা হয় inversion of the syntax। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিকে মাইকেল অস্বীকার করে বললেন : 'it did not matter'। ইংরিজি ও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য পাঠে তাঁর কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যই মাইকেল 'বরুণানী'কে অগ্রাহ্য করে 'বারুণী'কে গ্রহণ করলেন। যেহেতু বাংলা analytical ভাষা, সেহেতু সংকোচের প্রয়োজনে [অবশ্যই ছন্দের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই] নামধাতুর প্রয়োগ বাড়াতে হোল 'সোম প্রকাশে' [৭ই জুলাই ১৮৭০] পণ্ডিত মহেশচন্দ্র শর্মা লিখেছিলেন :

'দত্ত মহাশয় তাঁহার কাব্যে এক প্রকার নূতন বাঙ্গালা ভাষা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐরূপ ভাষা যে বঙ্গদেশে কোনো কালে প্রচলিত ছিল এরূপ

বোধ হয় না। এতদ্‌ভিন্ন মেঘনাদবধ কাব্যে ক্লিষ্টতা, সমাপ্ত-পুনরাপ্ততা ও কষ্টতা প্রভৃতি দোষও বহুতর।'

ভোলানাথ চন্দ্র লিখলেন, মাইকেলের বাঙলা পদগুলি ইয়োরোপীয় আদর্শে তৈরি। তৃতীয়ত, প্রাচীন কবিদের ব্যবহৃত অনুপ্রাস যমককে ইংরিজি শিক্ষিতরা অনেকেই অনুমোদন করতেন না। কিন্তু প্রবহমান পয়ারে মিলের অভাব পাঠকের কানে অনভ্যস্ত ঠেকবার ফলে মাইকেলের কাছে অনুপ্রাস যমক প্রয়োজনীয় মনে হলো। কিছুটা আভ্যন্তরীণ মিলের (internal rhyming) কাজ করে বলেই বোধ হয় মাইকেল ওগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

ক. বীর পুত্র ধাত্রী এ কনক পুরী,
দেখ বীরশূন্য এবে, নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর। প্রথম সর্গ।

খ. কি কারণে, কহলো সজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থরথর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিল দেখা। প্রথম সর্গ।

গ. আনীবিলা দশরথ দাশরথি শূরে,
পিতৃপদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম বৃথা। অষ্টম সর্গ।

চতুর্থত, ইংরিজির মতো দূরান্বয় ও বন্ধনীপ্রয়োগের উদাহরণ শব্দ-সজ্জার জন্য উদ্ধৃত তিনটি উদাহরণেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও দু একটি অংশ উদ্ধার করছি:

ক. অশোকবনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবনসখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে। দ্বিতীয় সর্গ।

খ. কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে

রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি), "ডাকিছে কূজনে
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল।… ‥ পঞ্চম সর্গ।

গ. পশিলা পুরে বক্ষঃ অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবে উল্লাসে,
অট্টহাসি বক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহে। সপ্তম সর্গ।

পঞ্চমত, ইংরিজির মাধ্যমে, বিশেষ করে মিল্টনের মাধ্যমে, অনেক ইটালিয়ান ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে মাইকেল আত্মসাৎ করেছেন। তাসোর অনুসরণে মিল্টন তাঁর সতত-গম্ভীর ভাষায় ধ্বনিস্পন্দনের মধ্যে (মিল্টন সম্পর্কে মাইকেলের মন্তব্য স্মরণীয় : We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the fore t) শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য আনবার চেষ্টা করেছেন। দেখতে পাওয়া যাবে, শুধু মিলের অভাব পূরণের জন্য বা অন্তর্লীন মিল সৃষ্টি করবার জন্যই কাব্যভাষায় শব্দালঙ্কার ও শব্দসজ্জার বিপর্যয় আনেন নি তিনি। বোধহয় মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের একঘেয়েমি দূর করবার জন্যও এই কৌশলের প্রয়োগ। মিল্টনের এই শব্দ-শ্লেষ, যমক, ধ্বনিব্যঞ্জনার প্রতি ঝোঁক, বাক্যের শব্দ-প্রয়োগে বিপর্যয় সম্পর্কে F. T. Prince লিখেছেন[২০] :

In Milton's epic poetry there is an incessant, sometimes obtrusive, activity of mind at the level of verbal wit : there is play upon words, sometimes in puns, sometimes in emphasizing the jingling qualities of words of different or kindred meaning, sometimes in twisting grostesquely ingenious complexities of syntax. These freaks of fancy are combined with a remorseless chopping of logic, above all in speeches, which has a similar effect.

The effect is, above all, to compensate for the somewhat stupefying power of the 'magnificent' diction, to add possiblities of surprise to a technique of which one of the chief dangers is monotony. The play upon words and the metaphysical or logical conceits are not indeed alien to the epic style, for ingenuity is here omnipresent in one form or another, it is present in the artificial word-order and in the music of the verse no less than in the assiduous search for what is astounding in thought and image and emotion.

যেমন :

ক Serpent, we might have spar'd our coming hither,
Fruitless to me, though Fruit be here to excess.

[P. L. Book IX *ll* 647-48]

খ Which tempted our attempt, and wrought our fall

[P. L. Book I *l* 642]

গ. him who disobeys
mee disobeys [P. L. Book V *ll* 611 12]

ঘ. Thoughts, which how found they harbour in the breast
Adam, misthought of her to thee so dear ?

[P. L. Book IX *ll* 288-9]

মিল্টনের গুরু তাসোর মধ্যেও দেখছি[১২] :

ক. But of the plants once more who speaks not the plaint. [Mondo Careato, Giornata Terza]

খ. Not avarice, nor infamous famishment for gold

[Ibid, Giornata Terza]

গ. Altri son della mano a' vezzi avezzi
(others are skilled in the charms of the hand) [Ibid]

মাইকেলের মধ্যেও এই সচেতনতা—অনুপ্রাস, ধ্বন্যর্থের প্রতি ঝোঁক, যমক ও শব্দ সজ্জার বিপর্যয় রূপে দেখা গেছে। যেমন :

'সেকালের বাঙ্গালী সন্তান বলিয়া মধুসূদনের একটা সুবিধা হইয়াছিল—তিনি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্য বাল্যকালেই পড়িয়াছিলেন এবং সেজন্য খাটি বাংলাও যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনি তাহার ছন্দেও তাঁহার কান অভ্যস্ত ছিল। ইহার পর ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই বাংলা ভাষা ও ছন্দের যতখানি শিল্পোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কার্যতঃ তিনি তৎকাল প্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন, এবং ভারতচন্দ্র হইতে তিনি ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গির স্থান সম্বন্ধে, বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের ওই চরণ এবং ভাষার কথঞ্চিৎ মার্জিত সাধুরীতি এবং ছন্দের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু ইঙ্গিত—ইহার বেশী কিছু তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের নিকট হইতে পান নাই, এবং ইহাই সম্বল করিয়া তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।......মধুসূদন নিজে তাঁহার এই ছন্দের নির্মাণ-কৌশল সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নাই।... তিনি যে মিল্টনের ছন্দের আদর্শেই এই বাংলা ছন্দ গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মিল্টনের পূর্বে যেমন Marlowe, Shakespeare—বাঙালী কবির গুরুও তেমনই মিল্টন। বাংলা ছন্দের আদর্শ সন্ধান করিতে হইবে ইংরাজী কাব্যে—এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে!

'মিল্টনের সেই five stress line-এর মাপে বাংলা পয়ারের মাপে যে অনেকটা মেলে, তাহা বুঝি, কিন্তু তাহার সেই five-stress, আর এই একটানা সুরের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ—ইহাদের মধ্যে মিল কোথায়? তবে মধুসূদন তাহাতে হটিলেন না, তিনি নাকি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিয়াছেন—বাংলার পশ্চাতে তাহার জননী (বা মাতামহী) রূপে দাঁড়াইয়া আছে সংস্কৃত, অতএব ফরাসী ভাষার মত ভাষাতেও যাহা সম্ভব হয় নাই, বাঙলায় সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে সম্ভব হইবে। ইহাতে না হয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার সুন্দর ও সুগম্ভীর শব্দরাজি আহরণ করিবার উপায় হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজী five stress line-এর সেই rhythm কেমন করিয়া আমদানি করা যাইবে?

'বাঙলা ছন্দের ওই মাপটি বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই মাপটিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভরসার কারণ হইয়াছিল। ইংরাজি blank verse-এর চরণে যে দশটি অক্ষর (syllable) আছে, তাহা বাঙলা বর্ণমাত্রিক অক্ষর নয়—তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যে একটি করিয়া হসন্তবর্ণ থাকে, তাহার জন্য, কালের হিসাবে সে চরণের মাপ আমাদের পয়ারের মাপ অপেক্ষা বরং একটু বেশীই হইবে।

'অতএব এই মাপটি বড়ই ভালো পাওয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঠিক ঐ চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ তৈয়ারী না থাকিলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা সম্ভব হইত না। বাংলায় যে এই ছন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ ভাষার প্রকৃতিবশে পয়ার সেই ১৬ মাত্রার সকল উপসর্গ দূর করিয়া খাঁটি চৌদ্দ বর্ণের চরণে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। সেই চরণকে লইয়াই মধুসূদন তাঁহার ছন্দকে তরঙ্গিত এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দ-প্রবাহকে কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মাপ একটা বড় কথা; চৌদ্দ অক্ষরের তটসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিয়া চলিয়াছে, তাহা ঐ rhythm বা তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড় রহস্য। এই মাপ যদি ঠিক না থাকে, তবে এ ছন্দের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়; তখন তাহা গদ্য কিংবা অন্য কোন ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়।'

ইংরিজি সাহিত্যে নাটকেই প্রথম প্রবহমান ছন্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। নাটক এবং কাব্যের প্রবহমান ছন্দের মধ্যে যে পার্থক্য থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই মাইকেল কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখছেন:

The verse is what in English we would call, 'Alexandrine' i e. containing 6 feet. The longest verse in our language is 7 footed পয়ার—but that is like the Greek and Roman Hexameter, too long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is 'heroic' measure.

তিনি মিল্টনের দৃঢ়বন্ধের প্রবহমান ছন্দের আদর্শকেই নিয়েছিলেন। কারণ মিল্টনও নাট্যকাব্য এবং বিশুদ্ধ কাব্যের ছন্দগত পৃথক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের

কথা ভুলে যান নি। শেকস্‌পিয়ার যে স্বাধীন পদ-ভাগে blank verse ব্যবহার করেছেন, মিল্টন সে স্বাধীনতাকে সুশৃঙ্খলতায় বেঁধেছিলেন। তা ছাড়া মহিমান্বিত অসম যতিবিভাগের পদগুলিকে এক একটি verse paragraph-এ তিনি যে ভাবে গ্রথিত করেছেন তাতে মিল্টনের এই ছন্দ আশ্চর্য সংহত হয়েছে। মধুসূদনের এই ছিল আদর্শ। পয়ারকে নাট্য-সংলাপের পক্ষে বেশী দীর্ঘ এবং মহিমাব্যঞ্জক বলে তিনি মনে করতেন বলে অপেক্ষাকৃত লঘু যতিবিভাগ ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছেন এবং তার ফলে 'পদ্মাবতী' নাটকে (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) মুক্তকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে :

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী ?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল ?)
যাই এবে স্বর্গে। (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—
(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)
(প্রকাশ্যে) দেবি, আশীর্বাদ করি।
ইত্যাদি

এ ছাড়া 'বিবিধ কাব্যে'র অন্তর্গত নীতিগর্ভ কাব্য পর্যায়ে এগারোটি কবিতায় মাইকেলের মুক্তক রচনার পরীক্ষা লক্ষণীয় (গদা ও সদা, ময়ুর ও ময়ুরী, কুক্কুট ও মণি ইত্যাদি)।

বাঙলা ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো সনেটের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা। ছাত্র জীবনের রচনায় Sonnets : To a Star during a cloudy night নামে নটি সনেট-গুচ্ছ এবং Sonnet: Written at the Hindu College নামে একটি সনেট পাওয়া যাচ্ছে। এই রচনায় মিল বিন্যাসে খানিকটা পেত্রার্কের অনুসরণ এবং খানিকটা স্বাধীন ভাবে রচনার আভাস পাওয়া যায়। তখনও বাংলায় সনেট লেখেন নি তিনি। তবে সনেট রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে প্রথম জীবনেই কবির সচেতনতা এবং Iambic

heroic verse-এর প্রতি অনুরাগ পরবর্তী জীবনের বাংলা কাব্যের (সনেটের তো বটেই) নতুন ছন্দবন্ধ রচনার সহায়ক হয়েছিল। মাদ্রাজে থাকতেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে দুটি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা সনেটের সূত্রপাত ১৮৬০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। সেই সময়েই বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে সনেটের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন রাজনারায়ণ বসুকে। পরে ১৮৬৫-তে ভের্সাইতে থাকার সময় পেত্রার্কের সনেট পড়ে আবার সনেট রচনায় আগ্রহী হন। ঐ বছরই ২৬শে জানুয়ারী গৌরদাসকে তিনি চারটি সনেট পাঠিয়ে সঙ্গে মন্তব্য জুড়েছেন :

> I have been lately reading Petrarca—the Italian poet, and scribbling some sonnets after his manner. I dear say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully well in our language. [চতুর্দশপদী কবিতাবলী : ভূমিকা : সা. প সং.]

তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশিত হয় ১৮৬৬-র ১লা আগষ্ট। তার পরও কিছু সনেট লিখেছিলেন তিনি। এবং আগেই বলেছি তাঁর সনেটের মোট সংখ্যা হলো একশ' আট।

ফর্মের দিক থেকে কিছুটা পেত্রার্কের সঙ্গে মিল থাকলেও (অষ্টকের দুটি মিলের প্রয়োগ) তাঁর Laura poems এর রচনাদর্শ মধুসূদন প্রায় গ্রহণই করেন নি। শেকস্‌পিয়ারকেও ফর্ম বা বিষয়বস্তুর দিক্ থেকে বিশেষ অনুসরণ করেন নি। তবে মিলটনের আদর্শ এবং রোম্যান্টিক যুগে পেত্রার্কীয় আদর্শের ভিত্তিতে ইংরেজ কবিদের স্বাধীন রচনাদর্শ মধুসূদনকে উৎসাহিত করেছিল মনে হয়।

ইটালিয়ান সনেটের পংক্তি-মাপের আদর্শ একাদশ দল। ফরাসী সনেট সাধারণত দ্বাদশ দলে রচিত। ইংরিজি সনেটের স্বাভাবিক মাপ দশ দল পংক্তি। বাঙলায় মাইকেল ইংরেজি পঞ্চদ্বিদল পর্বিক heroic verse-এর বিকল্প চতুর্দশ মাত্রিক পয়ারবন্ধেই তাঁর আদর্শ পেয়েছিলেন। (পূর্বে উদ্ধৃত মোহিতলাল মজুমদারের উক্তিটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়) তাঁর এক শ' আটটি সনেটের মধ্যে[২৪] পাঁচটিতে (বঙ্গ ভাষা, কাশীরাম দাস, জয়দেব, মেঘদূত ২, পুরুলিয়া) শেকস্‌পিরীয় মিল দিয়েছেন। সেখানেও কিন্তু বিশুদ্ধ শেকস্‌পিরীয় রীতির তিনটি চতুষ্পংক্তিক শ্লোকের শেষে একটি দ্বিপংক্তিক মিল মাত্র 'বঙ্গভাষা' ও 'কাশীরাম দাস' এই দুটিতে রয়েছে। প্রচলিত পেত্রার্কীয় পংক্তি-মিলে মধুসূদন মাত্র

একটি সনেট লিখেছেন 'কমলে কামিনী'। সেক্ষেত্রেও অষ্টকের মাঝে চতুষ্পংক্তিক বিভাগ বা ষট্‌কের মাঝে ত্রিপংক্তিক বিভাগ রাখেন নি। পেত্রার্কের আদর্শে লিখিত পংক্তি-মিলে লেখা একটি ভালো সনেট হোল 'বিজয়া দশমী'। কিন্তু বেশীর ভাগ সনেটেই স্পষ্ট ভাবে অষ্টক-ষট্‌ক ভাবের বিভাগ রক্ষিত হয়নি। সেদিক থেকে মিল্টনের সনেটের সঙ্গেই তাদের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। জর্জ সেন্টস্‌বেরী মিল্টনের সনেট সম্পর্কে লিখেছেন :[২৫]

> To Milton, indeed, the sonnet is much more than a verse paragraph

এ মন্তব্য মাইকেল সম্পর্কেও প্রযোজ্য। কারণ এক শ' আটটি সনেটের মধ্যে একান্নটিতে মাইকেল ভাবের আবর্তন রক্ষা করেন নি। সাতটি সনেটে দুটি করে চতুর্দশপদী দিয়ে সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। কবিতাগুলি পড়লে দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত একটি কবিতা বলেই মনে হয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে যে পেত্রার্ক-শেকস্‌পিয়ারের প্রেম বর্ণনার আদর্শ তিনি মানেন নি তা আগেই বলেছি। সনেটের অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ বা দ্বাদশ পংক্তিক-দ্বিপংক্তিক ভাগ করে ভাবের আবর্তনও রক্ষা করেন নি। অনুরূপ প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য মধুসূদনের চতুর্দশপদী রচনার ক্ষেত্রেও লক্ষিত হয়। মিল্টনের সনেটে প্রবহমান Blank Verse ব্যবহৃত হয়েছে, মাইকেলও চতুর্দশপদীতে প্রবহমান পয়ারবন্ধ ব্যবহার করেছেন। ফলে মাইকেলকে মিল্টনের অনুগামী সনেটকার বলতে হয়।

'ব্রজাঙ্গনা'কে মাইকেল Odes নামে অভিহিত করেছিলেন। ১৮৬০-এর জুলাইতে বাঙলা কাব্যে নতুন রীতির ছন্দবন্ধ প্রবর্তন করতে গিয়ে মাইকেল রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন :

> I have made up my mind to write (Deo Volente!) three short poems in Blank Verse and then do something in rhyme; don't fancy I am going to inflict পয়ার and ত্রিপদী on you No! I mean to construct a stanza like the Ottava Rima and write a romantic tale in it

প্রকৃত Ottava Rima-র [abababcc] মিল বিন্যাসে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে মাইকেল কোনো কবিতা না লিখলেও পদ-পংক্তির ভাগে এবং মিল বিন্যাসে ও স্তবক রচনায় যে আদর্শ প্রবর্তন করলেন, পরবর্তী কবিদের ওপর

তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। গুপ্তকবিই প্রথম স্তবক গঠনের পরীক্ষা করেছিলেন। মিল বিন্যাসে বৈচিত্র্য না আনলেও একটি বিশিষ্ট পংক্তিকে প্রত্যেক পংক্তিগুচ্ছের শেষে এনে স্তবকের ভাবগত পূর্ণতার আভাস দিয়েছিলেন। রঙ্গলাল তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' দ্বিপদী ত্রিপদী পংক্তির সমন্বয়ে দ্বিপংক্তিক স্তবক রচনায় দীর্ঘ আট ও দশ মাত্রা পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর পদ-পংক্তির বিন্যাসে সুগ্রন্থনার অভাব ও ভাবগত সম্পূর্ণতার অভাব দেখতে পাওয়া যায়। রঙ্গলাল তাঁর সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদেও পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধের শ্লোক বিভাগ ছাড়া স্তবক রচনার চেষ্টাই করেন নি। মাইকেল ইয়োরোপীয় কাব্যের স্তবক বন্ধের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই বাঙলা কাব্যে এই বৈচিত্র্যধর্মী ছন্দবন্ধ রচনারীতির প্রবর্তন করেছিলেন। মিল বিন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে 'ব্রজাঙ্গনা' থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

ক. শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে
কিন্তু সে কি বিরহ অনল, বসুন্ধরে ?
তা হলে বনশোভিনী
জীবন যৌবন তাপে হারাত তাপিনী
বিরহ দুরূহ দুহে হরে।
পুড়ি আমি অভাগিনী,
চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে। পৃথিবীতে ৩।

খ. বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে
কমল আসনে যথা কমলবাসিনী।
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিনি!
এস গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে। যমুনাতটে ৩।

গ. নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল গোপিনী ;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে
শরমে মরম কথা কহিব কেমনে,
আমি দেব, কুলের কামিনী ?

কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কেনা জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে
কাহার বিরহানল তাপে তাপিত সে সরঃ সুশোভিনী ?

গোবর্দ্ধন গিরি ১।

ঘ. সে কালে-জলেবে মন স্মরিলে সে কথা, ক
মঞ্জুকুঞ্জবন,— খ
ছায়া তব সহচরী সোহাগে বসাতো ধরি গ
মাধবে অধীনী সহপাতি ফুলাসন , খ
মুঞ্জরিত তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি, ঘ
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি, ঙ
মলয় সৌরভ ধন, বিতরিত অনুক্ষণ, খ
দাতা যথা রাজেন্দ্র নন্দিনী—গন্ধামোদে চ
মোদিয়া কানন। খ

নিকুঞ্জবনে ৩।

অনেক সময়ে দেখা গেছে, ভাবেব কোমলতা সঞ্চার করতে গিয়ে মাইকেল ছন্দকেও কোমল স্বরাশ্রয়ী করেছেন মাঝে মাঝে। 'বসন্তে' কবিতাটির স্তবক রচনায় যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন কবেছেন। রুদ্ধদলকে সরল কলামাত্রিক রীতির প্রসারিত উচ্চাবণে ব্যবহার করেছেন। যেমন: 'পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল'। এখানে 'চঞ্চল' শব্দটির প্রসারিত চাব মাত্রার উচ্চারণ লক্ষণীয়। তা ছাড়া মুক্তদল শব্দ এবং পংক্তি-শেষের বিজোড় মাত্রার পদ অনেক সময়েই ছন্দে কোমল ধ্বনি-প্রবাহ এনে দিয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ প্রকাশিত 'বিবিধ কাব্য' পর্যায়ে 'দেবদানবীয়ম্' মহাকাব্যেব মাত্র আট পংক্তি লিখেছিলেন মাইকেল। নানা কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে সে কবিতাংশটি:

কাব্যেকখানি বচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি।
কহো কি ছন্দঃ মহানন্দ দেবে
মনীষবৃন্দে, এ সুরঙ্গ দেশে ?
তোমার বীণা দেহ মোর হাতে,
বাজাইয়া তায় যশস্বী হবো.

অমৃত রূপে তব কৃপাবারি
দেহ জননি গো, ঢালি এ পেটে॥

এ ক্ষেত্রে ছন্দের প্রকৃতি-ধর্মে বিশিষ্টতা আছে। ছন্দের ধ্বনি-সৌষম্য বজায় রেখে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের দ্বারা ৬/৬ মাত্রা ভাগে ১২ মাত্রার পংক্তিটি পড়তে হবে। এই নতুন উচ্চারণ-রীতির পরীক্ষা পরে কবি করেন নি। এটি অমিল পংক্তিবন্ধের পূর্ণ স্তবক বলেই মনে হয়। 'পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত' কবিতাটি সমিল প্রবহমান অসমান পংক্তিতে রচনা করেছেন মাইকেল। মিল বিন্যাসও স্বরধ্বনি-নির্ভর 'নীতিগর্ভ কাব্য' পর্যায়ে সমিল মুক্তকের আভাস পাওয়া গেছে সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু দূরান্বিত মিলের যে পরীক্ষা করেছেন তিনি, সে পরীক্ষা রবীন্দ্র-পরবর্তীদের করতে দেখা গেছে। এই পর্যায়ের 'অশ্ব ও কুরঙ্গ' কবিতায় মাইকেল শিথিল মিলে মুক্তকের আদর্শে স্তবকবন্ধ রচনা করেছেন। কবিতাটির প্রত্যেকটি স্তবকেই পংক্তি-বিন্যাসের পার্থক্য আছে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

ক. হয়ের হৃদয় হইল ভয়, ভাবে এ সামান্য প্রশ্ন নয়, ক
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় ক
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার ঘ
কে আমারে দিবে পরিচয় ? ক

স্তবক ৬।

খ. কহিল তুরঙ্গ,—পশু উচ্চ-শৃঙ্গ-ধারী ক
মোর রাজ্য এবে অধিকারী : ক
না চাহিল অনুমতি, খ কর্কশভাষী সে অতি, খ
হও সে সহায় মোর, গ মরি দুই জনে চোর। গ

স্তবক ৮।

'মেঘ ও চাতক' কবিতায় প্রথমে ও শেষে দ্বিপদী পংক্তির মিল রেখে মাঝে যতিপ্রান্তিক মিত্রাক্ষর একপদী পংক্তি দিয়ে স্তবক রচনার আভাস ফুটিয়েছেন। যাই হোক, মাইকেলের হাতেই ইংরেজি stanza formation-এর পরিচয় পেলাম। তিনিই আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, স্তবক কবিতার প্যারাগ্রাফ মাত্র নয়। তার নিজস্ব মূল্য আছে। কবিতার মূল ভাবসূত্রের এক একটি গ্রন্থিই হলো স্তবক, কিন্তু সেই গ্রন্থির মধ্যেও গ্রন্থনার কৌশলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ

ভাব থাকে। কতকগুলি ছোট-বড় পংক্তিকে নানা ভঙ্গিতে যোগ করে মিল সংস্থানে বৈচিত্র্য এনেই সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবতরঙ্গ আনা যায়। উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। একথা মাইকেল রাজনারায়ণকে যে বলেছিলেন রাজনারায়ণের চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে : Meghnad is going through a second edition and a real B.A. has written a long preface, echoing your verdict, namely, that it is the first poem in the language. : মধুস্মৃতি নগেন্দ্রনাথ সোম [১৩৬১] : পৃ. ১৫২।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : [দ্বিতীয় খণ্ড : ১৩৬২] সুকুমার সেন। পৃ. ১২০।

৩। সাহিত্য সাধক চরিতমালা : দ্বিতীয় খণ্ড। মাইকেল মধুসূদন দত্ত : পৃ. ২৪-২৫।

৪। হেমচন্দ্র [প্রথম খণ্ড] : মন্মথনাথ ঘোষ : পৃ. ২৫-২৬।

৫। কবি শ্রীমধুসূদন : মোহিতলাল মজুমদার : পৃ. ১৮-১৯।

৬। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে [দ্বিতীয় খণ্ড : ১৩৬২] এগুলির উল্লেখ করেছেন। পৃ ১১৯।

৭। Iliad Penguin Classics [1951] Ed. by E. V. Rieu, Page 243.

৮। মধুসূদন গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৯। মাইকেল রচনাসম্ভার, মিত্র ও ঘোষ। ভূমিকা।

১০। The Homeric Gods : W. F. Otto. Page 131 দ্রষ্টব্য।

১১। Humanism , Moses Hadas 1960, George Allen and Unwin, London . The Heroic Code. Page 18.

১২। Humanism Moses Hadas [1960] Page 21.

১৩। Ibid. Page 25

১৪। Paradise Lost, Book I aud II. Ed. by A. W, Verity, Cambridge [1915] Page 121-122.

১৫। Aeneid : Tr. by Kevin Guinagh. এই অনুবাদ থেকে Aeneid-এর সব উক্তি গৃহীত হয়েছে।

১৬। মধুস্মৃতি : নগেন্দ্রনাথ সোম [১৩৬১] : পৃ. ১৪০।

১৭। ঐ । পৃ. ১৪৩।

১৮। Heroides : Ovid : Loeb Classical Library : Tr. by Grant Showerman [1947] এই বই থেকে Heroides- এর সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে।

১৯। সাহিত্য সাধক চরিতমালার 'মধুসূদন দত্ত' দ্রষ্টব্য। 'দেশ' পত্রিকায় 'মধুসূদন ও লার্ফতেন' নামে একটি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ি। [৩০ পৌষ, ১৩৬৭]।

২০। The Italian Element in Miltonic Verse : F. T. Prince. Pages 123-124, 126-127, Miltonic Blank verse : The Diction. অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

২১। ১৯ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২২। ২০ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। বাংলা কবিতার ছন্দ : মোহিতলালের মজুমদার। [১৩৫২] ২য় ভাগ ৩য় অধ্যায়. পৃ ৮৮-৮৯।

২৪। এই সম্পর্কে শ্রীনীলরতন সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' পৃষ্ঠা ৭৩-র পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৫। A History of English Prosody, Vol II, Page 217.

পাঁচ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেলের মৃত্যুর (১৮৭৩) পর থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত বাঙলাকাব্যে যে কজন কবি বাঙালী কাব্যপাঠককে সাহিত্যরস জুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর আমরা হেমচন্দ্রকে (১৮৩৮-১৯০৩) প্রায় বিস্মৃত হতে বসলেও এককালে তিনি অন্যতম প্রভাবশালী কবি ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরের বছর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপরে ওই কলেজ থেকে এল. এ পাশ করেন ও বি. এল. উপাধি পান। পড়াশুনা তাঁর যথেষ্ট ছিল। ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্স্ (ইংরিজি ভাষার মারফৎ), শেক্স্পিয়র ও মিল্টনের কবিতা এবং অগাস্টান ও রোম্যান্টিকদের কবিতা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সে প্রভাবকে আকর্ষণ বলাই ভালো। কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না, যা জীবনের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিতে ব্যাপ্ত ও গভীর হতে পারে। বিদেশী কাব্যপাঠে তাঁর মূল কবিব্যক্তিত্বে কোনো পরিবর্তন আসে নি, বিদেশী কাব্যের অংশত অনুসরণ ছাড়া। ইংরিজি কাব্য পাঠে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের জন্যই বৈদেশিক কাব্য-সাহিত্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে প্রধানত তাঁদেরই চিত্ত-বিনোদন করেছিলেন হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের আত্মহত্যার ঘটনাই 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র বিষয়বস্তু জুগিয়েছিল। তবুও এই কাব্যরচনা করতে গিয়ে স্থানে স্থানে বিদেশী কবিদের ভাবগ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লিখেছেন; "......আমি প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন না হইবে জান, পুরুষের শতটান' ইত্যাদি বায়রনের 'man's love of man's life is a thing apart' (Don Juan, Canto. 1) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালোই বলিয়াছিলাম"।[১]

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, চিন্তাতরঙ্গিণী সে যুগের সমস্যাপীড়িত সংসারের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের ব্যর্থ আর্তনাদ। এ কাব্যে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, দেশপ্রেমের পরিচয় আছে, সমাজ সংস্কারের উৎকণ্ঠা আছে, ভিক্টোরিয়ান কবি-দার্শনিকদের মতো নারী-মুক্তির প্রতি সহানুভূতি আছে এবং সমস্ত কিছুকে আবৃত করে আছে রোম্যান্টিক কবিসুলভ বিষণ্ণতা। এ সব লক্ষণই হিন্দুকলেজের শিক্ষায়, বিশেষ করে ডিরোজিওর অধ্যাপনায় শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

এই সমস্ত যুগলক্ষণগুলি চিন্তাতরঙ্গিণীর নায়কের মধ্যে পরিস্ফুট। বিদেশী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের যে দুঃসাহস ও স্বাধীনতাস্পৃহা (শেলীর 'great age'-এর স্বপ্ন এক্ষেত্রে স্মরণীয়) জেগেছিল তাতে সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবার প্রেরণা এসেছিল। আদর্শকে রূপ দেবার উপযুক্ত পরিবেশ তখনই তৈরি হয় নি অথচ ইচ্ছার প্রাবল্য হেতু পরিবেশের অসহযোগিতা নায়কের মনে করুণভাবে বেজেছিল :

ইচ্ছা করে একবার পৃথিবী ঘুরিয়া।
নূতন মানবজাতি আনি হে গড়িয়া।
কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথার পরে কেন ডুবাইল॥
মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা॥
আলো আঁধারিয়া করি কেন দেন বাঁধা॥
মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর।
বিভুপাশে গিয়ে যোড় করি দুই কর॥

'চিন্তাতরঙ্গিণী': সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ : [প্রথম খণ্ড] পৃ. ৮।

ডন জুয়ানের সঙ্গে 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র কয়েকটি পংক্তিগত সাদৃশ্য ছাড়াও সাধারণভাবে বায়রনের প্রভাবেই কাব্যটির অনেক অংশ গড়ে উঠেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। 'ম্যানফ্রেড' কাব্যের ম্যানফ্রেডের cynicism 'চিন্তা-তরঙ্গিণী'র নায়কের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে উভয়েই নিজেদের বিষাদের হেতুকে খুঁজে পান নি। পেয়েছেন নিজেদের মধ্যে। ম্যানফ্রেড বলেছে[২] :

How beautiful is all the visible world !
How glorious in its action and itself !

But we name ourselves its sovereigns, we,
Half-dust, half-deity, alike unfit
To sink or soar, with our mixed essence make
A conflict of its elements, and breathe
The breath of degradation and of pride,
Contending with law wants and lofty will,
Till our mortality predominates,
And men are—what they name not to themselves,
And trust not to each other.

'চিন্তাতরঙ্গিণীর' নায়ক বলেছে :

পৃথিবীর যতজীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়॥ ...
ভেবেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় বহিবার স্থান।
ভীষণ নরককুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥ পৃ. ৪-৫।

শেষ পর্যন্ত ম্যানফ্রেড যেমন প্রকৃতির মধ্যে সান্ত্বনার উৎস খুঁজে পেয়েছে, 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র নায়ক কিন্তু সে সান্ত্বনাও পায়নি :

মনের কামনা কই পুরাতে নারিনু।
মানবমণ্ডলী কই পবিত্র করিনু॥
প্রীতিবারি সমাজেতে সেঁচিলাম কই।
স্বার্থ, দ্বেষ, পরহিংসা নাশিলাম কই॥

কই আপনার মন নিরমল হল।
কই ধর্মপথে মন স্থির হয় বল ॥ পৃ. ১৬।

হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র অনুসরণে এটিও একটি metrical romance। অম্বরের হিন্দু-রাণী দুষ্ট-যবন-লুণ্ঠিত হবার কল্পনায় কবি মধ্যযুগীয় রোমান্সের প্রেম, সংগ্রাম, বীরত্ব ও নারীর প্রতি সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছেন। 'বীরবাহু'র মধ্যে কবি তাঁর হিন্দুসাম্রাজ্য পুনর্গঠনের চেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন:

রত্ন গর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার ॥…
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।
পুনর্বার অলঙ্কারে তোমারে ভূষিব ॥
পুনঃ নির্মাইব পুরী যত হৈল গত।
গঙ্গা যমুনার তীরে ছিল যত যত ॥
বিজয় দুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব।
ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব ॥

'বীরবাহু, কাব্য' [সা. প স.] পৃ. ৪২-৪৩।

এই স্বপ্নের প্রেরণা তিনি বায়রনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলেই আখ্যা-পত্রে তাঁর কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন:

Italia ! oh Italia ! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame,
And annals graved in characters of flame.
Oh God ! that thou wert in thy nakedness,
Less lovely or more powerful, and could'st claim
Thy night, and drive the robbers back, who press
To shed thy blood, and drink the tears of thy distress.

বীরবাহুর প্রমোদ-উদ্যানে যে যোগিনী আবির্ভূত হয়ে বীরবাহুকে তার অতীত বংশ-গৌরবের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছে সেই যোগিনীই প্রাচীন হিন্দু ভারতের বিবেকের প্রতিমূর্তি, পাশ্চাত্ত্যের দাসত্ব থেকে

মুক্তি পাবার প্রেরণা-স্বরূপ। রঙ্গলালের 'পদ্মিনীকাব্যে' আমরা স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ দেখেছি অনুতাপের মধ্য দিয়ে। হেমচন্দ্রের দেশপ্রীতি বলিষ্ঠ স্বপ্নে ভরা। 'বীরবাহুকাব্য' ও পরবর্তী কয়েকটি কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

১৮৬৮তে প্রকাশিত 'নলিনীবসন্ত' নাটক শেক্‌স্‌পিয়রের *Tempest* অবলম্বনে রচিত। ভারতীয় পবিবেশে টেম্পেস্টের ঘটনাটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কবিতাবলী' কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতার সংকলন। বীরবাহু কাব্য প্রসঙ্গে যে হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নেব কথা বলা হয়েছে তা হেমচন্দ্রের কবি-কল্পনার এক দিক, অন্যদিকটি হলো পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উন্নতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সংস্কৃতিগত সহযোগিতার দ্বাবা ভাবতীয় সভ্যতার উন্নয়ন। 'বিন্ধ্যগিবি' কবিতাটিতে কবিব এই মনোভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে :

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংবেজ,
ধরে তার পথছায়া
আবার তোলরে কায়া,
আবাব শিখবে শূন্য কবরে ধারণ
উঠ উঠ গিবিবর করো না শয়ন।
না থাকিলে এ ইংবাজ
ভারত অবণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত
কেবা পথে লয়ে যেত
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জন।

'কবিতাবলী' : [দ্বিতীয় খণ্ড] সা. প. স. পৃ. ১৯৭-১৯৮।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও হেমচন্দ্রের ভারতীয় মন ইংরিজি কবিতার অনুবাদে জাতীয় বা ব্যক্তিগত মনোভাবকে মুদ্রিত করে রেখেছে। ইংরিজি শিক্ষার ফলে জাতীয় ভাবটি আমরা পেয়েছি এবং জাতীয় উদ্দীপনাময় কবিতা রচনার রীতিটি, আগেই দেখেছি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-রঙ্গলালের সময় থেকেই চলে আসছিল। ইন্দ্রের সুধাপান, ড্রাইডেনের Alexander's Feast-এর অনুসরণ। লঙফেলোর Psalm of Life-এর অনুবাদ প্রচেষ্টাতেই 'জীবন

সঙ্গীত' কবিতার সৃষ্টি। 'মদন পারিজাত' পোপের Eloisa to Abelard এবং 'চাতকপক্ষীব প্রতি' শেলির To a skylark-এর অনুবাদ। 'নববর্ষ' কবিতাটি টেনিসনের In Memoriam কবিতার কতকগুলি স্তবকের অনুবাদ।

পরাধীনতার অসহিষ্ণু, বিদেশীয়ানাব প্রতি ব্যঙ্গমুখর এবং সমাজের অনর্থক আচার-বিচাবেব জন্য নিরুপায় অনুশোচক হেমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের গভীরতর স্তরে এক নীতিবাদী অধ্যাত্মবাদী সত্তা ছিল, তাব কিছু কিছু প্রকাশ আমরা 'বীরবাহু' কাব্যে লক্ষ্য করেছি। দেবাসুরের দ্বন্দ্বই হলো হেমচন্দ্রের পরবর্তী বৃহৎ কাব্য 'বৃত্র সংহাবের' (১—১১ সর্গ ১৮৭৫, ১১-২৫ সর্গ ১৮৭৭) বিষয়। ইন্দ্র হচ্ছেন দেবতাদের নৈতিক শক্তি, তাঁব তপস্যাতেই নিযতি অনুকূল হবেন। বহু তপস্যার পব ইন্দ্র সেই শক্তিকে পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনলেন। এদিকে ইন্দ্রকে পবাজিত কবে বৃত্র সিংহাসনে বসলেও নৈতিক দিক থেকে তার পতন আবম্ভ হযেছিল। ইন্দ্রেব এই তপস্যা ব্যর্থ হতো যদি না দধীচি আত্মত্যাগ করতেন। বিশ্বকর্মা দধীচিব অস্থি নিয়ে বজ্র গডলেন। সেই বজ্রে বৃত্র-সংহার সম্ভব হলো। কিন্তু দধীচির আত্মত্যাগেব মধ্য দিয়ে স্বর্গ উদ্ধার—এই বিষয়বস্তুতে 'মহাকাব্যেব বিশালতা'[৩] থাকলেও বচনাব দিক থেকে কবিপ্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তার কাবণ হেমচন্দ্র বিদেশী ভাবেব সংগ্রাহক, অনুবাদক, অনেক দিক থেকে অনুগামী। কিন্তু যে জীবনদৃষ্টির নবীনত্বে মাইকেলের পক্ষে 'transvaluation of ideals and a changed conception of character' সৃষ্টি কবা সম্ভব হয়েছিল, তা হেমচন্দ্রের ছিল না। ফলে বৃত্র-সংহাবের চরিত্রগুলি যেন কপট প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত, অনুভূতির প্রকাশের চেয়ে প্রকাশের ভঙ্গির দিকেই তাদেব নজর বেশী। বৃত্রের পিতৃস্নেহ বীরত্বের উচ্ছ্বাসে ক্ষীণ হয়ে গেছে।

ঐন্দ্রিলার চবিত্রেব মধ্যেও কোন বিবর্তন নেই, তার অহঙ্কার ও দ্বেষ সর্বত্র সমান বজায় আছে, কোন পরিবেশেই তার পবিবর্তন হয নি। অথচ যে লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের প্রতিরূপ হলো ঐন্দ্রিলা, সেই চরিত্রটির মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে ভগ্নোদ্যম ও হতাশা দেখতে পেয়েছি। কাব্যের প্রারম্ভে প্রথম সর্গেই আমরা মিল্টনের গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বের অনুসরণ দেখতে পাই। বিশেষ করে প্যারাডাইস লস্টের Council of the fallen angels in Pandimonium-এর অনুসরণও এই সর্গে দেখতে পাই। অবশ্য পরাজিত দেবতাদের চরিত্রগুলি কীট্‌সের Hyperion-এর নিকটতর বলে মনে হয়। দার্শনিক চিন্তা [ত্রয়োদশ

সর্গ], ভারতের তীর্থস্থান দর্শনে পুণ্যলাভের সংস্কার, বিশ্বসৃষ্টির অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা [একবিংশ সর্গ] এই সমস্ত ধর্মীয় চিন্তা প্যারাডাইস লস্টের অনুসরণে বচনা করা হয়েছে। সমগ্র বৃত্রসংহারের মধ্যেই প্যারাডাইস লস্ট কাব্যের বৃহৎ পটভূমিকা, মর্যাদাবোধ, গাম্ভীর্য ও স্রষ্টার নির্লিপ্ততার ছায়া পড়েছে। 'বৃত্রসংহারে'র চতুর্থ সর্গে এবং দ্বাদশ সর্গেব প্রারম্ভে মাইকেল ও মিল্টনের অনুসরণে বাগ্‌দেবী সরস্বতীব বন্দনা করা হয়েছে। বিদেশী পুবাণেব স্বপ্নদেবী মধুসূদনের কাব্যের মধ্য দিয়ে বৃত্রসংহারে 'স্বপ্নদেব'রূপে দেখা দিয়েছে।

হেমচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের তুলনা করে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য কবেছিলেন,[৪] 'মেঘনাদে মিলটনেব গন্ধ পাইলেও, সে গন্ধ দুর্গন্ধ বলিয়া মনে হয় না। কবিব শব্দ সম্পদে ও ভাবৈশ্বর্যে সে গন্ধ তীব্র ও মনোমোহন বলিয়া বোধ হয়। বৃত্রসংহারে তেমনই দান্তেব ইন্‌ফার্নোর গন্ধ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় কবি যেন সে গন্ধ ঢাকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, পদে পদে যেন সেই ব্যর্থ চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম হইয়াছেন।' এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে যদি নরক-বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কাব্য থেকে কিছুটা উদ্ধাব করি :

মধুসূদন লিখেছেন :

অস্থিচর্মসার দ্বাবে দেখিলা সুরথী
জ্বরবোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণতনু
থর থরি, ঘোব দাহে কভু বা দহিছে,
বাডবাগ্নি তেজে যথা জলদলপতি।

'মেঘনাদবধ কাব্য' : অষ্টম সর্গ।

হেমচন্দ্র লিখেছেন :

দুঃখে বাস,—ধূমময় গাঢ়তর তমঃ
মুহূর্তে মুহূর্তে, ঘন ঘন প্রকম্পন,
সিন্ধুনাদ শিবোপবি সদা নিনাদিত
শরীব-কম্পন হিমস্তূপ চারিদিকে।

'বৃত্রসংহার' : প্রথম সর্গ।

দান্তেব Inferno-তে Charon বলেছে :

'Woe to you, depraved spirits! I come to lead you... into the eternal darkness, into fire and ice. Conto [III, 86,87].

ছন্দস্পন্দ না জাগায় হেমচন্দ্রের এই দান্তের অনুসরণ নির্জীব বলে মনে হয়। যাই হোক্, প্রথম সর্গের পাতাল বর্ণনায় দান্তের অনুসরণ আছে। হেমচন্দ্র নিজেই বলেছেন যে, বহুক্ষেত্রে তিনি দান্তের বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গির নকল করেছেন। বলপূর্বক নারী-হরণের ঘটনাটি তাসোর কাব্যে Sophronia-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘটনাটিকে গ্রীক কাহিনী 'apple of discord'-এর দেশী সংস্করণও বলতে পারি।

বৃত্রসংহারের মধ্যে গ্রীক নিয়তির কিছু পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে। বৃত্রসংহারের সপ্তম সর্গে আমরা নিয়তির তপস্যায় ইন্দ্রকে নিযুক্ত দেখতে পাই। গ্রীক নিয়তির অনুসরণে হেমচন্দ্র নিয়তিদেবীর সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন:[৫] 'নিয়তি হেমবাবুর সৃষ্টি। সত্য বটে গ্রীসিয় দেবতাদিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আছেন। কিন্তু হেমবাবুর নিয়তি গ্রীকদেবীগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতি। হেমবাবুর এই সৃষ্টি অত্যন্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নিয়তি অস্মদ্দেশীয় পুরাণেতিহাসে নাম প্রাপ্ত নহেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলেই ঐশীশক্তির অতীত আর একটি শক্তির অধীন দেখা যায়। …পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন।' ভারতীয় পৌরাণিক বেশে নিজস্ব কল্পনায় নিয়তিকে কবি সৃষ্টি করলেও গ্রীক নিয়তিই কবিকে প্রেরণা দিয়েছে। এই নিয়তিকেই মাইকেল বলেছেন 'বিধির বিধি'।

উনিশ শতকের নবাগত বিজ্ঞান-চেতনার পরিচয় আমরা হেমচন্দ্রের এই বৃত্রসংহারেই পাই। পাঠকের বৈজ্ঞানিক চেতনা পৌরাণিক বিশ্বাসকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে, এই আশঙ্কায় হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন: 'এ পুস্তকে বজ্র সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ বিস্ময় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুসারে বিদ্যুৎছটার প্রকাশ ও বজ্রধ্বনির উৎপত্তিও একই কারণ হইতে হইয়া থাকে। একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র বিজ্ঞানশাস্ত্র নিরূপিত বজ্র নহে। অতএব ইন্দ্রের বজ্রসৃষ্টির পূর্বে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করা বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।' 'বৃত্রসংহারে'র আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের এই বিজ্ঞান-চেতনার দিকটি চমৎকার ভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন:[৬] "কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটি কৌতূহলের ব্যাপার দেখাইব—বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের

ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্নলিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্তন দেখিতেছেন :

'পূর্বে সে নিরখি যেথা ক্ষৌণী সমতল।
পর্বত এখন সেথা শৃঙ্গ বিভূষিত।
লতাগুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগন মার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া।
গভীর সাগর পূর্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে,
তরুরাজি বিরহিত তাপদগ্ধ দেহ।
নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ,
সূর্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহু দূর অন্তরীক্ষ পথে।'

আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে, অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিনখানি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য বিশিষ্ট কাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" 'অত্যুচ্চ বিজ্ঞান' ব্যাপারটি আমাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও একথা ঠিক যে বৈজ্ঞানিক সত্যের এ এক চমৎকার কাব্যরূপ। একবিংশ সর্গ সম্পর্কে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন,[৭] "একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চ শ্রেণীর কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী এবং ত্রিদেব ইহার অভিনেতৃগণ। রুদ্রাণী, এবং ইন্দ্রাণীর অপমানে মর্মপীড়িতা হইয়া বৃত্রবধের পরামর্শ জন্য ব্রহ্মার সদনে গেলেন। ব্রহ্মলোকের বন্দনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ :[৮]

'দেখিলা সে মহাশূন্যে অনন্ত ব্যাপিয়া,
কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি।
ব্রহ্মার পুরীর প্রান্তরেখা-শোভাময়,
অদ্ভুত আলোকে! নীল অনন্তের কোলে
নিরন্তর খেলে যেন ভাস্বর হিল্লোল,
বিবিধ সুবর্ণনীল বর্ণে মিশাইয়া।...
চারিদিকে
ঘেরি সে মহামণ্ডল-কিরণ-পূরিত

পার্শ্ব নিম্ন ঊর্ধ্ব দেশে অপূর্ব মুরতি
নবীন ব্রহ্মাণ্ড রাজি সতত নির্গত।
আভাময় সূক্ষ্মতব তরল কিরণ
সে কেন্দ্রেব চারি ধারে, দূরতর যত,
তত গাঢতর দৃঢ পবমাণু ব্রজ—
বায়ু, বহ্নি, বাবি, ধাতু, মৃৎপিণ্ডরূপে।
ছুটিছে অনন্ত পথে সে পিণ্ডকলাপ
সূর্য, চন্দ্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে,
নানা বর্ণে নানা কায়, অপূর্ব নিনাদে
পূবিয়া অম্বর দেশ, ... '

লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ভূত কবিলেন, হর্বট স্পেন্সর তাহার বিচিত্র ব্যাখ্যা ক'বিলেন। ঘৃণিত বঙ্গদেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধা সিঞ্চিত করিলেন।" হেমচন্দ্রেব এই বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিচয় পরবর্তীকালে রচিত 'দশ মহাবিদ্যাব' মধ্যেও লক্ষ্য কবা যাবে।

'আশা-কানন' (১৮৭৬) allegory-বীতিতে বচিত একটি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানুষের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যক্ষ করাবাব উদ্দেশ্যেই কাব্যটি রচিত। বিশ্বরূপদর্শনেব দৃষ্টিতে কবি যেন যুগেব ভগ্নোদ্যম ও হতাশাকেই ব্যক্ত কবেছেন মনে হয়। 'কবিতাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডেব (১৮৮০) নামপত্রে নতুন জীবনেব উদ্বোধক লংফেলোব একটি পংক্তি: "The soul is dead that slumbers' উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিছু কিছু কবিতা ইংরিজি কবিতার প্রেরণা পেয়ে লেখা। যেমন Childe Harold-এর Thoughts on Greece-এর প্রেরণায় 'মণিকর্নিকা' কবিতাটি রচিত, যদিও কবিতাটির মধ্যে দার্শনিকতার প্রাধান্য রয়েছে। 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রেব যে ব্যক্তিত্বেব দুটি দিকেব কথা বলা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য। গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য শেলী যেমন স্বপ্নাতুর, তেমনি হেমচন্দ্র হিন্দু সমাজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে বলেছেন:

'কাশী মধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটী
অই বিশ্বেশ্বরধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্মের শিখা,

অই মন্দিরেতে লিখা,
অনন্ত কালের কোলে জ্বলে অই দেউটি।'

অন্যদিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলনস্বপ্নের মোহে বলেছেন:

'অই দেখ আনে যারা করিতেছে ঘোষণা
শোন হে আসেয়াবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা।

'ছায়াময়ী' (১৮৮০) দান্তের Divina Commedia-র অনুসরণে রচিত। বিজ্ঞাপনে কবি বলেছেন: 'প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডান্টের লিখিত 'ডিভাইনা কমোডিয়া' নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিযাছি। সেই মহাকবির নিকট আমি কতদূর ঋণী তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোকদৃষ্টে বিদিত হইবে। বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।' বিষয়বস্তুকে 'ডিভাইনা কমেডিয়ার' ইনফার্নোর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। ভারতীয় ও বিদেশী—বিচিত্র রকমের পাপী এবং Ancheron ও Charon-এর প্রতিরূপ বৈতরণীর কাণ্ডারী 'ছায়াময়ী'কে ইটালিয়ান মহাকাব্যের অনুগামী করে তুলেছে। কমেডির ভ্রাম্যমান আত্মা যেমন lunar sphere-এ এসে পড়েছে, 'ছায়াময়ী'তে শোকগ্রস্ত পিতা তেমনি অশ্বিনী নক্ষত্রে এসে পড়েছে।

হেমচন্দ্রের কল্পিত নরকে নিরো, সিরাজউদ্দৌলা, ক্লিওপেট্রা, বিদ্যা, তারা ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সকল রকমের পাপীর সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় চিন্তার বিরোধী বলে এই নরকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ নেই:

'দুষ্কৃতির আছে ক্ষয় সন্তাপ অনন্ত নয়
পরকালে আছে ভোগ মুক্তি আছে পুনঃ।'

বিদেশী ও ভারতীয় পুরাণের সংমিশ্রণে কিন্তু কবির প্রতিভা তেমন সক্রিয় নয়। কাজেই দান্তের কমেডির সৌন্দর্য ও ঐকতান, গভীর অনুভূতি ও কল্পনা 'ছায়াময়ী'তে পাই না।

'দশমহাবিদ্যা'র (১৮৮২) নামপত্রে Faust-এর উদ্ধৃতি আছে। এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে বোধ হয় বিষয়বস্তুরই ইঙ্গিত করা হয়েছে:

Where shall I grasp thee, infinite Nature, where ?...

How all things live and work, and ever blending
Weave one vast whole from Being's ample range!

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শক্তির অনন্ত ঐশ্বর্য উপলব্ধির জন্য যে উচ্চতর জ্ঞান দরকার তাকেই আয়ত্ত করার অভীপ্সা যেন এই কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারদের বিক্ষিপ্ত জ্ঞানে এই শক্তি রহস্যময় থেকে গেছে। কবির মনে হয়েছে, শক্তি ছাড়া জড়ের কোন মূল্য নেই। জড় ও শক্তি মিলেই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস এবং বিজ্ঞান সৃষ্টির বিবর্তনের মধ্যে এই প্রক্রিয়াকে প্রমাণ করেছে। দশটি প্রকাশিত শক্তিরূপিণী মূর্তির মধ্যেই মানব মনের গতির ইতিহাস নিবদ্ধ রয়েছে। আদিম পশুর স্তর থেকে ক্রমে চিন্তাক্ষম মনের অধিকারী হয়েছে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নারীকে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯] আর নারী যদি মানুষের সম্পূর্ণতার রূপ হয় তবে বলা যেতে পারে যে, তান্ত্রিক আদর্শের চরম সৌন্দর্যের রূপটি এখানে উদ্ঘাটিত এবং সেই দিক থেকে কাব্যের প্রারম্ভে সতীহীন শিবের বিলাপের অবতারণা কাব্যিক প্রয়োজনকেই সিদ্ধ করেছে।

দশমহাবিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন:[১০] 'দশ-মহাবিদ্যা বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টি মনে রাখিতে হইবে। যে মহাতত্ত্বের ভিত্তিতে এই গীতিকাব্য দাঁড়াইয়াছে তাহা এক্ষণে Evolution বা ক্রমবিকাশ নামে সুপরিচিত। আমাদের কবি বৃত্রসংহার কাব্যের নানাস্থানে জড়জগতের বিকাশমাত্র দেখাইয়াছিলেন। লাপ্লাস এবং হর্বট স্পেন্সারের অদ্ভুত জড়সৃষ্টিতে তিনি কাব্যের মোহ সিঞ্চন করিয়াছিলেন। উপস্থিত কাব্যে তাঁহার লক্ষ্য জীবজগতের বিকাশ। সেই বিকাশশৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া তিনি মনুষ্যত্বের চরম স্ফূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন।'[১১]

হেমচন্দ্রের 'রোমিও জুলিয়েত' (১৮৯৫) শেক্স্পিয়রের নাটকের ছায়ামাত্র, অনুবাদ নয়। 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি নীতিগর্ভ ও চিন্তামূলক কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতায় শেষ জীবনের অক্ষমতা ও দুর্গতির প্রকাশ আছে। সেই অবস্থার কথা ভেবেই কাব্যের নামপত্রে কুপারের দুটি পংক্তি উদ্ধার করেছেন: 'Renounce all strength divine, And peace shall be for ever thine.'

কয়েকটি কবিতায় বিদেশী কবিতার অনুসরণ আছে। যেমন 'জন্মভূমি' কবিতাটি স্কটের My Native Land কবিতার অনুসরণ। এ ছাড়া কয়েকটি

দেশপ্রেমের কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। যেমন, 'ভারত সংগীত'। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত এই কবিতাটি 'কবিতাবলী' থেকে বর্জিত হয়েছিল। এ ছাড়া কবিতাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য হলো 'ভারত বিকাশ' ও 'ভারত বিলাপ'। 'ভারত সঙ্গীত' ও 'ভারত বিকাশ' কবিতা দুটি ক্যাম্পবেলের ইংরেজ বীরদের যশোগাথার প্রেরণা পেয়ে লেখা। 'ভারত বিলাপে'র মধ্যে জেমস্ টমসনের Rule Britannia-র অনুরণন শোনা যায়। 'হায় কি হলো', 'নেভার নেভার', 'টেনেন্সী বিল' ইত্যাদি সাময়িক বিষয়ের কবিতাগুলির মধ্যে উনিশ শতকের সপ্তম-অষ্টম-নবম-দশকের রাষ্ট্র ও সমাজ আন্দোলনের ছবি ফুটে উঠেছে। 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের অতীত গৌরবের কথা উল্লেখ করেছি। এই স্বদেশীয়ানাই তাঁকে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যা কিছু ঘটছে তার প্রতি স্নিগ্ধ ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করতে প্রেরণা দিয়েছে। সমসাময়িক যুগে ইংলণ্ডের নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ঢেউ এ দেশে এসেছিল হেমচন্দ্র তাকে অভ্যর্থনাই জানিয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজ বিকাশে যেখানে সত্যকার প্রগতি দেখেছেন ['বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে'] সেখানে প্রশস্তি করেছেন। যেখানে অনিষ্ট দেখেছেন ['বাঙ্গালীর মেয়ে'] সেখানেই ব্যঙ্গ করেছেন। আমাদের দেশে সাধারণভাবে নারীদের ['ভারত কামিনী', 'কুলীন মহিলা বিলাপ'] এবং বিধবাদের দুর্ভাগ্যে ['বিধবা রমণী'] হেমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতোই বিচলিত হয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে হেমচন্দ্র সমাজ ও সাহিত্যের যে কোন সৎ আদর্শকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে মাইকেলের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম হেমচন্দ্রেরও আদর্শ ছিল। তিনি রীতি-সচেতন ছিলেন। প্রবহমান ছন্দকে নাট্য-সংলাপের উপযোগী করবার ইচ্ছা মাইকেলের ছিল। কিন্তু 'পদ্মাবতী'র কয়েকটি দৃশ্য ছাড়া (১৮৫৯) তিনি এ রীতি প্রয়োগ করেন নি। হেমচন্দ্র তার প্রায় ন-বছর বাদে 'নলিনীবসন্ত' নাটক রচনাকালে এর প্রয়োগ-পরীক্ষা করলেন। তবে এ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সফল হন নি। কারণ পংক্তির মাপ কখনও কমিয়ে মুক্তকের আভাস এনেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পংক্তি-অতিক্রান্ত প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত এই নাটকে কমই আছে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তিনি মিলহীন যতিপ্রান্তিক পয়ার রচনা করেছেন। উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে:

বৈজয়ন্ত। (বসন্তের প্রতি) আয়, তুই সঙ্গে আয়।
তুমিও নলিনী
এর জন্যে অনুরোধ করোনা আমায়,
রাজদ্রোহী এই ব্যক্তি। আয় সঙ্গে আয়,
হস্তপদে দিব তোর লৌহের শৃঙ্খল,
লবণ সলিল পানে পিপাসা জুড়াবি,
শুষ্ক তৃণ ফলমূল বল্কল নীবস
অসার ধান্যের খোসা, চণক, মটর
জলশুক্তি আদি তোর সুখাদ্য হইবে:
আয় চলে আয়।

বসন্ত। নড়িব না এক পদ,—শত্রুর প্রতাপ
না বুঝিব যতক্ষণ,—পাব পরিচয়
আমা হতে বলবান বিপক্ষ আমার। [প্রথম অঙ্ক]।

দেখা যাচ্ছে, ভাবের প্রবহমানতা নেই, দু-একটি ক্ষেত্রে যতিপ্রান্তিক না হলেও প্রবাহের উচ্ছ্বাস তেমন উপলব্ধি করা যায় না।

'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যে হেমচন্দ্রের কিছু ছন্দবিষয়ক পরীক্ষা দেখা যায়। ভূমিকায় তিনি মাইকেলের পদ্ধতি ও নিজের পদ্ধতির পার্থক্য দেখিয়ে বলেছেন:

> 'আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিল্টন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাংলা ভাষায় সর্বাধিক নৈকট্য সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎ পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।'

তবুও সংস্কৃত শ্লোকের আদর্শে চতুষ্পংক্তিক শ্লোক রচনা করলেও অনেক ক্ষেত্রে শ্লোক অতিক্রম করে পরবর্তী শ্লোকে ভাব প্রবাহিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এ প্রবহমানতা মাইকেলের মতো তরঙ্গবন্ধুর নয়, পয়ারের নির্দিষ্ট স্তিমিত পদক্ষেপ এ প্রবাহমানতাকে নষ্ট করেছে। যেমন:

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলীদ্বয়, গর্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—'সুমিত্র হে, এই—

এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে —কিম্বা অকুশল,
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়,
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড়। 'বৃত্রসংহার' ১মখণ্ড, ৬ সর্গ।

দেখা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র blank verse ও পয়ার, সংস্কৃত শ্লোক ও ইংরিজি কবিতার স্তবকের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। স্তবকের কথা বলছি এই জন্য যে, ভাবের প্রবহমানতার জন্য এই রকম ক্ষেত্রে যেমন শ্লোকের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তেমনি দু'টি চতুষ্পংক্তিক শ্লোক যুক্ত হয়ে আট পংক্তির স্তবকে পরিণত হয়েছে। এবং এই স্তবকও প্রবহমান ভাবের সংহত রূপ নয়। অবশ্য এই স্তবকে-শ্লোকে সংমিশ্রণ কবির সচেতন প্রয়াস নয় বলেই মনে হয়।

মিল ও স্তবকের বৈচিত্র্যে মাইকেল বাঙলা কাব্যের প্রথম সচেতন শিল্পী। মাইকেলের অনুসরণ করেছেন হেমচন্দ্র। তাছাড়া ইংরিজি কবিতার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় এই বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করেছে তাঁকে। যেমন টেনিসনের In Memoriam-এর মিল 'কখ খক':

একি শুনি কার কান্না হেন নিদারুণ,
বুঝিবা জননী কোন হয়ে শূন্য কোল,
কান্দিতেছে হেনরূপে করি উতবোল,
দিবানিশী কেঁদে চক্ষু করেছে অরুণ। [শিশুবিয়োগ: চিত্তবিকাশ]

ব্লেকের The Divine Image-এর মিল কখ গখ:

ফেল তালে তালে তালে,
নীল নীল গ্রীবাতল সুউচ্চ করি
নাচিতিস আগে তুইরে যেমন,
নিকুঞ্জ মাঝারে গরবে ভরি। [স্মৃতিসুখ: চিত্তবিকাশ]

আবার লক্ষ্য করা যায়, একই কবিতার বিভিন্ন স্তবকে মিল। যেমন, 'স্মৃতিসুখ', 'কি হবে কাঁদিয়া'। ব্লেকের The Divine Image কবিতার মধ্যেও এই রীতি দেখতে পাওয়া যায়। ছ-পংক্তি বা আট পংক্তির স্তবকের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের মিলের বৈচিত্র্যহীনতা আছে ('দেশলাইয়ের স্তব', 'বিশ্ববিদ্যালয়ে')। যেমন কক খখ গগ (উইলিয়াম কলিন্সের How Sleep the Brave কবিতার ছ-পংক্তির স্তবকের মিল এই রকম), কক খখ খখ গগ

ইত্যাদি। স্তবক ও মিলের ব্যাপারে হেমচন্দ্র যেন রোম্যান্টিকদের চেয়ে রোম্যান্টিকদের অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছেন বেশী। ব্লেক ও কলিন্‌স ওই যুগেরই কবি। কেবল 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতায় প্রথম পংক্তির মিল শেষ দুই পংক্তিতে ধুয়োর মতো ফিরে ফিরে এসে মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে। 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা', 'অন্নদার শিবপূজা', 'ভাবতভিক্ষা' এই তিনটি কবিতায় হেমচন্দ্র ইংরিজি লিরিক ওডের অনুসরণ করেছেন। স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি এবং ইপোড হচ্ছে যথাক্রমে 'প্রয়োগ' অথবা 'আরম্ভ', 'শাখা' এবং 'পূর্ণ কোরাস'।[১২] 'জয় মঙ্গল গীতে' অর্ধ কোরাস্ ও পূর্ণ কোরাস্ পব পর এই ভাবে স্তবকগুলি সাজানো হয়েছে।

১। পুরাতন প্রসঙ্গ, পুরানো সংস্কবণ প্রথম পর্যায়, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।

২। The Works of Lord Byron, Second Edition, Vol VI, Leipzig, 1866 Act 1 Scene II, page 185.

৩। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'স্বর্গ উদ্ধাবের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়।' সমালোচনা (১২৯৪), পৃ. ৩৪।

৪। সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি হেমচন্দ্র' প্রবন্ধ (১৩১৯)।

৫। মন্মথনাথ ঘোষের 'হেমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য। প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৩১-৩৩৩।

৬। ঐ।

৭। ঐ। দ্বিতীয় খণ্ড: পৃ ১২১-১২৪।

৮। অতি দীর্ঘ বলে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতি সংক্ষিপ্ত করা হলো।

৯। 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কবি হেমচন্দ্র' প্রবন্ধ (১৩১৯)।

১০। মন্মথনাথ ঘোষ: 'হেমচন্দ্র', দ্বিতীয় খণ্ড: পৃ. ২৯০, সঞ্জীবচন্দ্রের সমালোচনা।

১১। ইংরিজি ভাবকে হেমচন্দ্র কীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন তার প্রমাণ হিসাবে হেমচন্দ্রের জীবনীকাব মন্মথনাথ ঘোষ 'দশমহাবিদ্যার' একটি অংশের সঙ্গে টেনিসনের In Memoriam-এর একটি অংশের সার্থকভাবে তুলনা করে দেখিয়েছেন। হেমচন্দ্রের পংক্তিগুলি হলো:

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ!

পরশিতে পুনর্বার সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন ॥
তখন নয়ন ঝরে পূর্ব কথা মনে সরে
সবে যথা নদী প্রস্রবণ। ['সতীশূন্য কৈলাস']

টেনিসনের পংক্তিগুলি :

Tears of the widower, when he sees
A late lost from that sleep reveals,
And moves his doubtful arms and feels
Her place is empty, fall like these
Which weep a loss for ever new,
A void where heart on heart reposed
And where warm hands have prest and closed,
Silence, till I be silent too

১২। শেলির Ode to Naples স্মরণ করা যেতে পারে। কবিতাটিতে Epode Ia, Epode IIa, Strophe I, Strophe II, Antistrophe Ia, Antistrophe IIa, Antistrophe IB, Antistrophe IIB, Epode IB, Epode IIB—এই পর্যায়ে অংশগুলি সাজানো হয়েছে।

ছয়

নবীনচন্দ্র সেন

হেমচন্দ্রের পরেই উনিশ শতকের নবজাগৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় উল্লেখযোগ্য কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। কাব্যের প্রতি অনুরাগ নবীনচন্দ্রের বংশগত। পিতা এবং পিতৃব্যের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ, এ পাশ করে জেনারেল আসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন থেকে বি এ পাশ করেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। কলকাতায় যখন প্রথম কলেজে ভর্তি হতে আসেন তখন কাব্য রচনার সূত্রে শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্যারীচরণ সরকারের সান্নিধ্যে আসেন। প্যারীচরণ সরকারের উৎসাহে এডুকেশান গেজেটে নবীনচন্দ্র ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন। মাইকেলের মতো ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন তাঁর ছিল না। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' বইটি থেকে কোনো ইংরেজ কবি-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের খবর পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করা যেতে পারে।[১]

> 'আমাদের এ কবি বিস্তৃত অধ্যয়নশীল পণ্ডিত কিংবা কোন বিষয়েই ধৈর্যশীল অধীতী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পঠিত বিদ্যা কোন রূপেই বহুপ্রসারী বা গভীর ছিল না। প্রথম পরিচয়ে তাঁহার লাইব্রেরীর গ্রন্থাল্পতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।·····যে বায়রণের সহিত সচরাচর তাঁহার তুলনা করা হয়, যাঁহার নিকট তিনি বহুপরিমাণে ঋণী, এমন আশঙ্কাও করা হয়, সেই বায়রণের Childe Harold ও Hours of Idleness মাত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন, একথা তিনি আমার কাছে স্বীকার করিয়াছেন'।

মাইকেলের মত নবীনচন্দ্রের বিভিন্ন দেশের বিচিত্র সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের উৎসাহ ছিল না, কাব্য সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো আদর্শও ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর আবেগ ও কল্পনার মধ্যে এমন এক উচ্ছ্বসিত অসংযম ছিল যার ফলে বিভিন্ন উপাদান-উপকরণকে গ্রথিত করে তাকে শিল্পরূপে দাঁড় করাতে পারতেন না। কিছু কিছু বিদেশী সাহিত্য, যা যুগপরিবেশের অনিবার্য ফলে তাঁর অধ্যয়নের উপকরণ হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইংরিজি

দেশপ্রেমমূলক কবিতা, রোম্যান্টিকদের কাব্য, শেক্‌সপীয়রের কাব্য ও নাটক, উনিশ শতকের নামকরা ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের রচনা, ষ্টুয়ার্ট মিল ['আমার জীবনে' মিলের নামটাই বেশি পাওয়া যায়] ইত্যাদি দার্শনিকদের রচনা ও ধর্মসাহিত্য। নবীনচন্দ্রের মানসিক গঠনের বিদেশী উপকরণ বলতে আর দৃশ্যতঃ বিশেষ কিছু নেই।

নবীনচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১)। এটি খণ্ড কাব্যের সংগ্রহ। এর নামটি বায়রনের Hours of Idleness-এর অনুকরণে সৃষ্ট। অবশ্যই এই খণ্ডকাব্যরচনার পদ্ধতি ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের আদর্শ থেকে গৃহীত। বিদেশী আদর্শে খণ্ড কবিতা বা লিরিক রচনা তাঁরই প্রাথমিক কীর্তি বলে নবীনচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনী'তে দাবি করেছেন। এ দাবি অমূলক। কারণ 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশের বহুপূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের[২] মধ্যে এবং রঙ্গলাল ও মাইকেলের মতো প্রধান ও অপ্রধান অনেক কবির মধ্যেই এই প্রচেষ্টার প্রমাণ রয়ে গেছে।[৩] 'আত্মজীবনী'তে নবীনচন্দ্র আরও একটি অমূলক দাবি করেছেন এই বলে[৪] :

> 'আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাঙ্গলা কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর 'ভারত-সঙ্গীত', আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়।'

কিন্তু এর উত্তরে বলা যায় যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের কাব্য সাহিত্যে স্বদেশীভাবের প্রমাণ ১২৫৫ সালে পয়লা বৈশাখ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত দেশপ্রীতির কবিতায় ['জননী ভারতভূমি— আর কেন থাক তুমি ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?' ইত্যাদি], ঈশ্বর গুপ্তের কোনো কোনো কবিতায়, রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে, নীলবিদ্রোহের উত্তেজক কয়েকটি গানে এবং হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্যে' (১৮৬৪) 'রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার',—এই সূচনাসংবলিত অংশে নিহিত রয়েছে।[৫] প্যারীচরণ সরকার ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মার্চের আগে 'এডুকেশান গেজেটে'র সম্পাদক হননি। কাজেই প্যারীচরণের সম্পাদিত এডুকেশান গেজেটে যখন নবীনচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তখন উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি সবই নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য রচনার আগেকার লেখা।[৬]

তবে হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীতে'র আগে নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক কবিতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল নিশ্চয়। যাই হোক, এই কবিতাগুলি

ছাড়া কতকগুলি কবিতায় নতুন সভ্যতার উপযোগিতা সম্পর্কে সজ্ঞান থেকেও কবি 'প্রাচীনের সরলতা, তরল সহৃদয়তা'র জন্য আক্ষেপ করেছেন। অনুরূপ বিতৃষ্ণা আমরা বিহারীলালের মধ্যেও দেখতে পাই। এই বায়রনীয় বীতরাগ এক ধরণের রোম্যান্টিক অনুভূতি। এছাড়া বিদ্যাসাগর, মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে নবীনচন্দ্রের তিনটি শোকগাথা বা elegy রয়েছে। এই শোকগাথা রচনা উনিশ শতকের বাঙালী কবির সুপরিচিত রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মানবিকবাদের আবহাওয়ায় নবীনচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'মানব ঈশ্বর' রূপে সম্বোধন করেছিলেন। 'প্রতিকৃতি' নামক একটি কবিতাকে নবীনচন্দ্র সনেট বলে দাবী করেছেন, কিন্তু কবিতাটি দ্বিখণ্ডিত সাতটি পূর্ণাঙ্গ চরণ ছাড়া আর কিছু নয়, সনেটের কোনো লক্ষণই তাতে নেই।

'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) ঠিক মহাকাব্য নয়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'বীরবাহু কাব্যে'র মতোই স্কটের অনুসরণে লেখা কাহিনী কাব্য বা রোম্যান্টিক পদ্য-কাব্য (Metrical Romance)। বায়রনের Childe Harold-এর উদ্দীপনাময় কিছু অংশও নবীনচন্দ্রকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। প্রথম সর্গে নবাব-বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র-বর্ণনা Paradise Lost-এর Council of the rebel angels-এর স্মৃতিই প্রেরণা জুগিয়েছে। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পূর্ব রাত্রে পলাশিক্ষেত্রে বিলাসী সিরাজের আতঙ্কদৃশ্যের বর্ণনায় Childe Harold-এ বর্ণিত ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্বরাত্রি বর্ণনার অনুসরণ আছে। তৃতীয় সর্গেই যে সাতটি স্বপ্ন বর্ণনার মধ্য দিয়ে সিরাজের পরিণতির আভাস দিয়েছেন তাতে শেক্‌স্‌পিয়ারের Richard III-এর পঞ্চম অঙ্কের বিভিন্ন প্রেতের আবির্ভাব এবং রিচার্ডের ওপর তাঁদের অভিশাপ বর্ণনার ভাষাগত অনুসরণ আছে। প্রথম সর্গে বাঙালির দুর্বলতার জন্য তিরস্কার এবং চতুর্থ সর্গে পরাধীনতার জ্বালা প্রকাশ Don Juan-এর তৃতীয় সর্গের The Isles of Greece-এর অনুসরণে সৃষ্ট। দ্বিতীয় সর্গের আশা-বন্দনার কিছু অংশে ক্যাম্পবেলের The Pleasures of Hope কবিতার অনুসরণ আছে। মধ্যে মধ্যে সংগীতের অবতারণা ('চির স্বাধীনতা অনন্ত সাগরে', 'কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল' ইত্যাদি) স্কটের অনুসরণ মনে হয়।

'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) কাব্যরচনার সময় শেক্‌স্‌পিয়ারের Antony and Cleopatra-র কথা হয়তো তাঁর মনে ছিল, কিন্তু শেক্‌স্‌পিয়রের সজ্ঞান অনুসরণ এ কাব্যে নেই। এই গীতিকাব্যে ক্লিওপেট্রার যৌবনমত্তা রূপটির

ওপরেই নবীনচন্দ্র নির্ভর করেছেন। ভূমিকায় লিখেছেন: 'আমি তাহার রূপে মোহিত, প্রেমে দ্রবিত, তাহার অসাধারণ মানসিক শক্তিতে চমৎকৃত এবং তাহার হতভাগ্যে দুঃখিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম ভারতীয় সাহিত্যভাণ্ডারে এরূপ রত্ন নাই।' নারীর প্রতি সহানুভূতিতে উনিশ শতকের কবির এও এক বীরাঙ্গনা-আবিষ্কার। 'আমার জীবনে'র দ্বিতীয় ভাগে নবীনচন্দ্র লিখেছেন; 'তুমি আমি কে যে পাপীকে ঘৃণা করিব! মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। পাপী নহি কে?' এই মমত্ববোধের প্রেরণায় ক্লিওপেট্রার সৃষ্টি, 'রৈবত'ক কাব্যের জরৎকারুর সৃষ্টি।

'রঙ্গমতী'ও (১৮৮০) 'পলাশীর যুদ্ধে'র মতো কাহিনীকাব্য। ইংরিজি Verse-tale-এর অনুসরণ এ ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। 'রঙ্গমতী'র প্রশংসা করে নবীনচন্দ্রের এক ব্যারিষ্টার বন্ধু যা লিখেছিলেন তার সম্পর্কে নবীনচন্দ্র বলেছেন[৭]:

> 'তিনি বইখানির, বিশেষতঃ পার্বত্য প্রকৃতির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'স্কটে'র কাব্য ভিন্ন তিনি এরূপ বর্ণনা পাঠ করেন নাই। পাঠ করিতে করিতে স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য দৃশ্য সকল তাঁহার মনে পড়িযাছিল'।

স্কটের আখ্যায়িকা কাব্যের স্বদেশপ্রেম, বীরদের আত্মত্যাগ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নবীনচন্দ্রের মনে রেখাপাত করেছিল। ঘটনার মধ্যে কয়েক স্থানে অন্য লেখকের প্রভাবও দেখতে পাই। যেমন, অনভিপ্রেত বিবাহের বিপদ থেকে রক্ষার জন্য গাছের পাতার আঘ্রাণ দিয়ে নায়িকাকে মৃতকল্প করে রাখার ঘটনাটি Romeo and Juliet-এর ফ্রায়ার লরেন্স কর্তৃক জুলিয়েটকে মুমূর্ষু রাখবার ঘটনাটির অনুসরণ।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই, ১৮৮০-তে 'রঙ্গমতী' প্রকাশিত হলেও ১৮৭৫-এ এই কাব্য রচনার সূচনা। কয়েক মাসের মধ্যেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক মাসিক পত্রে চোদ্দ বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথের ঠিক এই রকমই ব্যর্থ প্রণয়ের কাব্য-কাহিনী 'বনফুল' প্রকাশিত হতে থাকে। এবং একই ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে ১৮৭৮ এর প্রথম থেকে তিনি 'ভারতী'তে প্রকাশ করেছেন 'কবি কাহিনী'। ১৮৭৯-তে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে 'কবিকাহিনী'। আর পরের বছর 'রঙ্গমতী'র সঙ্গেই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলো রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল'। কাজেই এই সময়টি বাঙলা কাব্যের metrical romance-এর যুগ।

ইয়োরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-বিজ্ঞানের বোধ নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) এই 'ত্রয়ী' রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। যদিও এই 'ত্রয়ী'র মধ্যে আমাদের দেশীয় মহাকাব্য মহাভারতই প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা, দর্শন ও ভক্তিধর্মের নববিচারই প্রধান লক্ষ্য, তবু এ আলোচনার প্রেরণা ও পদ্ধতি সমস্তই পাশ্চাত্ত্য যুক্তি, মনন, ইতিহাসচেতনা ও বিজ্ঞানের চর্চা থেকে প্রাপ্ত। যদিও ইংরেজেরই ভ্রান্ত ধারণায় বাঙালি মহাভারতকে অদ্ভুত গল্প বলে জেনেছে, তবু ইংরেজবই দেওয়া ইতিহাসবোধ ও বিজ্ঞানবোধে বাঙালী কবি সেই অদ্ভুত গল্পকেই ঐতিহাসিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন।

'আত্মজীবনী'তে নবীনচন্দ্র বলেছেন[৮]: 'ইউরোপের কোন স্থান হইলে আজ এই দুই কক্ষ, এই ঐতিহাসিক নিদর্শন সকল, কি মহিমাব সহিত রক্ষিত হইত। এতভিন্ন বিহারে এমন গ্রাম নাই যাহাতে ভগ্ন বৌদ্ধ মন্দিরের স্তূপ, এবং তৎস্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্তির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয় না। আমার পূর্ববর্তী মিঃ ব্রডলি (Broadley) এই সকল দেখিয়া বহুবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যাইবার সময় উহা বিহারের স্কুল-লাইব্রেরীতে দান করিযাছিলেন। আমি এই সকল গ্রন্থ মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ কবিলাম এবং রাজগিরে প্রথমবাব শিবিববাসকালে মহাভাবতের মূল উপাখ্যানভাগ আর একবাব পাঠ কবিলাম। এতদিনে ইংবেজের শিষ্যত্বের কল্যাণে আমাব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মহাভারতখানি একটি অদ্ভুত গল্পমাত্র। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ কেহ ছিলেন না। থাকিলেও তিনি একজন কূটনীতি পরায়ণ রাজনৈতিক ছিলেন মাত্র। 'বঙ্গদর্শন' একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বিসমার্ক (Bismark), অর্জুনেব রথে বসিয়া তিনি ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে রাজগিরে শিবিরে বসিয়া মহাভারত পডিতে পড়িতে আমার প্রথম ধারণা হইল যে, মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য নহে, উহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য।.........বুঝিলাম অন্তর্বিদ্বেষ-ও অন্তর্বিদ্রোহ-খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভাবতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই নাম 'মহাভারত'। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্বপ্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোনও অবতার বা ধর্মপ্রচারক সেরূপ করেন নাই। তাই তিনি পূর্ণ ভগবান।'
নবীনচন্দ্রের এই নব মহাভারত রচনার পিছনে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণাও

রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু ধর্মের আলোচনা ও 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) তাঁকে পথ দেখিয়েছে। 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'রৈবতক' একই সময় রচিত হয়েছিল এবং উভয় লেখকই উভয়ের আলোচনা সম্পর্কে সজ্ঞান ছিলেন। 'আমার জীবনে' 'রৈবতক কাব্য' অধ্যায়ে তার প্রমাণ আছে। নতুন মানবিকতার প্রেরণায় উভয়েই সমাজের সামনে একটা আদর্শ রাখবার চেষ্টায় ছিলেন। মহাভারত পড়ে তাঁর প্রথম ধারণার নিজস্বতা সম্পর্কে তিনি যতই দাবী করুন, প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের ইয়োরোপের ইতিহাস পড়ে নবীনচন্দ্র মনে করেছিলেন যে, ইয়োরোপের স্টেট ও চার্চের দ্বন্দ্বের মত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, মহাভারত সাম্রাজ্যে আর্য-অনার্য বা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মিলন দেখিয়ে নবীনচন্দ্র মহাকাব্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ভাষায়'.........an antique as well as modern significance like this, what national epic can show'?

নবীনচন্দ্র দেখিয়েছেন, ক্ষত্রিয়ের বাহুবলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা অনার্যের সাহায্য গ্রহণ করে ক্ষত্রিয় জাতির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র করেছিল। দুর্বাসা ও বাসুকির ষড়যন্ত্রকে সেইভাবেই কবি উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতেও এই ধরনের বিরোধ ঘটা কিছু অসম্ভব ছিল না। পরশুরামের ক্ষত্রিয়নিধন কাহিনীর মধ্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধকে নবীনচন্দ্র যেভাবে সমাজ ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বরূপে দেখাতে চেয়েছেন তা প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগেও ছিল না। পাশ্চাত্ত্য সমাজ আদর্শেই তিনি মানবিক মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকে জাতির হৃদয়ের Divine National Hero করতে গিয়ে কিছুটা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ইতিহাসও টানতে হয়েছে। কাব্য-কল্পনা হিসাবে তার সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের সন্দেহ তাতে দূর হয় না। 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত সমালোচনায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন[৯] :

> The historical reader may be apt to find fault with the poet's heresies in making Balaram lead an expedition of civilising and proselytising colonisation to Greece and identifying him with Greek Hercules and also in making the Pandava Princes depart upon a divine errand round the red

sea, the mediterranean sea, but he will, we think, be propitiated with the exquisitely beautiful vision of the future set forth in closing canto when the poet passes in review, the mission of the world prophets, Buddha and Christ and Mahomed and Sri Chaitanya and which ends with the triumph of 'Horinama' in this world of sin and auguish.

যাই হোক, এই আদর্শ কল্পনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাব ইতিহাস ও খ্রীষ্টধর্মের অবতার সম্পর্কে নবীনচন্দ্রকে পরিচিত হতে হয়েছে। উনিশ শতকের ইয়োরোপের দেশনায়কগণ (মাত্‌সিনি, কাভুর, বিসমার্ক ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন স্বদেশকে সামগ্রিক ঐক্য বন্ধনে বাঁধবার যে মহৎ প্রয়াস করেছিলেন সেই সাজাত্যবোধের আদর্শেই নবীনচন্দ্রেব কৃষ্ণ গড়ে উঠেছে। যুগসঙ্কটে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে রাষ্ট্র-ধর্ম-সমাজ-শ্রেণী বিদ্বেষ দূর কবে একটা মহান ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাই তিনি হলেন আধুনিক কর্মবাদে বিশ্বাসী ও অলস অদৃষ্টবাদের শত্রু। সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিকে তিনি নৈসর্গিক ব্যাপার বলেই গ্রহণ করেছেন। এক ব্রহ্ম ছাড়া অন্য দেবতার উপাসনায় তাঁর আস্থা নেই। জীবনকে তিনি নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও নিবাসক্ত নৈষ্কর্ম্য-সাধনার দ্বারা গ্রহণ করেছেন। তিনি কোঁতেব পজিটিভিজ্‌ম্‌ ও সেণ্ট সাইমনের সাম্যবাদের আবহাওয়ায় মানুষ। মানবহিত তাঁর সাধনা, মানবকল্যাণই তাঁর দেহধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু উনিশ শতকের মানবিকবাদ ও প্রাচীন ভারতের ভক্তিবাদ এ দুয়ের সার্থক মিলন কৃষ্ণচরিত্রে হয় নি। কৃষ্ণ অদৃষ্টবাদের বিরোধী এবং কর্মফলবাদী, কিন্তু ব্যাসদেবেব কাছে অদৃষ্টবাদের নতুন ব্যাখ্যা শুনে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মানুষ হিসাবে ব্যাসদেবকে তিনি প্রণাম করেছেন। অবতার হিসাবে ব্যাসদেবের প্রণাম গ্রহণ করেছেন, আবার বিশ্বরূপ দেখিয়ে ব্যাসার্জুনকে নিজের আদর্শ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল নবীনচন্দ্রের রচনাকে poetry of painting বলেছিলেন। নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য অ-মানুষিক ঘটনার সমাবেশ করেছেন। আবেগময় বর্ণনায় কবি তাঁর কল্পনাকে মুক্তি দিয়েছেন। সে মুক্তি নিজের স্বভাবের উপযোগীই হয়েছে। বর্ণনার বাহুল্য যেমন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিরোধী নয়, তেমনি বিদেশী আদর্শেরও বিরোধী নয়।

অ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন যে, আনুষঙ্গিক-কাব্যদেহকে পুষ্ট করে তার ঐশ্বর্য ও বর্ণনা কৌতূহলকে বিচিত্রমুখী করে তোলে। তবে নবীনচন্দ্রের কাব্যে বিষয়বস্তুর শৈথিল্য থাকলেও মহান জীবনের অনুকরণ আছে, কাহিনীর মধ্যে জটিলতা আছে, এবং কাব্যের ভাবও নৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। নায়কের মধ্যেও মহাকাব্যের ধীরোদাত্ত গুণ রয়েছে। বাহুল্যের অংশ বাদ দিলে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের মধ্যে একটা ঘটনাগত ঐক্যও পাওয়া যায়। বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগ বিশ্বনাথের অনুসরণে, অ্যারিস্টট্‌লের নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, authentic epic এবং literary epic, দেশী-বিদেশী উভয় আদর্শই মিশ্রিত হয়ে আছে নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে। এছাড়া নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর লৌকিক কল্পনা ও জীবনাসক্তি। 'নমস্ক্রিয়া'র দ্বারা নয়, প্রকৃতির সমুচ্ছ্বসিত বর্ণনার দ্বারা তাঁর মহাকাব্যের প্রতিটি খণ্ড আরম্ভ হয়েছে, তাতে জীবনের মহান প্রকৃতি ও আদর্শই সূচিত হয়েছে। মাইকেল ও হেমচন্দ্রের কাব্যের ঘটনাবলী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে পরিব্যাপ্ত। নবীনচন্দ্রের কাব্যের ঘটনাক্ষেত্র লৌকিক জীবন। সেখানে অলৌকিকতা নেই। নেপথ্যের দৈবচক্রান্তও নেই। 'কৃষ্ণলীলা'কে অতিপ্রাকৃত থেকে মুক্ত করার পিছনে বিবর্তনবাদ এবং মানবহিতবাদই কাজ করেছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে পরাধীনতার জ্বালা প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম-চেতনার কথা বলা হয়েছে। তার আগে 'অবকাশ রঞ্জিনী'র আলোচনা প্রসঙ্গেও এই চেতনার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কাব্যত্রয়ীতে দেশপ্রেম তো আছেই, তার সঙ্গে সমন্বয়ের আদর্শ এবং দেশ-চেতনারই বৃহত্তম পরিণতি যে বিশ্বচেতনা তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'রৈবতক কাব্যে'র দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণ নিষ্কাম ধর্ম ও অখণ্ড মহাভারতের আদর্শ নির্দেশ করে বলেছেন :

আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্মের মন্দির,
ভিত্তি সর্বভূত হিত, চূড়া সুদর্শন।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম, লক্ষ্য নারায়ণ।

সপ্তদশ সর্গেও আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন :

এক ধর্ম এক জাতি,
একমাত্র রাজনীতি।
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত॥

'প্রভাসের' অষ্টম সর্গে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কবির দেশপ্রেম বিশ্বচেতনায় প্রসারিত হয়েছে :

ভারত জগৎ নহে।
নহে এই পারাবার।
এই জগতে সীমা, অন্যপারে তার।
আছে মহারাজ্যচয় অনন্ত বিস্তার।
· মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় পৃথিবীর,
মানবের তুলনায় এ ভারতবাসী ॥'

সমন্বয়ের আদর্শের পিছনে প্রেরণা জুগিয়েছে মানবহিতবাদ। বিশ্বচেতনার প্রেরণা দিয়েছে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি কবির শ্রদ্ধা। 'প্রবাসের পত্রে' কবি এক জায়গায় বলেছেন :

'পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত। তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুল পূজাই বটে'।

'কাব্যত্রয়ী'তে নারী-চরিত্রগুলি পুরুষ-চরিত্রগুলির তুলনায় প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। নারী-সমাজের প্রতি যুগপরিবেশগত কৌতূহলই যে এর কারণ তা ক্লিওপেট্রা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। সুভদ্রা কুরুক্ষেত্রে আহতদের সেবারতা। অর্জুনের প্রতি তার নিষ্ঠা তাকে সফল করেছে। কৃষ্ণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত জরৎকারুর প্রেম আবেগদীপ্ত ও শবরী, শৈলজার প্রেম ভক্তিরই নামান্তর, আত্মবিলীন হওয়াতেই তার সার্থকতা। তিনটি চরিত্রই কম-বেশি ইংরিজি রোমান্সের আদর্শে গড়া। এই 'অ্যাডভেঞ্চারাস্' চরিত্রগুলির পাশাপাশি রুক্মিণী সুলোচনা ও সত্যভামার রহস্যবিলাস অত্যন্ত বাঙালী গার্হস্থ্য স্বভাবের মনে হয় এবং তার ফলে কাব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। নারী-চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে কবি দেশী-বিদেশী আদর্শের মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারেন নি।

১৮৯১ সালে নবীনচন্দ্রের অবতার-প্রশস্তিমূলক প্রথম বই 'খৃষ্ট' প্রকাশিত হয়। 'খৃষ্ট' রচনার উদ্দেশ্য ছিল 'সমস্ত অবতারদের লীলা একবার ধ্যান করিয়া বুঝিতে এবং যেরূপ নিজে বুঝি, তাহা বুঝাইয়া পরস্পর ধর্মদ্বেষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব'।[১০]

'খৃষ্ট' বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

কৃষ্ণোক্ত অবতার তত্ত্বানুসারে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই আর্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে অবতার-স্বরূপ পূজনীয়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী

হইয়া আমি মেথু প্রণীত 'খৃষ্টমাহাত্ম্য' হইতে সংক্ষেপে খৃষ্টদেবের সরল ভক্তি-প্রাণ জীবনী ও ধর্ম উদ্ধৃত ও কবিতায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিলাম।
ওই ভূমিকারই অন্যত্র বলেছেন: 'কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই'।

অবতার-প্রশস্তিমূলক দ্বিতীয় বই 'অমিতাভ' (১৮৯৫) 'প্রভাস' কাব্যের পূর্বেই প্রকাশিত হয়। বিহারে থাকতে Broadley-র সংগৃহীত বৌদ্ধগ্রন্থগুলি পড়েই 'অমিতাভ' বচনাব বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত যদিও তাঁর Literature of Bengal বইটিতে অমিতাভকে 'somewhat after the style of Arnold's Light of Asia' বলেছেন, তবুও আর্নল্ডেব ব্যাখ্যা নবীনচন্দ্রের মনের মত হয় নি[১১]: 'বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা যাহা পড়িয়াছি, একটাও আমার মনোমত হইল না। এডুইন আর্নল্ডেব ব্যাখ্যাতেও যেন বেদান্তের ছায়া পড়িয়াছে'।

এই 'বুদ্ধলীলা' বর্ণতাতেও নবীনচন্দ্রের ইতিহাসবোধ ও মানবিকতাবোধ কাজ করেছে। তিনি বলেছেন[১২]:

> 'কিন্তু প্রায় সর্বত্র এমনকি এডুইন আর্নল্ডেব 'লাইট অব্ এসিয়া'য় [Light of Asia] পর্যন্ত বুদ্ধচবিত্র অতিবঞ্জিত ভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্তমাংসের বুদ্ধ দেখিতে পাই না।

কিন্তু চরিত্রসৃষ্টিতে কবি ভিন্নপথ ধরলেও 'লাইট অব্ এসিয়া' থেকেই বোধ হয ব্যঞ্জনাময় 'অমিতাভ' নামটি নবীনচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। এবং আর্নল্ডের অলৌকিক বর্ণনা বাদ দিলেও নবীনচন্দ্র 'অমিতাভ' কাব্যে তার ছক্ বা বর্ণনা ভঙ্গিকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আর্নল্ডেব বর্ণাঢ্য ভাষা ও উদ্দীপ্ত বর্ণনা নবীনচন্দ্রের অমিতাভ কাব্যে নেই। তবে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বকে কাব্যের পরিণামে সংযোজিত করার আদর্শটি নবীনচন্দ্র আর্নল্ডেব কাব্য থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়। শেষ প্রশস্তি-কাব্য 'অমৃতাভে'র [১৯০৯] বিষয় চৈতন্যদেব। বৈষ্ণব মহাজনেরা যেমন মঙ্গলকাব্যের রীতিতে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা কবেছিলেন, সে রীতির অনুসরণ অবশ্যই নবীনচন্দ্রের কাব্যে নেই। 'অমৃতাভ' আধুনিক রীতি সম্মত বর্ণনামূলক 'গাথা' কাব্য। এ কাব্যে ধর্মভাবের বাহুল্য নেই, মনুষ্যত্বের দীপ্তি ও সৌন্দর্যে এ কাব্য জীবন্ত। এ ছাড়া শেক্স্পিয়রের A Midsummer Night's Dream-এর মর্মানুবাদ করেছিলেন নবীনচন্দ্র 'নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন' নাম দিয়ে। রচনাটি পুস্তককারে প্রকাশিত হয় নি।

বড় কাব্য রচনা করলেও মহাকবির পরিচয় নবীনচন্দ্র দেন নি, গীতিকবির পরিচয়ই দিয়েছেন। তাঁর গীতিকাব্যে তীব্রতা, তেজস্বিতা, স্বদেশবাৎসল্যের ক্রন্দন, মর্মভেদী কাতরোক্তি, সত্যপ্রিয়তা ও অকপট ভাষণ আছে যা বারবারই বায়রনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' 'পলাশীর যুদ্ধে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রকে 'বাঙ্গলার বাইরন' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

আমার জীবন গ্রন্থেব 'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য' অধ্যায়ে নবীনচন্দ্র এই সমালোচনার কথা উল্লেখমাত্র করেছেন, কিন্তু বায়রনের প্রভাব তাঁব ওপর কতখানি তার কোনো উল্লেখ করেন নি। ইংরিজি রোম্যান্টিক কাব্যই তাঁর কবিমনের স্বরূপ প্রকাশে সহাযতা করেছে। তবে বায়রনের দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত সে সম্পর্কে তিনি সচেতন নন। 'আমার জীবনে' অনেক কবির কাব্য-পংক্তি তিনি উদ্ধাব কবেছেন, বায়রনের কাব্য সেখানে স্থান পায় নি। শশাঙ্ক-মোহন সে'নর পূর্বোদ্ধৃত উক্তি ছাড়া অন্য কোন প্রমাণও নেই। যাই হোক, কবির স্বীকৃতিব চেয়ে কাব্যই আমাদের এ-বিষয়ে সন্তুষ্ট করেছে বেশী।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র সচেতন শিল্পী ছিলেন না। ঈশ্বরগুপ্তের অনুসবণে তিনি কাব্য বচনার সূচনা করলেও ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব বিশেষ পড়েনি তাঁর কাব্যে। মাইকেলের মতো ক্লাসিক কাব্যের শব্দসম্পদও নবীন-চন্দ্রের ছিল না। তবু তিনি তাঁর আবেগপ্রবণ রোম্যান্টিক মনের উপযোগী এক কাব্য-ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন যা মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের মধ্যে আমরা পাইনি। ববং সে কাব্যভাষা তাঁকে পরবর্তীদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে যুক্ত করেছে। প্রথম জীবনে নবীনচন্দ্রের অন্যতম কবিতা 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'তে যে গীতময় ভাষার উদ্বোধন দেখি, তাই তাঁর পরবর্তী আখ্যায়িকা কাব্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। 'অবকাশ রঞ্জিনী'র কবিতাগুলিতে পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব থাকলেও ['পিতৃহীন যুবক' ও 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতায় মাইকেলের, 'হৃদয় উচ্ছ্বাস'-এ হেমেচন্দ্রের এবং 'বিষণ্নকমল' কবিতায় বিহারীলালের অনুসরণ আছে]। লক্ষণীয় যে, উক্ত কবিদের গীতলতার অনুসরণই কবি করেছেন। বিহারীলালে অবশ্য সর্বত্রই গীতোচ্ছ্বাস, কিন্তু মাইকেল ও হেমচন্দ্রের মধ্যে গীতোচ্ছ্বাস সর্বত্র নেই। নবীনচন্দ্র শেষোক্ত দুই কবির আংশিক গীতোচ্ছ্বাসকেই অনুসরণ করেছেন। এবং সেই গীতিরসাত্মক ভাষাই নবীনচন্দ্রের বিশিষ্ট বাহন হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের দুরূহ সংস্কৃতশব্দ ও বাগ্-

ভঙ্গির অনুসরণ নবীনচন্দ্র প্রথম দিকে একেবারে যে করেন নি তা নয়। 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতী' কাব্যে তার প্রমাণ মিলবে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে 'দ্রুত ইরম্মদ বেগে', 'পরাক্রমে পরন্তপ', 'অশিবব্যঞ্জক শ্মশ্রু আবৃতবদন' 'আক্রমিবে', 'স্বর্ণপ্রসবিনী', 'পবিষ্কারি নেত্রদ্বয়' ইত্যাদি প্রয়োগ মাইকেলের স্মারক। 'রঙ্গমতী'তেও মাইকেলেব অনুসবণ মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট। যেমন 'সরল মৃণালভুজে', 'যথা ধৃতবিহঙ্গিনী নিষাদ পিঞ্জরে', 'দম্ভোলী যেমতি মিশায় আকাশ তবঙ্গে', 'পূর্ববঙ্গত্রাস', 'বীরকুলর্ষভভ্রাতা', 'যেই সরসকুসুমদামে শ্যামাঙ্গ তোমার—সাজাইনু শ্যামাঙ্গিনী. ইত্যাদি। মহাকাব্যিক গৌববকে আনতে গিয়েই এই অনুসরণেব মধ্য দিয়ে মাইকেলের অর্জিত অনেক বিদেশী কাব্যভঙ্গি ও উপমা নবীনচন্দ্রেব মধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু এই অনুসরণ যে সর্বাত্মক হতে পাবে না তার আভাস 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং 'রঙ্গমতী' কাব্যেই রয়েছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে যখন পড়ি :

> দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগব,
> উর্মিব উপরে উর্মি, উর্মি তদুপবে,
> হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তব।
> তুলিছে মস্তক দেখ ভেদি নীলাম্বরে।

কিংবা 'রঙ্গমতী'তেও যখন পড়ি :

> মরি! কি উদাস মূর্তি যুবক তন্ময়।
> চাহিলা অন্তব পানে, দেখিলা তথায়।
> দেখিলা হৃদয় বিশ্ব প্রণয় কিবণে,
> সৌবকবজালে যেন পূর্ণ বিভাসিত।
> এইরূপে অনিশ্চিত কানন ভিতরে,
> পড়িয়াছে সেই কর, সেই কবে হায়।
> ফুটায় নলিনী ফুল্ল চিত্তসরোবরে ॥

তখন বৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের নবীনচন্দ্রকে চিনতে অসুবিধা হয় না। ধীরে ধীবে মাইকেলের আড়ম্বরপূর্ণ ক্লাসিক ভাষার মধ্যে রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের উপযোগী তাবল্য সঞ্চার করে নবীনচন্দ্র যেন পরবর্তী রোম্যান্টিক কাব্যভাষার আভাস দিতে লাগলেন। কোমল কঠিন ধ্বনিমিশ্রণের দ্বারা ভাষার মধ্যে যে বেগ এলো তার মূলে ছিল নবীনচন্দ্রের কবিস্বভাবের নাটুকেপনা এবং এই নাটুকেপনার কারণও বোধ হয় বায়রনের ভাষার সংক্রামক জীবনী-

শক্তি যা তাঁর কবিতাগুলিকে 'incitements to action and conviction' করে তুলেছিল।

হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ যতখানি সচেতনতার সঙ্গে ছন্দের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, নবীনচন্দ্র ছন্দ সম্পর্কে ততোটা সচেতন ছিলেন না। চিরাচরিত পয়ার-ত্রিপদীর ধারাতেই নবীনচন্দ্র স্বচ্ছন্দে কাব্যরচনা করেছিলেন। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, হেমচন্দ্রের সচেতনতা ভাষার গতিকে কোথাও কোথাও রুদ্ধ করেছে, কিন্তু নবীনচন্দ্রের তীব্র আবেগ ও আন্তরিকতা পয়ারের মধ্যে দ্রুতি সঞ্চার করেছে। লঘুত্রিপদীর নিদর্শন তাঁর কাব্যে খুব বেশী দেখা যায় না। 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমৃতাভ' কাব্যে কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাতে রচনার শৈথিল্যই বেড়েছে। তাঁর উচ্ছ্বাসের উপযোগী ছিল দীর্ঘ ত্রিপদী। এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর ব্যবহারই তাঁর কাব্যে বেশী দেখা যায়। হেমচন্দ্রের অনুসরণ করে প্রবহমান পয়ারের মাঝে মাঝে মিত্রাক্ষরবন্ধ ব্যবহার করেছেন। মিলবিহীন প্রবহমান পয়ারও ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া ষোল মাত্রার ছন্দের প্রতিও নবীনচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল।

ছন্দের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মহাকাব্যের চরিত্রগুলির মুখে নাটকের মতো সংলাপ সংযোজন। তাঁর কাব্যেই আমরা বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গি প্রকাশিত হতে দেখি। মাইকেল প্রবহমান পয়ারের গম্ভীর মহিমাকে ফুটিয়েছিলেন, নবীনচন্দ্র আটপৌরে সংলাপকে প্রবহমান পয়ারে সাজিয়ে দিলেন স্বচ্ছন্দে। 'রৈবতকে'র ষষ্ঠ সর্গ থেকে একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে:

সু। বল, মৃগরাজ।
খুলিল বন্দিনী মম কাহার এ কাজ?
অ। আগে বল কোন্ দোষে বন্দিনী হইল—
সু। সু-ভ-দ্রা, বাজিল নাম গলায় পার্থের!
ভদ্রা চোর!
অ। জানি আমি, কিন্তু সুলোচনে!
কেমনে জানিলে তুমি?
সু। একি বিড়ম্বনা!
যে অভাগী জেনে শুনে গোপনে গোপনে,
আপন সর্বস্ব দেয় হইতে হরণ,

সে যদি না হবে চোর ? রাগে অঙ্গ জ্বলে,
না জানি ধরিতে অস্ত্র অন্যথা এখন
হেন অভাগীর ধন হরিল যে জন,
বাঁধিতাম নাগপাশে মনের মত
সেই সুচতুর চোরে।

অ। চোর আমি তবে,
আপন সর্বস্বহারা। কিবা কাজ আর
অন্য অস্ত্রে ? ব্রহ্ম অস্ত্র জিহ্বাগ্রে তোমার।

এই রকম প্রবহমান পয়ার ছাড়া ত্রিপদী ও চৌপদী বন্ধেও সংলাপ প্রয়োগ করেছেন নবীনচন্দ্র। সংলাপধর্মী ছন্দ রচনা করে নবীনচন্দ্র কাব্য ও নাটকেব মধ্যে একটি মিলনসূত্র রচনা কবেছেন। কাব্যে এই নাট্যধর্ম প্রয়োগ করা ইংরিজি রোম্যান্টিক কবিদেব একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় রোম্যান্টিকরা সংলাপের ভাষা [speech rhythm] অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবহার করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের সঙ্গে বায়রনের নৈকট্য-সূত্রে এখানে বায়রনের Don Juan (V, 14-15) থেকে উদ্ধার কবছি :

When Juan answered—'Spanish !' he replied,
'I thought, in fact, you could not be a Greek ,
Those servile dogs are not so proudly eyed
Fortune has played you here a pretty freak,
But that's her way with all men, till they're tried ,
But never mind,—she'll turn, perhaps, next week,
She has served me also much the same as you,
Except that I have found it nothing new.
'Pray Sir', said Juan, 'if I may presume,
What brought you here ?'—'Oh ! nothing very rare-
Six Tartars and a drag-chain—'

তেজোদীপ্ত সংলাপের প্রমাণ হিসাবে নবীনচন্দ্রের কাব্য থেকে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

দাঁড়ারে ! দাঁড়ারে ফিরে ! দাঁড়ারে যবন !
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !

যদি ভঙ্গ দেও রণ"—
গর্জিলা মোহনলাল—"নিকট শমন।
আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন ভবন। 'পলাশীর যুদ্ধ', চতুর্থ সর্গ

বাক্যকে মাঝপথে থামিয়ে বক্তার পরিচয় দিয়ে পুনরায় তাঁর উক্তিকে আরম্ভ করার ভঙ্গিটি বিদেশী। মাইকেলের কাব্যে এই ভঙ্গির প্রমাণ আছে। এ রচনা তাঁরই অনুসরণ। এ রকমই একটি সংলাপধর্মী স্তবক বায়রনের Don Juan (1, 145-6) থেকে তুলে দিচ্ছি:

Yes, Don Alfanso ! husband now no more,
If ever you indeed deserve the name,
Is't worthy of your years ?—You have three score-
Fifty, or sixty, it is all the same—
Is't wise or fitting, causeless to explore
For facts against a virtuous woman's fame ?
Ungrateful, perjured, barbarous Don Alfanso,
How dare you think your lady would go on so ?

কবিতার স্তবক রচনার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্র কিছুটা বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই মাইকেলের মাধ্যমে বিদেশী আদর্শের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনাকালে মাইকেল বিচিত্র পদপংক্তি-মিলের বিন্যাসে স্তবকরচনার যে সূত্রপাত করেছিলেন নবীনচন্দ্র তারই অনুসরণে আরও কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র প্রথম ভাগে 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য', 'হতাশ' ইত্যাদি কবিতা, দ্বিতীয় ভাগে 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'কেন ভালবাসি' ইত্যাদি কবিতার স্তবক গঠন 'ব্রজাঙ্গনা'র অনুসারী। 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'তে আট পংক্তির স্তবক আছে। হেমচন্দ্রের 'বিশ্ববিদ্যালয়' কবিতার প্রথম স্তবক আট পংক্তির। এ ছাড়া আট পংক্তির স্তবক ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। ইংরিজি গীতি-কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই এই স্তবক গঠনের নতুনত্ব এসেছে। 'পলাশীর যুদ্ধে'র অধিকাংশই সমিল দশপংক্তির স্তবকে রচিত। ড. সুকুমার সেন এই

স্তবকে স্পেন্সারের অনুসরণে রচিত বলে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু স্পেন্সারীয় স্তবকটি, প্রথমতঃ নয় পংক্তির, দ্বিতীয়তঃ, তার মিলের নিয়ম ক খ ক খ খ গ খ গ গ। নবীনচন্দ্র পংক্তির সংখ্যা বা মিলের নিয়ম কোনোটাই অনুসরণ করেন নি। টমাস মুর ও ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার দশ পংক্তির স্তবক পাওয়া যায়। 'প্রতিকৃতি' কবিতার উল্লেখ আগেই করেছি, সেখানেও কবির সনেটের দাবী যেমন অমূলক, তেমনি কবির 'উপহার' কবিতাটির সম্পর্কেও অনুরূপ দাবী উপেক্ষার যোগ্য। তবে কবিতাটি অসমান প্রবহমান পংক্তিতে রচিত বলে উল্লেখযোগ্য :

ত্রিদিব জ্যোৎস্না দেবী মূর্তি ধরি,
আজি কি ভূতলে খসি ?
জ্যোৎস্নাসাগরে জ্যোৎস্না ঢালিয়া
শশী করতলে উদিল শশী,
পবিত্রতর ? কি যে পবিত্রতা,
ত্রিদিব মাধুরী পড়িছে ঝরি
সুধাংশু হইতে, সুধা অংশু যেন,
পাপ পূর্ণ ধরা পবিত্র করি।
নিদ্রান্তে দেখিনু কক্ষ অন্ধকার
আলোকিছে মূর্তি—মানবী নয়।
ভরিল হৃদয়, ভাসিল নয়নে
আনন্দাশ্রু, চিত্তচন্দ্রিকাময়।
আলোকি বৈশাখী-জ্যোৎস্না-নিশি
আলোকে আলোক গেল কি মিশি!

কাজেই বোঝা যাচ্ছে, নবীনচন্দ্র কাব্যরচনারীতির প্রতি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। যে সচেতনতার জন্য মাইকেল ও হেমচন্দ্র দেশী-বিদেশী কাব্যরীতির প্রয়োগ-পরীক্ষা করেছিলেন, নবীনচন্দ্রের মধ্যে সেই পরীক্ষামূলক মনোভাব দেখতে পাওয়া যায় না। বিষয়বস্তু ও রীতিতে যেটুকু বৈচিত্র্য এসেছে তার পিছনে কোনো পরীক্ষামূলক মনোভাব ছিল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের সংস্রবে থাকার ফলেই এই পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই এসেছে।

১। বঙ্গবাণী : শশাঙ্কমোহন সেন। পৃ ৪০-৪১।

২। ক. দেশের দারুণ দুখ—
দেখিয়া বিদরে বুক
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।

খ. স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে
ভারতের জরা দেহে
করিবেন শোভাব সঞ্চার।

গ. জান না কি জীব তুমি,
জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে বেখেছে :—ইত্যাদি।

৩। রঙ্গলাল ও মাইকেলেব আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪। 'আমাব জীবন' দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী সংস্কবণ। পৃ. ১৭৯।

৫। স্বদেশী গান : ববীন্দ্রকুমাব দাশগুপ্ত। Extension Lecture, Jadavpur University Part II, 1958-59

৬। সাহিত্য সাধক চবিতমালা, নবীনচন্দ্র সেন, পৃ. ১০। প্যারীচরণ সবকাব মার্চ ১৮৬৬ থেকে আগষ্ট ১৮৬৮ পর্যন্ত এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। কাজেই মার্চ ১৮৬৬র পব নবীনচন্দ্রের কবিতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭। আমার জীবন : নবীনচন্দ্র সেন। 'রঙ্গমতী কাব্য' শীর্ষক অধ্যায়।

৮। আমাব জীবন : নবীনচন্দ্র সেন। 'বৈবতক কাব্য' শীর্ষক অধ্যায়।

৯। আমাব জীবন : পঞ্চম ভাগ : প্রথম অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

১০। আমাব জীবন : নবীনচন্দ্র সেন। চণ্ডী, খৃষ্ট, ও অমিতাভ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১। আমাব জীবন : নবীনচন্দ্র সেন। চণ্ডী, খৃষ্ট ও অমিতাভ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১২। আমার জীবন : নবীনচন্দ্র সেন। চণ্ডী, খৃষ্ট ও অমিতাভ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সাত

বিহারীলাল চক্রবর্তী

কোনো বড় আদর্শের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের গীতিপ্রাণকে আবৃত করে রাখেন নি বিহারীলাল (১৮৩৫-৯৪)। ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্রের গীতি-উচ্ছ্বাসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমাহিত বিহারীলালের গীতিগুঞ্জনের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। নবীনচন্দ্রের কোনো কোনো কবিতার মধ্যে আত্মমগ্ন বিষণ্নভাব (যেমন, 'বন্ধুতা ও বিদায়', 'মেঘনা' ইত্যাদি) আছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নবীনচন্দ্রের উচ্চকিত ঘোষণা ও তেজস্বিতা বিহারীলালের কবি-ব্যক্তিত্বের স্বভাব নয়।

জন্ম ও শিক্ষা তাঁর কলকাতায়। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন এবং সংস্কৃত কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু লেখাপড়া তাঁর বেশিদূর এগোয় নি। বাঁধাবাঁধি নিয়মে লেখাপড়া না হওয়ার কারণ তাঁর তীব্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায় তার প্রমাণ পাচ্ছি। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। কৃষ্ণকমলের কাছেও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন। বিশেষ করে বাল্মীকি ও কালিদাসের কবিত্বে বিহারী-লাল ছিলেন ভরপুর। কৃষ্ণকমলের কাছেই তাঁর ইংরিজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচয় হয়। কৃষ্ণকমল বলেছেন: 'বায়রণের Childe Harold এবং শেক্‌স্‌পিয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দুপাঁচখানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে অতি সামান্য সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন।'[১] রামায়ণ মহাভারত থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণব গীতিকাব্য, মুকুন্দরামের কাব্য, ঈশ্বরগুপ্ত ও দাশু রায়ের কবিতা বিহারীলাল খুব ভালভাবেই পড়েছিলেন। সঙ্গীতপ্রিয়তা তাঁর বাল্যকালের আহরিত সম্পদ। 'পূর্ণিমা' ও 'সাহিত্য সংক্রান্তি' পত্রিকায় তাঁর কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হবার পর তিনি 'অবোধবন্ধু' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। এই পত্রিকার লেখক হিসাবে বিহারীলাল কৃষ্ণকমল ও হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের রচনা

অনুরাগী ছিলেন। এছাড়া আরও এক ভক্ত পাঠক ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উনিশ শতকের প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। আর এছাড়া রবীন্দ্রনাথের কথায়,[২] 'তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।'

'আধুনিক সাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কৃতিত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন[৩]:

> 'বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষার নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ বর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।'

ওই প্রবন্ধেই 'সারদামঙ্গলে'র লক্ষণ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,[৪] 'সারদামঙ্গল এক অপরূপ কাব্য। প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত, একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না। যেই একটু মনে হয় এইবার বুঝি কাব্যের মর্ম পাইলাম অমনি তাহা আকার পরিবর্তন করে। সূর্যাস্তকালে সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটা অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে, বিহারীলালের মধ্যে স্বতন্ত্র সুর শোনা গেল এবং সে সুর রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার সুর। কোনো আভাসে ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত নয়, অনর্গলিত উচ্ছ্বাসে তা বেগবান। ইতিপূর্বে রোম্যান্টিক কবিদের চর্চা মাইকেল ও রঙ্গলাল আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ক্লাসিক্‌স্‌ মাইকেলকে অভিভূত করেছিল, রোম্যান্টিক কাব্যচর্চার চেয়ে ক্লাসিক্‌স্‌কে তিনি মহত্তর কাব্য চর্চার বিষয় বলে মনে করেছিলেন। রঙ্গলাল স্কট-বায়রন-মুরের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন বেশী। এঁদের [এই তিনজনের] মধ্যে অন্যান্য রোম্যান্টিকদের ব্যাকুলতার সুরটি ঠিক ফুটে ওঠেনি। কাজেই যুদ্ধ, উদ্দীপনা ও দেশানুরাগের verse-tale-এর মোহে পড়লেন তিনি। হেমচন্দ্র রোম্যান্টিক কবিতার অনুবাদক, কিন্তু স্বকীয় রচনায় রোম্যান্টিক প্রবণতার কোনো বিশিষ্ট লক্ষণই ফুটে উঠলো না। নবীনচন্দ্রের মধ্যে

অবশ্য রোম্যান্টিক লক্ষণ রীতিমতো অনুভব করা গিয়েছিল। তাঁর 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, বিস্ময়বোধ ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং নাগরিক-কৃত্রিমতার প্রতি বীতশ্রদ্ধভাব ফুটে উঠেছিল। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, ইতিপূর্বে মাইকেলের মধ্যেই আমরা রোম্যান্টিক লক্ষণ খুঁজে পেতে পারি। আগেই মাইকেল প্রসঙ্গে বলেছি, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে', 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'—বিশেষ করে সীতা-চরিত্রে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কোনো কোনো কবিতায় তাঁর রোম্যান্টিক মনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তারপরেই আমরা বিহারীলালের মধ্যে সেই মনের অতি স্পষ্ট পরিচয় পেলুম। নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই লক্ষণ পরে দেখেছি। কারণ তাঁর এডুকেশন গেজেটে 'অবকাশ রঞ্জিনী'র কবিতাগুলি [১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বা তার পরে প্রকাশিত হয়েছে] বিহারীলালের 'সঙ্গীত শতকে'র [১৮৬২] পরে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই ড. হরপ্রসাদ মিত্র যে মন্তব্য করেছেন 'নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি বর্ণনায় এর পূর্বাভাস,—বিহারীলালের অধিকাংশ রচনায় এর সার্থকতর প্রকাশ' তা ঠিক নয়।

অতঃপর বিহারীলালের কাব্যগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর ওপর রোম্যান্টিক কাব্যের প্রভাব ও স্বরূপের আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, তাঁর 'সঙ্গীত শতক' প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬২-তে। এইটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই। বাংলার গীতিকবিতার যে ধারাটি রামনিধি গুপ্ত, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতির বিশুদ্ধ প্রণয়সঙ্গীতে এসে থেমে গিয়েছিল তাকে নতুন বেগ দিলেন বিহারীলাল। প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষ ছিল যে প্রণয়সঙ্গীতের উপজীব্য। কিন্তু এ তিনটি বস্তুই নতুন সম্পর্কসূত্রে 'সঙ্গীত শতকে'র মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল। সংসারের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা এবং দৈনন্দিন গ্লানি কবির মধ্যে যেমন অপ্রকাশের বেদনা এনেছে :

মনে যে বিষম দুখ
কয়ে কি জানান যায়।
কিছু কিছু পারিলেও
কিবা ফলোদয় তায়।

তেমনি আশা-আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি বেড়ে গেছে, কল্পনা কেবল যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে :

মানবের মনোআশা / কখন পোরে না,
সাধনের কল্পনা / শেষে কেবল যন্ত্রণা ;

করিয়ে সুখের আশ / হইয়ে আশার দাস,
যত অনুসর, করে ততই ছলনা ;—
অদূরে আকাশ হেরি, ধরিবার আশা করি,
ধাইলে কি ধরা যায় ?
সেখানে সে রয় না।'

লক্ষণীয় যে মানুষেব উচ্চাশা এবং তার সীমিত শক্তির জন্য বেদনা রোম্যান্টিকদের কাব্যের সাধারণ লক্ষণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'The world is too much with us', কোলরিজের Dejection: an Ode, শেলির Stanzas near Neples, ইত্যাদি কবিতায়, কীট্‌সের একাধিক ওডের মধ্যে বায়রনেব Don Juan-এর কোনো কোনো অংশে এই রকম আদর্শের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তব জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষার অচবিতার্থতার বেদনা অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিয়েছিল। বিহারীলাল এই বোম্যান্টিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই স্পর্শ পেয়েছিলেন।

এই অতৃপ্ত রোম্যান্টিক ব্যক্তিত্বকে খানিকটা সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল প্রকৃতি। প্রকৃতিব বিস্ময, রহস্য ও চিবনবীনত্ব সমাজের এই অসন্তুষ্ট কবিদের আকর্ষণ কবেছিল, আশ্রয়ও দিয়েছিল। নদীকে দেখে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন, 'How often has my spirit turned to thee !' তাঁর লুসি প্রকৃতির 'নীরব সহানুভূতি'তেই মানুষ হয়েছিল। প্রখর পশ্চিমা বাতাসের বেগে নিজেকে উৎক্ষিপ্ত করে নতুন বসন্তেব চিন্তাগুলিকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন শেলি। নাইটিঙ্গেলের গান এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের স্বাদ এনেছিল কীট্‌সেব মনে। কবরের yew-গাছ দুঃখদীর্ণ টেনিসনের মনে ক্ষণিকের পুলক জাগিয়েছিল। 'সঙ্গীত শতকে'র মধ্যে বিহারীলাল বলেছেন:

'আকাশে নক্ষত্র জ্বলে—
ফুলকুল হাসে স্থলে
সুদূরে নির্ঝর ধারা
গায় মৃদুস্বনে,
যা দেখি সে সমুদয়,
শান্তিময় তৃপ্তিময়
অপূর্ব আনন্দোদয়
হয় প্রতিক্ষণে,

ক্ষমতার অত্যাচার
ঐশ্বর্যের অলঙ্কার,
মিত্রতার কপটতা,
নাই এই স্থানে। ৬৭॥

কিন্তু প্রকৃতি রোম্যান্টিক মনের শুধু আশ্রয়স্থলই নয়, প্রকৃতি হলো প্রণয়িণী। মানুষের দেহ-মনের মত প্রকৃতিও দেহ-মনের অধিকারী। টেনিসনের Tithonus-এর মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন লক্ষ্য করবার বিষয় :

'.. Felt my blood
Glow with glow that slowly crimsoned all
Thy presence and thy portals, while I lay,
Mouth, forehead, eyelids growing dewywarm
With kisses balmier than half-opening buds
Of April, and could hear the lips that kissed
Whispering I knew not what of wild and sweet ..'
[Ll 55-61]

'সঙ্গীত শতকে'র একটি গানে পাওয়া যাচ্ছে :

'প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী-সনে,
যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে ,
মুখ—পূর্ণ সুধাকর
কেশজাল জলধর,
অধর পল্লবনব
রঞ্জিত যেন রঞ্জনে ;
সমুজ্জ্বল তারাগণ,
শোভে হীরক ভূষণ
শ্বেতঘন সুবসন
উড়ে পড়ে সমীরণে,
বায়ুর প্রতি হিল্লোলে

লতাগুলি হেলে দোলে
কৌতুকিনী কুতূহলে
নাচে চঞ্চল চরণে,
হেলিয়া স্তবক ভরে
মরি কত লীলা করে
পয়োধর ভাব ভরে
ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে··· ।' ১৯ ॥

রোম্যান্টিকদের অতৃপ্তির বেদনা তাঁদের প্রেমানুভূতির মধ্যে, সৌন্দর্য-মূর্তি-কল্পনার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল। যে অভ্যস্ত সংসারে 'আঁখির বিস্ময়-রস' ঘুচে যায় সেখানে আদর্শ খর্ব হয়, এই খর্বতাই বিষাদ আনে। ফলে যে আলোর প্রত্যাশী তাঁরা, যে প্রেমের পিপাসী তাঁরা, সে আলো ও প্রেমের মধ্যে অবলুপ্তির বিষাদ মিশে যায়। এডগার এলান পো তাঁর Philosophy of Composition-এর এক জায়গায় বলেছেন: the death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world. আদর্শ প্রেমিকাকে রোম্যান্টিকরা যেন বিষাদিনী রূপে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অপ্রাপ্তির বিষাদ আদর্শেরই বিশিষ্ট ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কীট্‌সের La Belle Dame Sans Merci-তে সেই বিষাদিনীকে আমরা দেখেছি:

'She took me to her elfin grot
And she gazed and sighed deep,
And there I shut her wild sad eyes—
So kissed to sleep,

'সঙ্গীত শতকে'র কুড়ি ও চৌত্রিশ-সংখ্যক গানে আমরা এই বিষাদিনীর সাক্ষাৎ পাই। তার মধ্যে একটি উদ্ধার করেছি:

'হৃদয়ে উদয় এক রমণী রতন।
মলিন বসন পরা, মলিন বদন;
করেতে কপোল রাখি অবিরল আঁখি,
ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন॥ ২০ ॥

কিন্তু রোম্যান্টিকরা যে কেবল চিরপলাতক আলোর প্রতীক্ষারত তা নয়, তাঁরা মানুষের প্রেমিক। যাঁরা নতুন করে সমাজ-সংসার গড়তে চান তাঁরা

শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি ও প্রেম-কল্পনা ছেড়ে মানুষের টানটাই বেশী করে উপলব্ধি করেন। মানুষকেই তো তাঁরা আদর্শ মানুষ করতে চান। কাজেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে কারণে বিলাপ করেন[৬] :

If this belief from heaven be sent,

If such be nature's holy plan,

Have I not reason to lament,

What man has made of man ?'

ঠিক সেই কারণেই বিহারীলাল প্রকৃতির রাজ্যে কিছুদিন কাটাবার পর বলেন :

'পরে নাহি ভাল লাগে কেবলই মনে জাগে,

প্রিয়তম মানুষের মোহন আনন'।' ৭২ ॥

'বন্ধুবিয়োগ' [১৮৭০] কাব্যের বিষয় কবির প্রথম পত্নী ও তিন বাল্যবন্ধুর স্মৃতি-বেদনা। শোকগাথা রচনার রীতিটি আমরা হেমচন্দ্রের মধ্যে দেখেছি। নবীনচন্দ্রের মধ্যেও দেখেছি। এ সবই গ্রের Elegy কিম্বা হ্যালামের মৃত্যুতে টেনিসনের In Memoriam রচনার অনুসরণে রচিত হয়েছিল। কাব্যের প্রারম্ভে গ্রের বহু বিখ্যাত 'Full many a gem ·' ইত্যাদি কবিতাংশটি উদ্ধৃত হয়েছে। এই কাব্যে লক্ষ্য করবার মতো বিষয় হলো, সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নারীকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেওয়া। হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র মধ্যেও দেখেছি, সমাজে পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর জন্য কবির অসন্তোষ। 'বন্ধুবিয়োগে'র প্রথম সর্গে ক্ষুব্ধ কবি বলছেন :

'ছেলেরা বেশ্যার সঙ্গে খেয়ে মদে ভাতে

সারা রাত পড়ে থাকে মুখ দিয়ে পাতে ॥

প্রাতে ঘরে এলে আর দোষ নাহি রয়,

মেয়ে কিছু করিলেই সর্বনাশ হয়।'

চতুর্থ সর্গে কবি তাঁর মৃত বন্ধু রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বলছেন :

'তবু স্বদেশীয় ভগ্নীগণের শিক্ষায়

কভু আমি ভগ্নোৎসাহ দেখিনি তোমায়।

যাদের তেজস্বী মন খাঁটি পথে ধায়,

তারা কি দৃক্‌পাত করে ওসব কথায় ?'

নারীর আত্মমর্যাদার সমর্থক হিসেবে বিহারীলালের এই পরিচয় আরও

স্পষ্ট হয়েছে 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে [১৮৭৩]। এই কাব্যের 'উপহার' অংশে কবির রোম্যান্টিক অতৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে :

'সর্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন। [১ম সর্গ]

খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছেন কবি প্রকৃতির মধ্যে :

'লোক মাঝে দেঁতোহাসি হাসি,
বিরলে নয়ন জলে ভাসি,
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে
মাঠে শুয়ে দূর্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।' [১ম সর্গ]

দ্বিতীয় সর্গে নারী বন্দনা। নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল কবি বিচিত্র-রূপিনী নারীর মধ্যে ভগবানের করুণাকে দেখতে পেয়েছেন। জন স্টুয়ার্ট মিলের Subjection of Women-এর ওপর নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তারই পূর্বাভাস আমরা বিহারীলালের এই রচনার মধ্যে পেয়েছি। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যেও [১৮৮০] আমরা নারী-বন্দনা পেয়েছি। সর্বগুণসমন্বিতা হলেও মর্যাদার অভাবে কীভাবে দুঃখে হতাশায় তাদের জীবন কাটে বিহারীলাল তারই পরিচয় দিয়েছেন আটটি বঙ্গ-সীমন্তিনীর চিত্র এঁকে। সমাজের অবিচারের প্রতি ব্যঙ্গ করে পুরুষের সক্রিয়তার অভাবকে ধিক্কার দিয়ে বিহারীলাল এই বন্দনা গেয়েছেন। দ্বিতীয় সর্গের প্রথম অংশ 'নারী-বন্দনা' প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন [ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩২০] :

'আমার মনে হয় কোঁৎ (Comte) যদি এইটি পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্রুবধর্মের গাথাসমূহের মধ্যে [hymns of positive religion] ইহাকে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ স্থান দিতে অগ্রসর হইতেন'।

যাই হোক্ এই বন্দনার মধ্যে 'চিরাপরাধিনী' অংশটিতেই নারীর রোম্যান্টিক বেদনা সবচেয়ে করুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

'আমার সহিত সেই জনতার
যেন কোন কিছু সুবাদ নাই,
যেন কোন কিছু ধারিনে তাহার,
থাকি প্রভু ঘরে প্রভুরই খাই।

বই নিয়ে বসে বিষম বিপদ
বুঝিতে পারিনে উপমা তার
বুঝিবা কেমনে শুনিয়ে শব্দ
হেরি নাই কভু স্বরূপ যার।
বন, উপবন, ভূধর, সাগর,
তরঙ্গ লহরী নদীর বুকে ;
গ্রাম উপগ্রাম নিকুঞ্জ নিঝর,
শুনিলাম শুধু লোকেবই মুখে।···
গ্রামেব ভিতব উদাস, নিবাশ
ক্রমেই হুতাশ বাড়িছে মোর,
ওঠো ওঠো প্রায় প্রলয় বাতাস,
অভাগীব বাজী হয়েছে ভোর।'

[৪র্থ সর্গ, 'বঙ্গসুন্দরী']

'বঙ্গসুন্দরী'র পঞ্চম সর্গে 'করুণা সুন্দরী'র প্রেবণা পেয়েছিলেন কবি বায়রনের Childe Harold [To Ianthe, stanza 2] থেকে। সেই জন্যই বায়রনের উদ্ধৃতি দিয়ে এই সর্গে নাবীর দয়া ও করুণার দিকটি উদ্ঘাটিত করা হয়েছে।

'প্রেম প্রবাহিনী' [১৭৮০] কাব্যে হতাশ কবির চিত্তে দৈব আনন্দের স্ফুরণ দেখানো হয়েছে। কবি যেন বিশ্বজগতে প্রেমের সন্ধানে ফিরছেন। মানুষের প্রেমে তাঁর আস্থা নেই। 'সঙ্গীত শভকে'ব গানে সংসাবের যে রূঢ় অভিজ্ঞতার ছবি আমরা পেয়েছি সেই অভিজ্ঞতাব প্রতিধ্বনি তিনি শুনেছেন হ্যামলেটেব উক্তির মধ্যে। তাই বোম্যান্টিক কবির মতই নির্জনে প্রকৃতির সৌন্দর্যে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন :

'স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছ নিজ মনে,
দেখিবে না প্রেমমুখ আর এ জীবনে।
জলভ্রমে মৃগ আর যাইবে না ছুটে,
তপ্ত বালুকায় আব পড়িবে না লুটে।
যাবে না হৃদয় তার হইয়া বিদার,
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার।
প্রকৃতি-পবিত্র-প্রেমে হইয়া মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।' [৩য় সর্গ, 'প্রেমপ্রবাহিনী']

এই প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধানের রহস্যই কবির একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধানে তিনি বুঝেছেন প্রেমই সৃষ্টির কারণ। ক্রমশঃ কবি চিত্তের জাগরণ হয়েছে। কবি বলেছেন:

'সকলই শোভন তাব সকলি মোহন,
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন।
যাহা বলে তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে,
যা দেখায় তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে।
এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ;
আমার চক্ষেতে তাহা ধরিল এ রূপ,
কি জলে স্থলে শূন্যে যে দিকেই চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।'

রোম্যান্টিক কবিদের এই স্তরের প্রকৃতি-চেতনার কথা আগে উল্লেখ করিনি। এই স্তরে রোম্যান্টিকরা প্রকৃতিকে 'as a source and center of order, knowledge, certainty, stability as an emanation, indeed of God, of eternal mind'[৭] হিসেবে দেখেন। বিহারীলালের উপরি-উক্ত বোধেরই প্রতিচ্ছবি পাই ওয়ার্ডওয়ার্থের মধ্যে। বলা বাহুল্য, 'সোনার তরী'-'চিত্রা' 'চৈতলি'র যুগে রবীন্দ্রনাথেব মধ্যেই এই বোধ সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

And I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling in the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man ;
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, and objects of all thought,
And rolls through all things.

Tintern Abbey : Ll. 93—102

কিন্তু এই স্তরেই রোম্যাণ্টিকদের গতিবিধি শেষ নয়, বিহারীলালও থামেন নি। বিহারীলালের ভাষায় এর পর 'ব্রহ্মজ্ঞানে লইলাম তাহার শরণ'। সেই যোগস্থ অবস্থায় ভ্রাম্যমান, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দের পূর্বসূরী বিহারীলাল "বুদ্ধির সেই নূতন চেতনা'য় প্রেমকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন:

'কত দিন এ নগরে নিশীথ সময়ে
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে,
ব্যোমময় তারা সবে কর দপ দপ,
যেন মণিখচিত অসীম চন্দ্রাতপ,
কোন দিকে কোন রব নাহি শুনা যায়,
কভু মাত্র 'পিয়ুকাঁহা' হাঁকে পাপিয়ায়,
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো কোরে,
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুমঘোরে,
ফিরিয়াছি পথে পথে পাড়ায় পাড়ায়,
যেখানে দু চোখ গেছে, গিয়েছি সেথায়;···
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিধ প্রকার,
কোন পথে কোন চিহ্ন পাইনি তোমার।···
কত অমা ত্রিযামার ছাদের উপর,
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর।
তিমির সংঘাতে বিশ্ব গাঢ় ধ্বান্তময়,
দুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়।
যে দিকেতে চাই, সব অন্ধতম কূপ,
যেন মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট প্রতিরূপ।
নভ হতে নেবে গেছে তলাতল,
অসীম তিমির সিন্ধু রয়েছে কেবল।
যত দেখিতাম সেই ঘোর অন্ধকার,
উদিতো হৃদয়ে সব সংহার-আকার।
লয়ে যেত মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে কোরে,
শূন্যময় তমোময় শ্মশানে কবরে।
বিষাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্থান,
দেখিয়ে বিস্ময়ে হ'ত ব্যাকুল পরাণ।

যত ভাবিতাম মন করি সন্নিবেশ,
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ ;
সে সবার চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়,
যে সবার কোন কথা কেহ না শুধায়
পুরাণে কাহিনী মাত্র রয়েছে নির্দেশ ।
ধরণীর গর্ভে মগ্ন ভগ্ন-অবশেষ । [পঞ্চম সর্গ]

শেলির Alastor-এর মধ্যেও এই রকম অন্বেষণের প্রায় সমান্তরাল ছবি পাচ্ছি :

' In lone and silent hours,
When night makes a weird sound of its own stillness,
Like an inspired and desperate alchemist
Staking his very life on some dark hope,
Have I mixed awful talk and asking looks
With my most innocent love, until strange tears
Uniting with those breathless kisses, made
Such magic as compels the charmed night
To render up thy charge . and though.. ne'er yet
Thou hast unveiled thy inmost Sanctuary. .'

Ll 29-38

ঠিক এরই পূর্ববর্তী পংক্তিগুলিতে কবি বলেছেন :

I have watched
Thy shadow, and the darkness of thy steps,
And my heart ever gazes on the depth
Of thy deep mysteries. I have made my bed
In charnels and on coffins, where black death
Keeps record of the trophies won from thee,
Hoping to still these obstinate questionings
Of thee and thine, by forcing some lone ghost,
Thy messenger, to render up the tale
Of what we are.' Ll 20-29

দেখা যাচ্ছে শেলি এবং বিহারীলাল উভয়েই সৌন্দর্যের অন্বেষণে সমস্থানচারী। আনন্দ 'উপলব্ধির চরম মুহূর্তে শেলির কথাই মনে পড়ে। বিহারীলাল বলেছেন:

'কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায়!
অমনি হৃদয় এক আলোক পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।'

শেলি তাঁর Hymn to Intellectual Beauty-তে বলেছেন:

'Sudden, thy shodow fell on me
I shrieked, and clasped my hands in ecstasy!' [V]

তারপর সেই আনন্দিত যোগাবস্থায় বিহারীলাল বলেছেন:

'মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে
দেহ যেন ফাটিতেছে নবাবেগ ভরে
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে সেই স্থানে।
অহো অহো, আহা আহা, একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময়।'

Tintern Abbey-তেও এই যোগাবস্থার কথা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকাশ করেছেন:

'We are laid asleep
In body, and become a living soul,
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things, ' Ll 45-49,

এই অবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে—'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' প্রসঙ্গে। তাঁর রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো 'নিসর্গ সন্দর্শন' [১৮৭০]। এই কাব্যে প্রকৃতির গম্ভীর ও উত্তাল দিকটিকে উপস্থিত করা হয়েছে। এই গাম্ভীর্য ও উত্তালতার মধ্যে যে রহস্য ও বিস্ময় রয়েছে তাই হলো রোম্যান্টিক লক্ষণ। রোম্যান্টিক কবিতার সংস্পর্শে এসেই আমরা এই রকম প্রাকৃতিক বিভিন্ন মেজাজকে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করেছি।

'নিসর্গ সন্দর্শনে'র দ্বিতীয় সর্গ 'সমুদ্রদর্শন', বায়রনের Childe Harold IV-থেকে নেওয়া—কোনো কোনো অংশে আক্ষরিক অর্থেই নেওয়া। বিহারীলাল বলেছেন :

গড়াও গড়াও তুমি আপনার মনে !
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময় ,;
তোমার উদার রূপ হেরিয়া নয়নে,
জুড়াক এ অভাগার তাপিত হৃদয়।
ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
বিস্ময় আনন্দরসে আলোড়িতে মন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।···
কলের জাহাজে চড়ে মানব সকলে,
দম্ভভরে চক্ষে আর দেখিতে না পায়,
মনে করে তোমারে এনেছে করতলে
যা খুশী করিতে পাবে, কিছু না ডরায়।···
দুই একবার মাত্র ভুড়ভুড় করে,
মুহূর্তে মিলায়ে যায় বুদবুদের প্রায় ,
মাটির পুতুল চড়ে ভেলার উপরে
জনমের মত হায় রসাতলে যায়।

'সমুদ্রদর্শন' : ২৯, ৩০, ৩২, ৩৫

Childe Harold-এর Canto IV-এর দ্বিতীয় স্তবকে বায়রন লিখছেন :

Roll on, thou deep and dark blue ocean-roll !
Ten thousand fleets sweep over thee in vain ;
Man marks the earth with ruin—his control
Stop with the shore , —upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of man's ravage, save his own,
When, for a moment, like a drop of rain,
He sinks into thy depths with bubbling groan,
Without a grave, unknell'd, unconffin'd and unknown.

'নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ' কথাটির স্মারক হলো ষষ্ঠ স্তবক। 'Thou glorious mirror, where the Almighty's form / Glasses itself in tempests', 'The image of enternity' ইত্যাদি প্রকাশভঙ্গিগুলি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। ষষ্ঠ সর্গের প্রাথমিক উদ্ধৃতিও Childe Harold থেকে নেওয়া [Canto XII, XCIII]। 'ঝটিকাসম্ভোগ' এই নামটিও যেন বায়রনের পংক্তির স্মারক: 'Let me be / A sharer in thy fierce and far delight, / A portion of the tempest and of thee' এছাড়া Childe Harold-এর বহু পংক্তির সঙ্গে 'নিসর্গদর্শনে'র ইতস্তত আরো বহু পংক্তির মিল রয়েছে।

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গল' [১৮৭৯]। কাব্যগুণে এবং আধ্যাত্মিক গভীরতায় এই কাব্য অন্যান্য কাব্যগুলির তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের। আপন কাব্যলক্ষ্মীকে কবি অন্তরে বাইরে যেভাবে যেরূপে উপলব্ধি করেছেন তাকেই এঁকেছেন 'সারদামঙ্গলে'র মধ্যে। সমস্ত কাব্যটি একটি স্বপ্নের মতো। ভোর বেলাকার মাধুর্য তাতে রয়েছে। প্রাণেরই প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশে তা জীবন্ত। সারদার মধ্য দিয়ে অব্যক্ত 'আনন্দ'কে মূর্তি দিয়েছেন কবি, 'মঙ্গল'কে জীবন দিয়েছেন, মানুষের দুর্লভতম মুহূর্তকে সৃষ্টির প্রথম আলোতে স্থায়ীভাবে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এই আনন্দবার্তা তিনি পূর্বেকার কাব্যরচনাকালেই পেয়েছেন, তখন তিনি রোম্যান্টিক কবিতার পাঠক। কিন্তু সমগ্র বিশ্বজগতের সৌন্দর্যের পটভূমিকায় প্রতিমূর্তি কল্পনার পিছনে যে শক্তি কাজ করেছে তাকে তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার সূত্রেই ধীরে ধীরে আয়ত্ত করেছেন। এক বন্ধুকে কবি লিখেছেন[৮]: 'মৈত্রী-বিরহ, প্রীতি-বিরহ, সরস্বতী-বিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি 'সারদা-মঙ্গল' রচনা করি।· ·· গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তীকাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকিকাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালে ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি রচনান্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্তির সহিত বিরহিত মৈত্রী-প্রীতির ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।' সারদার এই যে পরস্পর-বিরোধী গুণ, আনন্দময়ী-বিষাদিনী, স্পষ্ট-অস্পষ্ট বা তিরোহিত ভাব—এইগুলিই হলো রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের গুণ। রুশো 'romantique'

বলতে 'elusive and indistinct' বস্তুকেই বোঝাতেন। Faust-এর যে উক্তিকে রোমান্টিসিজ্‌মের সার মনে করা হয় তার মধ্যেও রয়েছে: 'Oh! What delight! What woe!' শেলি তাঁর 'To a Skylark' কবিতায় বলেছেন: 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' কীটস্‌ তাঁর Ode on Melancholy-তে বলেছেন:

'She dwells with Beauty—Beauty that must die,
And Joy, whose hand is ever at his lips
Bidding adieu; and aching Pleasure nigh,
Turning to poison while the bee-mouth sips
Ay, in the very temple of Delight
Veil'd melancholy has her sovran shrine,
Though seen of none save him whose strenuous tongue
Can burst Joy's grape against his palate fine,
His soul shall taste the sadness of her might,
And be among her cloudy trophies hung.'

এই বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-সৌন্দর্য এবং তার থেকে মানুষের বিশুদ্ধ অনুভূতির উদ্রেক—দুয়েরই মূলে আছে সারদা। তিনিই কবির কবিত্বশক্তির প্রেরণাদাত্রী। তৃতীয় সর্গে কবি বলেছেন:

'বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র-তারা-হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি,
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার।
বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে!

জ্যোতির প্রবাহ মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে।
কে তুমি লাবণ্যলতা মূর্তি মধুরিমা!
মৃদু মৃদু হাসি হাসি,
বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা?' [৮-১০]

কবির প্রেরণাদাত্রী তিনি। তাই কবি বলেছেন:

'তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমিই মনের দীপ্তি
তোমাহারা হলে আমি প্রাণহারা হই,
করুণা কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব—
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।'

তিনিই হলেন কবির 'মানস-মরালী, মম আনন্দরূপিনী'। এই শক্তিকে উদ্দেশ্য করেই ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন:

' ..a sense sublime of something far more deeply
interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and living air,
And the blue sky, and in the mind of man '

Tintern Abbey

অন্যত্র 'The Prelude' কবিতায় Crossing the Alps-প্রসঙ্গে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ একই অনুভূতির শিখরে গিয়ে পৌঁচেছেন:

The immeasurable height
Of wood decaying, never to be decayed,
The stationary blast of waterfalls
And in the narrow rent at every turn
Winds thwarting winds, bewildered and forlorn.
The torrents shooting from the clear blue sky,
The rocks that muttered close upon over ears,

Black drizzling crags that spake by the wayside
As if a voice were in them, the sick sight
And giddy prospect of the raving stream,
The unfettered clouds and region of the Heavens,
Tumult and peace, the darkness and the light—
Were all like workings of one mind, the features
Of the same face, blosooms upon one tree ,
Characters of the great Apocalypse,
The types and symbols of Eternity,
Of first, and last, and midst, and without end.

VI. 624-640

কবি তাঁর আনন্দ-লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে অভিসারে গেছেন: 'ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে।' কিন্তু আশার আলো সব সময়ে পাওয়া যায় না: 'সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথায়।' এই রোমান্টিক voyage-এর পর হিমালয়ের পুণ্যভূমিতে কবির অভিপ্রেত আনন্দ-উপলব্ধি ঘটলো। সৌন্দর্যের আহ্বানে চিরপলাতক 'সারদা'র উদ্দেশ্যে কবির অনুসন্ধান প্লেটোনিক প্রেমানুভূতির স্মারক। 'মায়াদেবী'র (১২৮৯ ভারতীতে প্রকাশিত) মধ্যে সেই 'সারদার'ই বিচিত্র উপলব্ধি, 'শরৎকালে'ও তাঁরই প্রেরণা ও স্মৃতি, 'ধূমকেতু' ও 'দেবরাণী'র মধ্যে সেই একই আত্ম-বিমুগ্ধ ভাব। 'বাউল বিংশতি'র গানেও কবির একই রোমান্টিক অতৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন' (১২৯৫-১২৯৬-এর মধ্যে রচিত) 'সারদামঙ্গলে'র পরিশিষ্টের মতো। 'সারদামঙ্গলে'র উপসংহারে 'শান্তি' অংশে আপন দাম্পত্য-জীবনেই কবি মানবপ্রেমের সার্থকতা দেখেছিলেন: 'তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি।' এখন সেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যেই নিখিল মানবকে দেখলেন: 'ভালবাসি নারীনরে, ভালবাসি চরাচরে, ভালবাসি আপনারে।' অমরাবতীর যাত্রী এক পতিব্রতাকে দেখলেন কবি। তাঁরই অনুরাগ ও উৎসাহ কবিকে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর প্রেমের মর্যাদা সংসারে স্বীকৃতি পায় নি। তাই কবি কামনা করেছেন: 'প্রাণের অমৃতরাশি / ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে।'

লক্ষ্য করার বিষয় এই, বিহারীলাল শেলির মতোই প্রেম-সৌন্দর্যের

মিস্টিক কবি। তাঁর কাছে জীবন ও প্রেম একার্থক। 'মায়াদেবী' কাব্যের একটি স্তবকে রয়েছে :

'স্থির ধীর নীল অনন্ত অপার
এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার
চলিয়াছ ভাসি ভাসি ;
মৃদুল মৃদুল ঠেকে ঠেকে গায়
কিরণের ফেন উছলিয়া যায়,
দশদিক দিয়ে দেখিতে তোমায়
ফুটেছে তারকাবাশি।'১০।

এইভাবে তাবকাবাশিব চোখে যেন কবি সমস্ত সৌন্দর্যেব মায়াতবীটিকে দেখে নিতে চান। সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিব মধ্যে পবস্পরেব প্রতি এই বকমই তারকারাশির মতো উন্মুখীন ভালবাসা বয়েছে। কাজেই ছদ্মবেশী বহুপরিচিত প্লেটোনিক ভালোবাসাব কান্নাকে ধিক্কাব দিয়ে বিহাবীলাল শেলির মতোই উদার উচ্চকিতকণ্ঠে বলেছেন :

'প্রেমেব দবাজ জান
আকাশে ঢালিযা প্রাণ
সজোবে পাপিয়া হাঁকে 'পীহু পীহু পীহু'।'
'নিশীথ সঙ্গীত' ৩১, শবৎকাল।

এই অগাধ প্রেমকে বুকে নিয়ে সমস্ত বিশ্বেব মধ্যে তাকে বিলিযে দিতে রাজি আছেন কবি। কাবণ, তিনি জানেন প্রেমই হলো সমগ্র বিশ্বজগতের সম্মিলনীশক্তি এবং সে শক্তি নারী ছাড়া আব কি। 'বাউল বিংশতি'ব একটি গানে রয়েছে :

'বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপাব,
আছে, বিশ্বজযী শক্তিময়ী নাবী এ ধবায়,
তাই নরে নিধি পায় ,
আমাব সেই-ই স্বর্গ চতুর্বর্গ,
ধারি কেবল প্রেমের ধার।'

এক্ষেত্রে বিহারীলাল নিঃসন্দেহে বোম্যান্টিক প্রভাবকে অতিক্রম করে গেছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীব ধারণা নিয়ে কবি বলেছেন :

কে তুমি, মা। কান্তিরূপে সর্বভূতে বিভাসিত।

প্রশ্ন করেছেন :

তুমি কি প্রাণের প্রাণ? তুমিই কি চেতনা?

কবি এই অবস্থায় এক বিশ্বমাতৃরূপের ধ্যানে ভারতীয় আদর্শে নিমগ্ন হয়েছেন। শেলির Hymn to Intellectual Beauty এবং Adonais, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের The Prelude কিংবা Tintern Abbey-র প্রেরণায় বিহারীলাল অদৃশ্য শক্তির রূপ ধ্যান করেছিলেন [Adonais-এর মধ্যে শেলি একেই বলেছেন 'Spirit's plastic stress']। কিন্তু তার পরিণতি হলো কান্তিরূপে সংস্থিত দেবীতে, সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী কল্পনায়।

কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে বিহারীলাল যতখানি মৌলিক, ছন্দ-বৈশিষ্ট্যে ততখানি মৌলিক নন। ছন্দ-বৈশিষ্ট্যে তিনি সচেতন শিল্পী একথা বোধ হয় বলা চলে না। ছন্দের ওপর ভাষার আধিপত্যকে বাড়তে দেওয়ার সুযোগ রোম্যান্টিক কবিরা দিয়েছিলেন। এমন হতে পারে, বিহারীলাল সেই আদর্শেই তাঁর কাব্যে তৎসম-তদ্ভব শব্দের নির্বিচার মিশ্রণ করেছেন। কিন্তু সে মিশ্রণে সব সময়ে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়। যেমন :

ক। গুরুম আওয়াজ এসে প্রবেশিল কানে,
চট্‌কা ভেঙ্গে পরস্পরে চাই মুখপানে।

'বন্ধুবিয়োগ', ১ম সর্গ।

খ। কেমন তরুণ নধর গঠন,
কেমন চিতোন নিটোল বুক।

'বঙ্গসুন্দরী', ৩য় সর্গ ৫৭।

গ। ছটাচ্ছট্ বৃষ্টি শিলা বাঁটুল বর্ষণ।

'নিসর্গ সন্দর্শন', ৩য় সর্গ ১৪।

রোম্যান্টিকদের মত speech rhythm ব্যবহারের কিছু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

ক। তামাকটি পর্যন্ত যেন ভুলেও না খান,
ভুলেও কুপথে যেতে কখন না চান।

'বন্ধুবিয়োগ', ১ম সর্গ।

খ। একি! আচম্বিতে ম্লান হয় কেন,
জগত ব্যাপিনী নাথের ছবি। 'বঙ্গসুন্দরী', ৮ম সর্গ ৪১।

গ। মর যদি, মরা চাই মানুষের মত।

'সারদামঙ্গল', ২য় সর্গ ২০।

ছন্দের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব দেখাতে না পারলেও বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিলেন। মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারের আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন নি, প্রচলিত বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 'প্রেমপ্রবাহিনী' ও 'বন্ধুবিয়োগ' এই ছন্দেই লেখা। 'বঙ্গসুন্দরী'তে বিহারীলাল একটু নতুনত্ব আনলেন। যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব পরিহার করে ছয় মাত্রার পর্বে (বারো এগারো মাত্রার পদে) কোমল ধ্বনিস্পন্দন ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন:

'শ্যামল বরণ বিমল আকাশ
হৃদয় তোমার অমরাবতী,
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।'

'বঙ্গসুন্দরী', ৩য় সর্গ ১৩।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

'একদা এই ছন্দটাই আমি বেশী করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মত।'

পরে এই যুক্তধ্বনি-বর্জিত তিন মাত্রার ছন্দে অতিলালিত্যদোষ এসেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এ রীতি বর্জন করেছিলেন।

ইতিপূর্বে মাইকেলের মুক্তক রচনা প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি। হেমচন্দ্রের মধ্যেও মুক্তক রচনার ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করি। বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসন' কাব্যে কিছু কিছু মুক্তকের স্তবক রচনা করেছেন। একটি স্তবকের অংশ উদ্ধার করছি:

'আর্দ্রিয়া হিমাদ্রিমালা
সুরধুনী করে খেলা,
সুধা করে
সুধা ক্ষরে
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণী,
অমর, দানব, নর।'

৩য় সর্গ, যোগেন্দ্রবালা ২।

স্তবক রচনায় বিহারীলাল কিছু বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। বিশেষ করে মিশ্র স্তবক—একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদীর মিশ্র স্তবক অনেক রচনা করেছেন। 'সারদামঙ্গলে' ও 'সাধের আসনে' সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত স্তবক হলো ছয় পংক্তির স্তবক, দ্বিপদী ও একপদীর সংমিশ্রণ বা দুটি দীর্ঘ ত্রিপদীর মিশ্রণ :

'নেমে নেমে ধারাগুলি
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায়,
ঘোর রবে ভাঙ্গে জল,
পশুপক্ষী কোলাহল করিয়ে বেড়ায়।'

'সারদামঙ্গল', ৪র্থ সর্গ ২৬।

অনেক ক্ষেত্রে এই ত্রিপদী চারটি মিশিয়ে একটি স্তবক গঠন করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই রকম দুটি ত্রিপদীর পর আরও একটি একপদী যোগ করা হয়েছে। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে মিশ্র একপদী ও চৌপদীর স্তবক পাওয়া যায়। 'To a Skylark' কবিতার স্তবকগুলি এক্ষেত্রে কবিকে প্রেরণা দিয়ে থাকতে পারে :

'শূন্যময় নির্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্ত পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।'

'বঙ্গসুন্দরী', প্রথম সর্গ ৩।

'বঙ্গসুন্দরী'র তিন মাত্রার পদক্ষেপের চতুষ্পংক্তিক স্তবকগুলির মিল কখ কখ। ইংরিজি কবিতার আদর্শেই এই মিলের রীতি গৃহীত হয়েছে। গ্রে-র Elegy, ব্লেকের কিছু কবিতা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Lucy Poems এই মিল বিন্যাসে লেখা। খুব বেশি দূরান্তরিত মিলের কৌশল বিহারীলাল দেখাতে পারেন নি। 'সাধের আসনে'র কয়েকটি মুক্তকের স্তবকে দূরান্তরিত মিল লক্ষ্য করা যায় :

'চাহিয়া তাঁহার পানে
কি যেন বাজিল প্রাণে,

কতই স্মরণ করি স্মৃতিপটে ফোটে না,
অকারণ কি কারণ
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন।
এই যে কি স্বপ্ন দেখে
চমকিয়া ঘুম থেকে
উঠিলাম,
ভাবিলাম,
হায় সে স্বপন কেন আর মনে পড়ে না।

'সাধের আসন', ষষ্ঠ সর্গ ৩।

১। পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, পৃ. ১৬৭—১৬৬ দ্রষ্টব্য।

২। জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সাহিত্যের সঙ্গী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩। আধুনিক সাহিত্য : 'বিহারীলাল' প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪। ঐ

৫। বাংলা কাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র : হরপ্রসাদ মিত্র। 'বিহারীলাল চক্রবর্তী'র প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৬। Lines written in Early Spring . Lyrical Ballads, 1798.

৭। Romantic and Victorian Poetry Ed. by Willam Frost, Vol. VI Second Edition . Introduction : Page 8.

৮। রংপুর নিবাসী অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত।

৯। এই প্রসঙ্গে Romantic Agony Mario Praz : Introduc--tion ও Chapter I দ্রষ্টব্য।

আট

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

মহাকাব্যের ক্লাসিকাল আদর্শ ও রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস—এই দুই প্রবণতাকে যিনি কিছুটা মেলাতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন উপেক্ষিত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮—৭৮)। সে যুগে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যে ভাবোচ্ছ্বাসে বাঙালী কাব্য-রসিককে মাতিয়ে রেখেছিলেন সে ভাবোচ্ছ্বাস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না। অনেকটা সেই কারণেই সুরেন্দ্রনাথ সে যুগে উপেক্ষিত হয়েছিলেন। অথচ তাঁর কবিদৃষ্টির স্বভাব, চিন্তার মৌলিকতা এবং বাক্য-যোজনার মৌলিক ভঙ্গি যদি হেম-নবীনের থাকতো তাহলে তাঁদের জনপ্রিয়তা কম হলেও বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধি ঘটতো।

যশোহর জেলার জগন্নাথপুরে তাঁর জন্ম। শৈশব ও বাল্যকাল তাঁর গ্রামেই কেটেছিল। আট ন' বছর বয়স থেকেই তিনি ফার্সি ও সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেন এবং নীতিকথামূলক কিছু বইও আয়ত্তে আনতে থাকেন।

এগারো বছর বয়সে (১২৫৪) সুরেন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। সেই বছরই কলকাতায় চার্চ ইন্‌স্টিটিউশনে তিনি প্রথম ইংরিজি পড়তে প্রবৃত্ত হন। কয়েক মাস পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়ে তিন বছর অধ্যয়ন করেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল, কিন্তু ইংরিজি শিক্ষার প্রেরণায় তিনি 'উষাশোধিত বালার্কের ন্যায় উদয়শীল' হন। স্কুলে তিনি পড়াশোনায় বরাবরই প্রথম হতেন। এবং উচ্চ শিক্ষালাভের পথে দ্রুত অগ্রগতি দেখে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বিস্মিত হয়েছিলেন। কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবের সংস্পর্শে আসার সময় থেকেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তাঁর 'ষড়ঋতু বর্ণন' প্রকাশিত হয়। এবং তাঁর 'উষা', 'স্বপ্ন', 'ঈশ্বরপরায়ণের মৃত্যু' ইত্যাদি কবিতায় মার্জিত চিন্তার পরিচয় দেন। তৎকালীন বাঙলা কবিতার রুচিগত পরিবেশ বিচার করলে তাঁকে অবশ্যই সম্মান দিতে হয়। ক্রমে 'টেলিমকস' ও 'রোমান ইতিহাস'-এর কিছু কিছু গদ্যানুবাদ করেন। সেগুলিতেও তাঁর পরিমিতি-বোধ ও প্রাঞ্জলতার পরিচয় ছিল।

ভাষা আয়ত্ত করার পর সুরেন্দ্রনাথ কৈশোরে নিজেই ইংরিজি সাহিত্য সাহস ক'রে পড়তেন, অন্যের সাহায্য নিতেন না। এর থেকে ইংরিজি শিক্ষার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বোঝা যায়।

১২৬৫-তে সুরেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন। পরের বছর তিনি রোগাক্রান্ত হন। চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর রোগ ভালো ভাবে সারে নি। ঐ বছরই 'মঙ্গল-উষা' নাম দিয়ে এক সাময়িক পত্র বার করেন। এই পত্রিকার জন্মখণ্ডে পোপের Temple of Fame-এর অনুবাদ 'যশোমন্দির' নামে প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি 'প্রতিভা' ('বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় প্রকাশিত) ও 'কবিপ্রশংসা' নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। এর পরে তাঁর জীবনে দু'জন বন্ধু লাভ হয়। প্রথম জন পণ্ডিত, একেশ্বরবাদী এক পরমহংস, দ্বিতীয় জন আরবি ফার্সি উর্দু ইংরিজি জানা, দর্শন ও সঙ্গীতের উৎসাহী, নিরীশ্বরবাদী এক মৌলবী। এই মৌলবীর মাধ্যমেই কবি সুরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গভূমিতে গিয়ে পৌছলেন।[১] এই সময়কার চিঠিপত্রে[২] কবির অধঃপতনের জন্য আক্ষেপ ও হতাশার পরিচয় পাই, কিন্তু তবু যে কবি প্রকৃতিপ্রেমিক তার প্রমাণ আছে। এবং এর মধ্যেই তাঁর ইংরিজি সাহিত্য পাঠেরও প্রমাণ আছে। একটি চিঠিতে কবি লিখছেন:

'স্বজন বা স্বজনানুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্যায় ক্রমে বিলীন হইয়াছে। অন্তরাকাশ নিষ্প্রভ, আর তাহাতে সন্তোষ-সুধাকরের উদয় হইবে না। হায়। কঠোরতা কি আমার স্বভাব?'

মন আর প্রকৃতির সম্মিলনটি অভিনবদৃষ্টির পরিচায়ক। আর এক স্থানে কবি লিখছেন:

'ইয়ুরোপীয় জনৈক কোমলপ্রকৃতি কবি নির্ধন কৃষিজীবিগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যাহারা সুললিত গাথা গানে মানবমন মোহিত করিত, যাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন-শোভা সম্পাদন করিতে পারিত, প্রকৃতি-দেবী যাহাদিগকে এই সকল গুণভাজন করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈন্যতাবশতঃ জঘন্যভাবে জীবন যাপন করিয়া পরিশেষে অনুশোচিত মৃত্যুমুখে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। দৈন্যদশারূপ তুষার প্রপাতে তাহাদের অন্তর্নদীর গতি চিরদিনের জন্য নিরোধ হইয়াছিল।

'হায়! কীর্তি দেবীর অঙ্কপালিত সে ভুবন বিখ্যাত অবতারগণই বা কোথায় আর মাদৃশ হতভাগাই বা কোথায়?'

১২৬৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নী বিবাহের পরের বছরই মারা যান। দ্বিতীয় বিবাহের পর থেকে তাঁর জীবনে অনেকটা উন্নতি আসে। এর পরেকার কিছু রচনা তাঁর জীবনীকারের মতে 'অপহৃত হইয়াছে', যা পাওয়া যাচ্ছে তা অনুবাদ। মহাভারতের কিরাতার্জুনীয় অংশ,

পোপের 'Eloisa to Abelard', গোল্ড স্মিথের 'Traveller', ও মুরের 'Irish Melodies'-এর কিছু অংশ হৃদয়গ্রাহী ছন্দে কবি অনুবাদ করেছিলেন।

১২৭৪ সালে কবি যখন দ্বিতীয়বার অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন সেই অবস্থায় সাহিত্যচর্চা কিছু করেছিলেন। মদ্যপানের অশুভ ফল তাঁর জানা ছিল। সেই সম্পর্কে তিনি 'নবোন্নতি' নামে একটি আখ্যায়িকা এবং 'মাদকমঙ্গল' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তখন দেশে সুরাপান নিরোধের আন্দোলন চলছিল, এই আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা প্যারীচরণ সরকার এই দুটি রচনার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। ঐ বছরই কবি হেয়ার স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক নীলমণি চক্রবর্তীর সহায়তায় গ্রের Elegy পাঠ করে বাংলায় অনুবাদ করেন। পরের বছর কবি Bravo of Venice এবং প্লেটোর Immortality of the Soul অনুবাদ করেন। তাঁর জীবনীকার যোগেন্দ্রনাথ সরকার বলছেন :[৩]

> 'এই শেষোক্ত রচনা, ব্যাপককালে গাঢ় গবেষণায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কবি তিন বৎসর কাল গভীর পাণ্ডিত্য দ্বারা ইহার অবতরণিকা ও টীকা-সমস্ত প্রস্তুত করেন, যাহাতে মূলে সক্রেটিসের জীবনী ছিল এবং টিপ্পনীতে পৃথিবীর ভূত-বর্তমান ধর্মবিশ্বাস, নব্যবৃদ্ধ দার্শনিক সত্য ও প্রাচীন গ্রীক-ভারতের আচারগত সাদৃশ্য সকল সাবধানে আলোচিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রণেতার ভূয়োদর্শন ও বিচারশক্তি যেন সমস্ত স্ফূর্তির পরিচয় লইয়াছিল।' [বসুমতী সংস্করণ]

১২৭৮ সনে মুঙ্গেরে থাকতে কবি 'মহিলা' কাব্য লেখেন। এর পর উনিশ শতকের কবি সাহিত্যিকদের অন্যতম প্রিয় বই টডের 'রাজস্থান' অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন কবি। এই অনুবাদ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১২৮৫ [১৮৭৮] সালে কবি মারা যান। উপসংহার টানবার আগে তাঁর জীবনীকার বলছেন :[৪]

> 'সুরেন্দ্রনাথ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার ছাত্র ও সহবাসিগণের বিশ্বাস। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও বিশ্বস্ত ও ভদ্র, পরস্পর কোন নৈকট্যও নাই, অথচ সমতান ও মুক্তকণ্ঠে বলেন, সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজি অভিজ্ঞতার ইয়ত্তা নাই এবং তাঁহার অধ্যাপনা অব্যর্থ ফলদান করিত। পক্ষান্তরে তাঁহার জাতীয় পবিত্রতা বদ্ধমূল ও রুচি আর্য-বিশুদ্ধি রঞ্জিত ছিল। তিনি ইয়ুরোপীয় জ্ঞানের অমিশ্রণে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের সেবা করিতেন। সিদ্ধি সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া তাঁহার সাধনার সম্মুখীন হইত,—বাক্য ও কার্য এক যোগে নীতি উপদেশ প্রদান করিত।'

সুরেন্দ্রনাথের 'ষড়ঋতু বর্ণন' প্রথম রচনা (১২৬৬)। সেযুগে প্রকৃতি-বিষয়ক স্বতন্ত্র কাব্য রচনার উদাহরণ হিসাবে এই কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সবিতা সুদর্শন' ও 'ফুলরা' এই দুটি গাথা। দুটিই প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্য। অক্ষয় চৌধুরীকে সাধারণত গাথা কাব্যের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। 'কিন্তু উদাসিনী' (১৮৭৪) রচনার বহু আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা' নামে (১৮৫৬) একটি গাথা কাব্য লিখেছিলেন। স্কটের Matrical Romance ছিল তাঁর আদর্শ। কারণ বঙ্কিম স্কটের রচনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তারপরেই সুরেন্দ্রনাথ লিখলেন এই দুটি গাথা কাব্য। পরবর্তী-কালে নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র এঁদেরই পথ অনুসরণ করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্য 'বর্ষবর্তন' (১৮৭২) নীতি-ও আত্মচিন্তামূলক কাব্য। এ কাব্যটির মূলেও বিদেশী কাব্যের ছায়া আছে। কাব্যের প্রারম্ভে Edward Young [1683-1765]-এর Night Thoughts যে উদ্ধৃতি আছে তা উদ্ধার করছি :

> We take no note of time
> But from its loss To give it then a tongue
> Is wise.

এই ভাবনার সূত্র ধরে কবি যুক্তিনির্দিষ্ট দেশ ও কাল-সীমাকে অস্বীকার করে আপাতস্থির জগতের বিচিত্র পরিবর্তনশীলতাকে লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইয়ং-এর নাইট থট্‌স্ [১৭৪২—৪৫]-এ রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনার সূত্র খুঁজতে গিয়ে ব্রায়ান হেপওয়ার্থের বিশ্লেষণী মন্তব্য স্মরণীয় :

> The crucial characteristic of eighteenth-century poetry, a double image of time which necessarily suggests timelessness and a sense of divine originality, informed not only Young's entire writing career, but enabled Blake to converse with Ezekiel and Isiah, Smart to write Biblical poems full of that Indian cocoa and quinces, and perhaps prompted Chatterton—and Macpherson to compose what now seem fraudulent 'primitive' artifacts. Young's Conjectures [On Original Composition (1759)] opposes to the structures of

time, an orangic image of creativity, within—not reflective of—Nature, and insists on the development of the individual self in the act of writing in a manner that reminds us that solitary genius, and the artist's life as his major creation, were characteristics of the Romantic revolution.

অন্তহীন কালচেতনা, সৃষ্টির ঐশ্বরিক উৎস, আদিমতার প্রতি আকর্ষণ, প্রাকৃতিক অনুকরণের বদলে প্রকৃতির রাজ্যেই ব্যক্তির প্রতিভায় নিজস্ব জগৎ-সৃষ্টির চেষ্টা—এই সবই ইয়ং-এর রচনার বৈশিষ্ট্য বলে এবং রোম্যান্টিক চেতনার মৌলিক লক্ষণ বলে স্বভাবতঃই ইয়ং এর চর্চা পরবর্তীকালের ইংরেজ কবি ব্লেক, স্মার্ট, চ্যাটার্টন, ম্যাকফার্সন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কীট্‌স যেমন করেছেন তেমনি বাঙালী রোম্যান্টিক কবিরাও করেছেন।

ইতিহাসে রোম ও ফরাসি সাম্রাজ্যের কথা তাঁর মনে হয়েছে। তাদের সভ্যতা কোথায় তলিয়ে গেছে। এই অন্তর্লীন গতিশীল কালকে ভ্রূক্ষেপ না করেই মানুষ পৃথিবীর নাট্যশালায় সং সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে নতুন এক একটি বছর মানুষকে মৃত্যুর দিকে এক এক ধাপ এগিয়ে দিচ্ছে। এ চিন্তার পেছনে মাইকেলের 'নূতন বৎসর' সনেটের ভাবনা রয়েছে, তাছাড়া শেক্‌স্‌পিয়ারের Life is but a walking shadow-র ভাবনাসূত্র খুব সম্ভব কাজ করেছে। আরও উল্লেখযোগ্য, যে Young-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তাঁর কাব্য উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে হিন্দু কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছিল। সেই সূত্রেই সুরেন্দ্রনাথের মতো নবীন জিজ্ঞাসুর হস্তগত হয়েছিল এই বইটি।

যে কটি কাব্য সুরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার মধ্যে 'মহিলা' কাব্যটি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। কবির মৃত্যুর পরে এই কাব্য অসমাপ্ত আকারে [প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে] প্রকাশিত হয় (১৮৮০, ১৮৮৩)। এই কাব্যের প্রেরণা ছিল বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে কবি একাধিক নারীর স্তুতি গেয়েছেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সাধারণ ভাবে নারীর আরতি-মন্ত্র রচনা করেছেন। 'উপহার' অংশে কবি নারী-সৃষ্টির আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে মাতৃ-বন্দনা, তৃতীয় ভাগে জায়া-বর্ণনা। 'উপহার' অংশে সভ্য সমাজের ক্রমবিবর্তন বর্ণনায় Evolution তত্ত্বের অনুসরণ করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে বিবাহপ্রথা বিবাহ-উৎসব, পূর্বরাগ, বিধবার অবস্থা ও নারীর স্বাধীনতা। অবশ্যই এ আলোচনা নারী সম্পর্কে চেতনার ফল। উনিশ

শতকে subjection of women-এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠেছিল, পাশ্চাত্ত্য সমাজদর্শনই যার প্রেরণাস্থল, এখানে তারই পরিচয় বিধৃত।

'মহিলা' কাব্যে বিদেশী কাব্যপদ্ধতিতে কবিত্বশক্তির invocation আছে। নবজাগ্রত নারীসম্ভ্রমবোধের প্রকাশ ঘটেছে, বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রযুক্তি খুঁজে পেয়েছেন বলে বিদ্যাসাগরের স্তুতি আছে ['অতি মহাজন তিনি, দুঃখ বিধবার/প্রতীকারে ভারতে প্রথম যত্ন যাঁর' ইত্যাদি, জায়া, ২০১ শ্লোক], বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের অনুসরণে সীতা চরিত্রের মধ্যে ভারতীয় নারীর অসহায় ক্রন্দন শোনা গেছে ['হে ভারত, মুগ্ধ তুমি স্বর্ণলঙ্কা প্রায়। / কত সীতা কান্দে দেখে সতত তোমায়॥' মাতা ২৩ শ্লোক] এবং হিন্দু শাস্ত্রে নারীর প্রতি অবিশ্বাসের কথা থাকায় শাস্ত্রকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে ['নারীর প্রতি অপ্রত্যয় ভারতে যেমন, / আর নাহি লক্ষ্য হয় কোথাও এমন' ইত্যাদি, জায়া, ২২৮ শ্লোক]।

দেশী-বিদেশী সাহিত্যে, যেখানে নারীর মর্যাদা, প্রয়োজনীয়তা, অনিবার্যতা প্রেম, আত্মত্যাগ, দয়া, করুণা, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলীর পরিচয় কবি, পেয়েছেন, যেমন, বেকনের প্রবন্ধ ('Of Marriage and Single Life'), শেক্‌স্‌পিয়ারের সাহিত্য, পোপের কবিতা (যেমন 'January and May') বার্ন্‌স্‌ ও গোল্ডস্মিথের কবিতা, রোম্যাণ্টিকদের কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি তৎকালীন পঠিত সাহিত্য এবং তার সঙ্গে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের যে অংশে নারীর বর্ণনা আছে সেগুলি কবিকে যে প্রবুদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই পড়াশোনার কিছুটা আভাস পাই 'মহিলা' কাব্যের 'অবতরণিকা' অংশের কবির স্বকৃত টিপ্পনী থেকে (দ্রষ্টব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'মহিলা'র সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৫৭ : পৃ. ১৯৯-২০৩)। দুঃখের বিষয়, এই টিপ্পনী অসমাপ্ত। এটি সমাপ্ত হলে 'মহিলা' কাব্য রচনার পিছনকার দেশী ও বিদেশী সাংস্কৃতিক পটভূমি সম্পর্কে কবির বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেতো। যাই হোক, যেটুকু পাওয়া গেছে তাতে দেখছি, মঙ্গো পার্কের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে (Park's Travels), নারীর দয়াসূচক অনেকগুলি ঘটনা কাব্যের 'অবতরণিকা' অংশের অনেক সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করেছে। এছাড়া 'অবতরণিকা' অংশের একটি স্তবকের ('শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে' ইত্যাদি) টীকায় আরবীয় শাস্ত্র, ভারতীয় শাস্ত্র এবং হিব্রু ও খৃষ্টান শাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তার পরে কবি সংস্কৃত কবির

উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ক্যাম্পবেলের কবিতা থেকে একটি পংক্তি উদ্ধার করেছেন : 'And man the hermit sighed till woman smiled'। বেশ বোঝা যায়, ক্যাম্পবেলের এই পংক্তির ভাবনাসূত্রে সুরেন্দ্রনাথ উল্লিখিত স্তবকটি রচনা করেছেন।

সমগ্র 'মহিলা' কাব্যের পরিকল্পনাটি কিন্তু রোম্যান্টিক কাব্যের মতো অনুভূতি--নির্ভর অনুষঙ্গ-গ্রথিত নয়, রোমান্টিক-পূর্ব অগাস্টান কিংবা মেটাফিজিক্যাল কাব্যের মতো যুক্তি-শৃঙ্খলে গাঁথা। সমাজে নারীর প্রয়োজনীয়তা ও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশকে নানা তথ্য দিয়ে কবি যুক্তিবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবি নিজেই কাব্যের 'ভগ্নী' অংশের (অসমাপ্ত) দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন :

'তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।'

রোম্যান্টিক-পূর্ব যুগের কাব্যচর্চায় কবি নিজেকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে চেয়েছেন মনে হয় এবং তাই যুক্তির সাহায্যে নারী-সমাজের ক্ষেত্রে অভিপ্রেত 'সত্যের সংসার'কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাব্যরীতির দিক থেকে সুরেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট, কিন্তু অবহেলিত। সেই উচ্ছ্বাসের যুগে সুরেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির সংযম তেমন আমল পায় নি। কিন্তু 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করেছেন, এবং কোন সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই কবির রচনারীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সে যুগে রোম্যান্টিক ভাবনার এমন বিশুদ্ধ সংযত। সংযত হওয়ার কারণ তাঁর সংস্কৃত চর্চা এবং রোমান্টিক-পূর্ব অগাস্টান কাব্য-চর্চার প্রতি টান। বিশেষ করে তাঁর পোপ-চর্চা স্মরণীয়] প্রকাশ বাঙলা কাব্যে তাঁর সমকালে আর দেখা যায় নি। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে তা সহজেই ধরা পড়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের এই ধরণের স্তবক :

'প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীর-শঙ্কায়,
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্ত শিখা প্রকম্পিত তার,—
জেন আমি রাগ ভরে,
বসিয়া সে শিখা 'পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার !!
নিবিলে জানিবে, খেলা কৌতুক আমার !! 'মহিলা' [জায়া, ২০৮]

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালির যুগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুরেন্দ্রনাথের গাঢবন্ধ শব্দবিন্যাস, বিশিষ্টকলামাত্রিক ছন্দে সেই বিন্যাসের সংহত ধ্বনিস্পন্দন, স্তবকের পূর্ব-কল্পিত নিরেট কঠিন কাঠামো রবীন্দ্রনাথের ওই যুগেই দেখা গিয়েছিল। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র-যুগের উদ্দীপনাকে পুনরাবৃত্তি ও অতি-কথনে প্রকাশ করে যুগের কবি রূপে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যুগেই যদি একটু সুস্থির হয়ে তাঁরা সুরেন্দ্রনাথের মতো কাব্য-কলার দিকে নজর দিতেন তাহলে তাঁরা যুগের কবি না হোন, সৎকবি হতেন। তাঁর গাঢবন্ধ স্পন্দিত ছন্দের নিদর্শন স্বরূপ একটি স্তবক উদ্ধৃত হতে পারে:

'তরুপত্র-প্রান্তভাগে লম্বিত নীহার,
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত
সুচিত্রিত চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার,
উড্ডীন পাখীর কলগীত,
সন্ধ্যার বঙ্কিম ঘটা,
পতিত তারার ছটা,
সরোজল হিল্লোল নর্তন—
এ হতে ভঙ্গুর রম্য মানবজীবন। 'বর্ষাবর্তন।'

১। সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সুরেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর [বসুমতী সংস্করণ] ভূমিকা থেকে গৃহীত হয়েছে। ভূমিকাটি সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক লিখিত। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র সুরেন্দ্রনাথের জীবনীতেও এই রচনাটি উদ্ধার করা হয়েছে।

২। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের ভূমিকাটিতে সুরেন্দ্রনাথের এই চিঠিগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে।

৩। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী: সুরেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। বসুমতী সংস্করণ

৪। ঐ।

নয়

দেবেন্দ্রনাথ সেন

রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)। ১৮৮০ থেকে ১৯১৩ এই দীর্ঘ তেত্রিশ বছরে তিনি বাঙলা কাব্যে একটি স্বকীয় রীতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাঙলা দেশের বাইরে যুক্তপ্রদেশের গাজিপুরে তাঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করার পর প্রায় বারো বছর বাদে শিক্ষকতা করতে করতে তিনি ইংরিজি সাহিত্যে অনার্স পাশ করেন। এর আরও সাত বছর বাদে ইংরিজিতে এম.এ. পাশ করেন। ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিলেন তিনি।

বিহারীলাল বাঙলা কাব্যে যে ego-কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের কবি-ব্যক্তিত্ব সেই ধারাতেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিহারীলাল সংসারের সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠে স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিলেন, কাজেই সে স্বাতন্ত্র্যকে বলতে পারি 'বস্তুজয়ী'। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথে পারিপার্শ্বিকের বিচার নেই। 'বাহিরকে অন্তরের সুন্দর স্বপ্নে বঞ্চিত করিয়া তিনি দেশ ও কালের সমস্যার দিকটা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।'[১] কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধার করেছেন:[২]

> 'দেখুন আমি পুরাতন স্কুলের—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি এই রবীন্দ্র-যুগে আমাদের ন্যায় কবির আদর হওয়াই শক্ত। আমার কিন্তু সময় সময় রবীন্দ্রীয় ছন্দে কবিতা লিখিতে ইচ্ছা হয়। সে যাহাই হউক, মাইকেলই আমার গুরু। ইংরাজী কবিদের মধ্যে Wordsworth-কে আমি বড় পছন্দ করি। সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবও আমার কবিতায় বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন। আমি ইংরাজীতে এম. এ. পাশ করিয়া আবার সংস্কৃতে পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই, ফলে কিন্তু আমার সংস্কৃত সাহিত্যটা পড়া হইয়া গেল'।[৩]

দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোহিতলাল বলেছিলেন:

> 'দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবকবি, তিনি যে আর্ট জানিতেন না তাহা নহে, দেশী ও বিদেশী উৎকৃষ্ট সাহিত্য রসে তিনি প্রবীণ ছিলেন। এজন্য

তাঁহাকে বাংলার পল্লীকবিদের মত স্বাভাবিক বলিলে ভুল হইবে। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যই এই যে, তিনি স্বাভাবিক ভাবাবেগে আর্টের সংযম অভ্যাস করেন নাই, তাঁর প্রকৃতিই আর্টবিরোধী, অথচ এই প্রকৃতির পূর্ণ শক্তি বলে তিনি এমন সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন যাহা আর্ট হিসাবে নিখুঁত।'

প্রথম জীবনে মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ফুলবালা' (১২৮৭) ও উর্মিলা কাব্য' (১২৮৭)। 'ফুলবালা' কাব্যে গোলাপ, কদম, রক্তজবা, কৃষ্ণকলি, মল্লিকা, কেতকী, অপরাজিতা ইত্যাদি ফুলের বন্দনা। ইতিপূর্বে বাঙলা কাব্যে এতগুলি ফুলের সঙ্কলন কেউ করেন নি, এতগুলি ফুলের সমারোহের মধ্য দিয়ে রোম্যান্টিক সৌন্দর্য পিপাসা ব্যক্ত হয় নি কোথাও। বিহারীলালও সাধনা করেছিলেন সৌন্দর্যের, তাতে অদ্ভুতত্ব ও বিস্ময় ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনায় দৃষ্টি ও হৃদয়ের পরিতৃপ্তির মাধ্যমে পঞ্চেন্দ্রিয়ের উল্লাস দেখা গেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর ভালো লাগতো। অন্যান্য বাঙালী কবিদের মতো 'প্রকৃতির সাথে হয় কবিচিত্ত বিনিময়ে'র শিক্ষাটি তাঁর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং শেলির কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর ড্যাফোডিল বন্দনায় রূপ-পিপাসা চরিতার্থ করেন নি, বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বেশী। খুব সম্ভব কীট্‌সের ইন্দ্রিয় চেতনাই দেবেন্দ্রনাথকে শিক্ষিত করেছিল এবং তার সঙ্গে নিজস্ব বৈষ্ণব ভক্তির আবেগে ও হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তিনি কীট্‌স থেকে পৃথক হয়েও পড়েছিলেন। উর্মিলা কাব্য স্বভাবতই নবজাগ্রত নারী-মর্যাদা বোধের প্রেরণাতেই লেখা। এ কাব্যের নামপত্রে উদ্ধৃত কবিতাংশটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

Those are great maxims, sir, it is confess'd ,
Too stately for a woman's narrow breast
Poor love is lost in men's capacious minds ,
In ours, it fills up all the room it finds. *John Crown*

পরবর্তী কাব্য 'নির্ঝরিণী' (১২৮৭) কয়েকটি গীতি কবিতার সঙ্কলন। এর মধ্যে 'কল্পনা' কবিতাটি কীট্‌সের Ode to Fancy-র অনুসরণ, 'ময়না' কবিতাটি এডগার এলান পো-র Raven-এর অনুসরণে লেখা, 'ঈশ্বরের প্রতি' কবিতাটি টমাস মুরের অনুবাদ, 'আঁখির মিলন' কবিতাটির মধ্যে শেলির Love's Philosophy কাজ করেছে :

'প্রকৃতির সাথে হয় কবিচিত্ত বিনিময়
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন
ওই আঁখির মিলন।'

১৩০৭ খৃষ্টাব্দে 'অশোকগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনাব বিভিন্ন স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। মোহিতলাল এই স্তর-গুলিকে বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। প্রথম স্তরে সৌন্দর্য-সাধনা, দ্বিতীয় স্তরে সৌন্দর্য-সাধনার সঙ্গে হৃদয়ের বিস্তার, তৃতীয় স্তরে প্রীতির সঙ্গে এই সৌন্দর্য-দৃষ্টির মিলন, চতুর্থ স্তরে সৌন্দর্য-দৃষ্টি খর্ব করে প্রীতি আধিপত্য লাভ করেছে এবং ক্রমে প্রীতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য এই স্তর-বিভাগ কাব্য সৃষ্টিব কালানুযায়ী হয়। কোন সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দৃষ্টি যা রোম্যান্টিকদেরই প্রেরণায় পরিণত তা-ই দেবেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট কবেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সহজ অথচ প্রবল ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং গার্হস্থ্য দৃষ্টি [যাকে প্রীতি ও ভক্তির মিশ্র ফলশ্রুতি বলতে পারি]। তাঁকে রবীন্দ্র-কল্পনা থেকে স্বতন্ত্র পথে নিয়ে গেছে। এই প্রবল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উদ্রেক আমরা তাঁব কাব্যেই প্রথম দেখলাম। গার্হস্থ্যরস ইতিপূর্বে মাইকেলের মধ্যে, নবীনচন্দ্রের মধ্যে, এমনকি বিহারীলালের মধ্যেও দেখেছি। ইন্দ্রিয়ানুভূতি উদ্রেক করবাব শিক্ষা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন তা আগেই বলেছি। উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট কবছি। এই কাব্যেব মধ্যে 'লক্ষ্ণৌ আতা' নামে একটি কবিতা আছে:

"চাহিনা আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজসুন্দবীর।
চাহি নাক 'সেউ'—যেন বিরহ বিধুর
জানকীর চির পাণ্ডু বদন রুচির।
একটুকু রসে ভরা, চাহিনা আঙ্গুর
সলজ্জ চুম্বন যেন নববধূটির!
চাহিনা গন্নাব স্বাদ! কঠিনে মধুব
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ় দম্পতীর!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া
চঞ্চলা বেগম কোন হয়ে উল্লাসিতা

ভাজিত, সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি
যেত মরি রসিকার রসনা-উপরি!"

এমন ইন্দ্রিয়ানুভূতির উদ্রেকের উদাহরণ আমরা বিশেষ করে কীট্‌সের মধ্যেই পেয়েছি। তাঁর 'The Eve of St Agnes'-থেকে একটি স্তবক উদ্ধার করছি:

And still she slept an azure-lidded sleep,
In blanched linen, smooth, and lavender'd,
While he from forth the closet brought a heap
Of candied apple, quince, and plum, and gourd :
With jellies soother than the creamy curd,
And lucent syrops, tinct with cinnamon ,
Manna and dates, in argosy transferr'd
From Fez ; and spiced dainties, every one,
From silken Samarcand to Cedar'd Lebanon

L. 272-270.

কীট্‌সের মতো প্রতিটি শব্দে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভার হয়তো দেবেন্দ্রনাথ আনতে পারেন নি, কীট্‌সের মতো তীক্ষ্ণ, পরিমিত, সজাগ গাঢবদ্ধতাও দেবেন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরিণত ফলের এক একটি উপমা এক একটি ফলকে চোখের সামনে এনে দিয়েছে এবং শেষে অভিপ্রেত আতার রস-পরিণতি, ফাটবার পূর্বেকার নিহিত চাঞ্চল্য ও উল্লাস [যা ইঙ্গিতে বেগমের স্বভাবে আরোপিত হয়েছে] এবং ফাটবার পরেকার রস-উৎসার শব্দ-প্রয়োগেই অনেকটা ব্যক্ত। এবং ব্রজসুন্দরীর উল্লেখ থাকলেও এই ক্ষেত্রে কবির ইন্দ্রিয়-পিপাসা বিশুদ্ধ, বৈষ্ণবভক্তিশূন্য।

অন্যদিকে এই সৌন্দর্যদৃষ্টি সহজ প্রীতির রসে খর্ব হয়েছে, প্রেমের পিপাসার বদলে 'প্রেম-রূপ ভাবের প্রতিই প্রীতি' জন্মেছে কবির। 'আঁখির মিলন' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ ভাবে প্রীতি ও ভক্তির মিশ্রণে কবির রূপ-পিপাসা খর্ব হয়েছে। যেমন, 'খোঁপা খোলা', 'নিরলঙ্কারা মা', 'বিধবার আরতি', 'দাও দাও' ইত্যাদি কবিতা। যে কবি প্রকৃতির সঙ্গে রোম্যান্টিকদের মতো আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বলতে পেরেছিলেন: 'দ্রৌপদীর শাড়ি

সম সচন্দ্রযামিনী' কিংবা 'নাচিল শরত-শশী রূপহ্রদে হিল্লোলে, হিল্লোলে, তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার' তিনিই 'নারী-মঙ্গল' লিখলেন। রোম্যান্টিকদের যে স্বভাবকে তিনি আপন প্রবণতা অনুযায়ী আয়ত্ত করেছিলেন সে স্বভাবকে তাঁর কবি চরিত্রের মূল স্বভাব করতে পারলেন না। তাঁর কবি-চরিত্রে শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব ভক্ত-রসিকের প্রবণতা স্থান অধিকার করে বসলো। পরবর্তী কাব্য 'হরি মঙ্গল' (১৩১১) তার কিছু আভাস বয়ে আনলো। এ কাব্যে নিরহঙ্কার বৈষ্ণব সাধনার কথা তো আছেই, একটি শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রও আছে।

১৩১৯ সালে 'শেফালী গুচ্ছ' প্রকাশিত হয়। 'ফুলবালা'র অনেকগুলি কবিতা এবং 'হরিমঙ্গলে'র একটি কবিতা এতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'পারিজাত-গুচ্ছ' (১৩১৯) কাব্যেও পূর্ববর্তী কাব্যগুলির অনেক কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অপূর্ব শিশুমঙ্গল, জগদ্ধাত্রী মঙ্গল, কার্ত্তিক মঙ্গল, গণেশ মঙ্গল, খৃষ্ট মঙ্গল ইত্যাদি এবং পূর্বেকার হরিমঙ্গলের নাম করণে 'সারদামঙ্গলে'র অনুসরণ। 'হরি মঙ্গল' ছাড়া বাকি সবগুলিই ১৩১৯-এ প্রকাশিত। ওই সালেই প্রকাশিত 'অপূর্ব নৈবেদ্য' রবীন্দ্রনাথের অনুসরণের পরিচায়ক, 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনায়' মাইকেলের অনুসরণ। এছাড়া ১৩১৯ সালেই প্রকাশিত 'গোলাপগুচ্ছ' কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় হরি, শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ইত্যাদি নামের মঙ্গল-কাব্য থেকেই কবির বৈষ্ণব-প্রবণতা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি পরানুসরণের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব প্রবণতা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'শেফালীগুচ্ছে' সংকলিত 'অপূর্ব মেঘদূত' কাব্যে দেখছি, রাধা মেঘকে দূত করেছেন, 'গোলাপগুচ্ছের' 'কদম্বসুন্দরী' রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী'র বৈষ্ণব সংস্করণ। এই বৈষ্ণব প্রবণতাই তাঁর ইন্দ্রিয় চেতনাকে খর্ব করেছে মাঝে মাঝে। এর আরও একটি প্রমাণ হলো এই, যে ডারউইনের তত্ত্বকে হেমচন্দ্র কোথাও কোথাও কাব্যরূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা'য় যে তত্ত্ব ইন্দ্রিয়-নির্ভর এক অপূর্ব বিস্ময়রসে প্রকাশিত, সে তত্ত্ব বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে দেবেন্দ্রনাথের 'দ্রৌপদী' কবিতায়। 'ঊর্মিলা' কাব্যের প্রসঙ্গে নারীর প্রতি যে নবজাগ্রত সম্ভ্রমবোধের কথা বলেছি তাই মধুসূদনের মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' ও 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা'য়।

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে বিদেশী সাহিত্যের চরিত্র ও বস্তুর ইতস্তত বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বিহারীলালের মধ্যেও অল্প কয়েকটির উল্লেখ ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। দেবেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধার করছি :

১। 'হে রবীন্দ্র তোমার ও সুন্দর সনেট
কি সরস! নারিঙ্গীর সুরভি সমীরে
মুক্ত বাতায়নে বসি' ক্ষুদ্র জুলিয়েট
ফেলিছে বিরহ-শ্বাস যেন গো সুধীরে!'

'রবীন্দ্রবাবুর সনেট'।

২। ইহারি পরশ পেয়ে ত্রিভঙ্গের শ্যাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী।
হে কবি, ইহারি বলে হেরিয়াছে বঙ্গঘরে
ডেসি-লেসি-ড্যাফোডিল্-কুসুম-লান্ছন
বঙ্গনারী-পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন। 'পরশমণি'।

রচনা রীতির দিক থেকে দেবেন্দ্রনাথ কখনো মাইকেলকে, কখনো বিহারী-লালকে এবং কখনো নিজেকে পুরাতন স্কুলের কবি বললেও রবীন্দ্রনাথকে অনু-সরণ করেছেন। মাইকেল-প্রবর্তিত নব্য রীতির প্রবহমান পয়ারছন্দকেই দেবেন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছিলেন। মাইকেল-হেমচন্দ্রের মতোই তিনি প্রবহ-মান পয়ার ছাড়া যতিপ্রান্তিক দ্বিপদী, ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দবন্ধ বেশি ব্যবহার করেছেন। এবং সংস্কৃত ছন্দের যে প্রয়োগ-পরীক্ষা হেমচন্দ্র করেছিলেন তারই অনুসরণ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ মেঘদূতের অনুবাদে ও স্তোত্র রচনায়। বিংশ শতকে এসে দেবেন্দ্রনাথ রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক উচ্চারণে রবীন্দ্র-আদর্শে বিশুদ্ধ সরল কলামাত্রিক রীতিতেও কবিতা লিখেছেন। বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির কিছু সনেটে এবং মিত্রাক্ষর পদবন্ধ রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব রয়েছে।

বিদেশী রীতিতে মাইকেল যেমন প্যারেন্থিসিস্ ব্যবহার করেছেন তা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাই। যেমন:

১। পাঠ করি সাধ যায়, আলিঙ্গিয়া সুখে
প্রিয়ারে, বাসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে।

'রবীন্দ্রবাবুর সনেট'।

২। আমি দিব! কাজ নাই-পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড়!) খুলিবে কবরী!

'লাজভাঙান'।

৩। উর আসি (জানি তব অনন্ত করুণা)
উর আসি এ দাসের চিত্ত পদ্মাসনে। 'দশানন-বধ'।

কাব্যশিল্পে দেবেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন রবীন্দ্র-সুলভ ভাব ও বস্তুর সঙ্গমে অপূর্ব উপমা ব্যবহার করেছেন, তেমনি অনেক সময়েই কর্কশ শব্দ-প্রয়োগের ফলে রসহানি ঘটিয়েছেন। এ দোষ বিহারীলাল থেকেই তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় এই দোষগুণ বিচার করলে আমরা উপলব্ধি করতে পাবি, কতখানি শ্রুতি, দৃষ্টি ও কল্পনাব বিশুদ্ধতা রক্ষা করে রবীন্দ্রনাথকে রোম্যান্টিক কাব্যেব ভাষাশিল্প বচনা কবতে হয়েছিল। কিছু শ্রুতিকটুতার উদাহরণ দিচ্ছি :

১। বিহাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগেব কচিপাখা।

২। প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, পুরুষ চেতাযে!

৩। ফোলো ফোলো ওষ্ঠ দুটি।

৪। কম্বল সম্বল হাবা দরবেশ।

৫। হেবি ও মোহন ভেল্ ভুলে গেচি বুদ্ধি খেল্
মলিন তাবার ভাতি চাঁদনি নিশায়ে!

বোম্যান্টিক ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণও একেবারে দুর্লভ নয়। অবশ্যই এ ভাষা অনিবার্যভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবে স্পৃষ্ট :

১। উছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ।

২। উধাও অস্থির তব নারী মূর্তি বাজে।

৩। উষাব মেদুর বায় হয়ে গেল ভরপুর।

৪। অন্ধকার একবাশ নিবিড এ কেশপাশ করি তথা চরণ চুম্বন।

৫। আছে কি তমালশিবে, উদাসী কালিন্দী তীবে
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে।

৬। যৌবনে মালঞ্চে কান্তির বিকাশ।

দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক চেতনার ভাষা সৃষ্টি হওয়াতে রবীন্দ্রযুগের বাঙলা কাব্যের গতিবিধি বেশ বুঝতে পারা গেল।

দেবেন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্যে একজন উল্লেখযোগ্য সনেটকার। মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথের সনেট রচনাব আদর্শেই তিনি সনেট লিখতে আরম্ভ করেন। প্রায় দেড়শো সনেট তিনি লিখেছেন। সনেটের আদর্শ হিসাবে তিনি পেত্রার্কের আদর্শ কোথাও গ্রহণ করেন নি। কখনও বিশুদ্ধ শেক্‌সপিয়রীয় রীতি, কখনও আংশিক শেক্‌সপিয়রীয় রীতির অনুসরণ, কখনও বা অংশত মিল্টনের অনুসরণ করেছেন। শেক্‌সপিয়ারের আদর্শে তিনটি চতুষ্পক্তিক স্তবকের শেষে একটি

দ্বিপংক্তিক মিলবন্ধে তিনি অধিকাংশ সনেট রচনা করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র শেক্‌স্‌পিরীয় মিলের আদর্শ তাঁর চোখের সামনে ছিল। অনেকগুলি সনেটে মিল্টনের অনুসরণে অষ্টক-ষট্‌ক ভাগ রাখেন নি [যেমন অশোকগুচ্ছের 'মা' কবিতা]। মাইকেলের মতো দেবেন্দ্রনাথ sonnet-sequence-ও রচনা করেছিলেন। তাছাড়া অল্প কয়েকটি সনেটে মহাপয়ার পংক্তি ব্যবহার করেছেন [যেমন অশোকগুচ্ছের 'রাক্ষসী']। এদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথের সনেটগুলিকে রোম্যান্টিক সনেট বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের মতো দেবেন্দ্রনাথের বেশির ভাগ সনেটেই একমাত্র চতুর্দশ পংক্তির বন্ধন ছাড়া সনেটের আর কোন বন্ধন নেই।

সনেট ছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'র ছন্দে (৮।১০।১০ পর্বভাগে) দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'অপূর্ব কবিতা', আর রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেই বিশুদ্ধ সরল কলা-মাত্রিক রীতি অবলম্বন করেছিলেন 'হরি মঙ্গল' কাব্যের 'যাচ্‌ঞা' কবিতায়। কিন্তু স্তবক রচনার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ তেমন কৌশল দেখাতে পারেননি। মিলও ভাল দিতে পারতেন না। অনেক সময় অবশ্য ভাষার সঙ্গীতে ভালো মিলের অভাব পূরণ হয়ে গেছে। শেষ বয়সের রচনায় কিছু কিছু ভালো মিলের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গোলাপগুচ্ছ (১৩১১) থেকে একটি কবিতাংশ উদ্ধার করছি :

> 'মাধবের মন্ত্রসিদ্ধ মোহন মুরলী
> ধ্বনিল রাধার চিত্ত নিকুঞ্জ মোহনে ,—
> অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
> শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী যমুনা সদনে।
> গেল রাধা তবে ওই মন্থর গমনে
> মঞ্জুল বকুল কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?
> আকুল দুকূল , ম্লান কুন্তল, কাঁচলি ,
> ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে।' 'অদ্ভুত অভিসার'

১। আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার : ১৩৪৩। 'দেবেন্দ্রনাথ সেন' দ্রষ্টব্য।

২। দেবেন্দ্রনাথ সেন : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য-সাধক চরিতমালা।

৩। আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার : ১৩৪৩। 'দেবেন্দ্রনাথ সেন 'দ্রষ্টব্য।

দশ

অক্ষয়কুমার বড়াল

দেবেন্দ্রনাথ সেনের পর রবীন্দ্র-সমসাময়িক যুগে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবি অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)। কলকাতায় তাঁর জন্ম। হেয়ার স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। লেখাপড়ায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল, কাজেই স্কুলের লেখাপড়ায় বেশিদূর না এগোলেও দেশী-বিদেশী নানা সাহিত্যে তিনি দেবেন্দ্রনাথের মতোই প্রবীণ ছিলেন। ছাত্রজীবনে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই সময় বিহারীলালের কাছে বাঙলা দেশের নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরীর মতো, তরুণ অক্ষয় বড়ালও সে গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের মতো অক্ষয়কুমার বিহারীলালের কাব্যশিষ্য ছিলেন।

যুগপ্রভাবে অক্ষয়কুমারের প্রতিভা কী ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সে সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন[১] :

> 'গীতিকাব্য সাধনাতেও বাঙ্গালী সন্তানের পক্ষে যাহা সহজ ও স্বাভাবিক গৃহসংসারের নানা রকম সরল মধুর প্রীতি ও প্রেমের সম্বন্ধ, পারিবারিক ও সামাজিক নানা অভিজ্ঞতার কাব্যরস অথবা ভাবের অতলে আত্ম-বিস্মৃতির আনন্দ, এ সকলকে উপেক্ষা করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী গীতি কবিদিগের দুর্ধর্ষ কেন্দ্রাতিগ কল্পনা, বাস্তববিদ্রোহী অবাস্তব কামনা, আত্মপ্রতিষ্ঠায় দুরারোহী আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত এই বাঙ্গালী কবি কাব্য-সাধনায় কি পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই আলোচনা অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক।'

অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতার বই 'প্রদীপ' (১২৯০, ১৮৮৩)। প্রথম ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে তরুণ কবি অপার সৌন্দর্যের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির অবিরাম গতিরহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং নারী-সৌন্দর্যে সৃষ্টির চরিতার্থতা লক্ষ্য করেছেন। এর এক বছর আগেই 'প্রভাত সঙ্গীতে'র কবি রবীন্দ্রনাথ হৃদয় খুলে রোম্যান্টিক বিস্ময়ের আলো নিয়েছেন। তবে তার মধ্যে তখনো নারী এতটা প্রাধান্য পায় নি। 'বঙ্গসুন্দরী'র কবি বিহারীলালকে গুরু হিসাবে মেনে নিয়েই অক্ষয়কুমার অপেক্ষাকৃত

ধীরতার সঙ্গে 'প্রদীপ' কাব্যের 'নারী বন্দনা' লিখেছিলেন। অক্ষয়কুমারের মানসী প্রতিমা ঠিক দ্বন্দ্বসংশয়ের সমন্বয়রূপিণী সারদার অনুসরণ করেনি। মোহিতলালের ভাষায়[২] 'বিহারীলালের সারদার একটী দিক—বিশ্বের অন্তঃপুরে তাহার সেই রহস্যময়ী মূর্তি শেলীর কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল কবির অবাস্তব রূপপিপাসার ইন্ধন যোগাইয়াছে।' তবে শেলির মতো তাঁর মানসী প্রতিমা খুব বেশি পার্থিবতাবর্জিত নয়, তাতে বাস্তবের ক্ষুধা আছে। সে ক্ষুধা ধীরে ধীরে পরবর্তী কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। আপাতত তাঁর মানসী প্রতিমার স্বরূপটি যে শেলির অনুসরণ তা দেখা যাক। 'নারী বন্দনা' কবিতায় তিনি বলেছেন :

'রমণীরে, সৌন্দর্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা জড়িত প্রকৃতি সনে,—
দেবপ্রাণ বেদগানে সাধা।
সৌন্দর্যের মেরুদণ্ড তুমি
বিশ্বের শৃঙ্খলা তোমা 'পরে।
তপনের আকর্ষণে ঘুরে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে, গেয়ে সমস্বরে।
তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
সান্ধ্য মেঘে স্বর্গের আভাস!
এ নির্মম জীবন সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখসাধ।'

শেলি বলেছেন[৩] :

'Sweet Benedictions in the eternal curse!
Veiled Glory of this lampless Universe!
Thou moon beyond the clouds! Thou living Form
Among the Dead! Thou star above the storm!

Thou Wonder, and thou Beauty, and thou Terror !
Thou Harmony of Nature's Art ! Thou mirror
In whom as in the splendour of the Sun,
All shapes look glorious which thou gazed on !'

দ্বিতীয় অংশে প্রেমের বিধ্বংসী রূপের আভাস। কবি দেহে-মনে প্রেমের জ্বালা অনুভব করে বলেছেন :

'রমণী তোমার তরে তোমার মতন হই
কোন সাধনায় ?
মুখে হাসি প্রেম কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা
মত্ত আপনায় !' 'প্রেমগীতি'

তৃতীয় অংশে কবি সহজ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রেমের স্বরটি। চতুর্থ অংশে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কবির মানসিক বিরোধ ও রোম্যান্টিক কবিসুলভ দৈবী অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ঈশ্বরের কাছে জীবনে-মরণে আশ্বাস চেয়ে কবি ভারতীয় ভঙ্গিতে রোম্যান্টিক পিপাসার চরিতার্থতা চেয়েছেন। শেষে আশ্বাস পেয়েছেন নিষ্কাম উদার প্রেমে। 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২, ১৮৮৫) কাব্যে এই প্রেম-ভাবনা কখনো দূরস্মৃতির সৌরভে মধুর, কখনো সম্ভাব্য মিলনের প্রতীক্ষায় অশ্রুসিক্ত, তখনো আত্মসমর্পণে নিশ্চিন্ত, কখনো হতাশায় ম্রিয়মাণ। শেলির একটি এবং ব্রাউনিঙের একটি কবিতাকেও বক্তব্যের সমগোত্রতার ফলে ভাবানুসরণে অনুবাদ করেছেন কবি এই কাব্যে[৪]। 'ভুল' কাব্যে (১২৯৪) কবির অতৃপ্ত পিপাসা শান্ত হয়ে গিয়েছে মানসী প্রতিমাকে নতুন বসরূপে দেখেছেন। কিন্তু মানসী প্রতিমার প্রেরণায় কবির এই আবেগের মূলে এক গভীর তাৎপর্য আছে : 'সুখ দুঃখ হলো শেষ, হলো শেষ কারে ঘুরে' ? ['শেষ']।

'অদৃষ্ট বালা' কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছেন :

'পরিত্যক্ত ভগ্ন ঘরে এ ঘর ও ঘর করে
কেহ কি, কি যেন তার না পেয়ে খুঁজিয়া,—
কখন কি কেঁদে ওঠে, দ্বারপানে নাহি ছুটে,
আপনার পদশব্দ কাহারে বুঝিয়া ?'

শেষ পর্যন্ত ব্রাউনিঙ্ যেমন সৃষ্টি কর্তা ভগবানের প্রতি একান্ত বিশ্বাসে বলেছেন :

……God above
Is great to grant, as mighty to make,
And creates the love to reward the love ;
I claim you still, for my own love's sake !

Evelyn Hope

তেমনি অক্ষয়কুমার ঈশ্বর বিশ্বাসেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলেন। 'প্রদীপ' কাব্যের 'জীবনে আশ্বাস দিয়ে মরণে বিশ্বাস দিযে 'যেমন গড়িয়া ছিলে পুন গ'ড়ে লাও।' ['কোথা তুমি']

এই উক্তি ইতিপূর্বে প্রকাশ পেযেছে। 'ভুল' কাব্যেও 'ডুবিছে তপন' কবিতায সেই আশ্বাসই আবার ফুটে উটেছে। কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি প্রয়োজন :

'ডুবেছে, তপন, আলোক জীবন
ধরণীর বুক ছাইছে আঁধার।
ফিরিছে পথিক, মলিন বয়ন,
জগতের কাজ নাহি যেন আর !
যে আলোক গেল, গেল একেবারে ?
রহিল না প্রেম, গেল কি সমূলে ?
ধীরে আসে বায়ু মুছে শ্রম ধারে,
যে ভুলে—যেন গো একেবারে ভুলে !
ডুবেছে তপন, প্রত্যক্ষের আলো ;
দলে দলে তারা ফুটিছে আবার।
কোটি চক্ষু মেলি ঘেরে চারি ধার,
সমষ্টির যেন ভগ্ন কণাজাল !
যে আছিল এক হ'লো শত শত
কণায় কণায় প্রেমের জগত। 'সন্ধ্যা'

'শঙ্খ' কাব্যের শেষের দিকের কিছু কবিতা অক্ষয়কুমার সাজিয়েছিলেন ব্রাউনিঙের অনুসরণে। ব্রাউনিঙের 'Pippa Passes : A Drama' কবিতাটি ওই রকম পাঁচটি ভাগে বিভক্ত : Introduction, Morning, Noon, Evening, Night। 'Luria : A tragedy' কবিতাটিও ওই রকম পাঁচ ভাগে

বিভক্ত : Morning, noon, After-noon, Evening, Night। 'শঙ্খ' কাব্যের তৃতীয় অংশের কবিতাগুলির ভাগ : প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে, সায়াহ্নে, প্রদোষে, নিশীথে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, 'প্রদীপে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাগুলির মধ্যে হৃদয়ের ক্রমবিকাশ দেখাবার জন্য কবি ব্রাউনিঙের বিন্যাস-নৈপুণ্যকেই অনুসরণ করেছিলেন। যাই হোক, প্রদীপের প্রেম-চিন্তারই অনুসরণ ক'রে এই কাব্যে কবি বলেছেন :

'এস, প্রিয়া, প্রাণাধিকা,
জীবন-হোমাগ্নি শিখা!
দিবসের পাপতাপ হোক হতমান্!
ওই প্রেমে প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে বাহুবন্ধে,
আবার জাগুক মনে, আমি যে মহান্,
একেশ্বর, অদ্বিতীয়, অনন্য প্রধান।' 'সন্ধ্যা'য়।

রোমান্টিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথ ধরেই কবি তাঁর প্রেম সাধনায় এগিয়েছিলেন। কিন্তু নর-নারীর বাস্তব সম্পর্কের ভিত্তিতেই সেই সাধনা গড়ে উঠেছিল, সংসারের প্রিয়ার মধ্যেই মানসী প্রতিমার সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি, এইখানেই তিনি শেলির কবিস্বরূপ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। এই মানসী প্রতিমার উদ্দেশ্যেই তিনি রোমান্টিক অভিসারে গেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করেছেন এবং সেই অনুভবের জন্যই গভীর বিশ্বাসে বলতে পেরেছেন :

'দাঁড়াও, অভেদ আত্মা! পরলোক বেলাভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যুর নিবিড় ধূমে।
জগতের বাধা বিঘ্ন জগতে পড়িয়া থাক,
নীরবে সৌন্দর্য মাঝে কবিত্ব ডুবিয়া থাক।
দেখেছি তোমার চোখে প্রেমের মরণ নাই,
বুঝেছি এ মরভূমে মত্ত ব্রহ্মানন্দ তাই।
তারকায় তারকায় হা হা ক'রে তোমা তরে
ছুটিতে না হয় যেন আবার মরণ 'পরে!
এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু যন্ত্রণার অবসান?
ধর এ জীবনাহুতি-বিরহের শেষ গান। 'নিশীথে'।

'এ মৃত্যু কি শেষ মৃত্যু যন্ত্রণার অবসান ?' এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন অক্ষয়কুমার তাঁর 'এষা' কাব্যে [১৩১৯]। কিন্তু কাব্যের প্রথমেই কবি যেন তাঁর পূর্ববর্তী কাব্য রচনার রোমান্টিক উর্ধ্বচারী কল্পনালীলাকে সংযত ক'রে বলেছেন :

'নহে কল্পনার লীলা-স্তবগনবক ,
বাস্তব জগৎ এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাববদ্ধ বাক্য রসাত্মক
মানবীর তরে কাঁদি, যাচিনা দেবতা।'

অর্থাৎ কল্পনা বিলাস না ক'রে, কবিত্বের ভান না করে এবার তিনি হৃদয়ের কথা বলেছেন। যাই হোক 'এষা' কাব্যটিকে কবি-পত্নীর ইন মেমরিয়াম বলতে পারি। কারণ পত্নীবিয়োগেই 'এষা' কাব্যের উৎপত্তি। অনেক সমালোচক কাব্যটিকে টেনিসনের In Memoriam-এর অনুসরণে লেখা বলে দাবী করেছেন। বিশেষ করে, বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি 'এষার' দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যের পরিচয় দান প্রসঙ্গে In Memoriam ও 'এষা'র একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। তার মধ্যে অনেক অত্যুক্তি আছে, তবে একথা ঠিক যে, In Memoriam এর প্রভাব 'এষা'তে আছে এবং সে প্রভাব অন্ধ অনুকরণ নয়। 'এষা'তে খৃষ্টান পরিবেশের কোন গন্ধ নেই, সাধারণভাবে মানুষের মনের একটি গভীর সমস্যাকে উপস্থাপিত করবার পদ্ধতিটি হয়তো অক্ষয়কুমার তাঁর সামনে রেখেছিলেন। আসলে টেনিসনের বিশ্বপ্রেমের পরিণতিতে, ব্রাউনিঙের ঈশ্বর বিশ্বাসে, আর হুগোর অনন্তের সিংহাসনবাসী প্রিয়ার ছবিতে অক্ষয়কুমার তাঁর পত্নী-বিয়োগ-ব্যথার কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। হুগোর যে পংক্তিগুলি তিনি কাব্যের প্রারম্ভে তুলেছিলেন, সেগুলি 'এষা'র কবির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলে উদ্ধারের অপেক্ষা রাখে :

'Whoe'er you be—send blessings to her—she
Was sister of my Soul immortal, free !
My pride, my hope, my shelter, my resource,
When green hoped not to grey to run its cource,
She was enthroned Virtue under heaven's dome,
My idol in the shrine of curtained home.

এরই অনুসরণে কাব্যের উপসংহারে তিনি বলছেন :

কতযুগ পরে—
এখনো কি মনে পড়ে
তোমার যে হাতে গড়া সোনার সংসার !
কবিত্ব কল্পনা ভরা— জীবন মরণ হরা—
ত্রিভুবন আলো করা প্রীতি দুজনার ! ..
তব বরাভয় করে –
ধর কর চিরতরে।
চলচল নিজগৃহে-দূর মেঘপার !
প্রিয়তমে প্রাণাধিকে—
কোথা তুমি কোন দিকে।
জীবনে মরণে আমি তোমার তোমার !

সমগ্র 'এষা' কাব্যটি উপসংহার, নিবেদন, মৃত্যু, অশৌচ, শোক, সান্ত্বনা, বন্ধু এই কটি অংশে বিভক্ত। যে ধরণের সন্দেহ, হতাশ্বাস ও বিরহের মধ্য দিয়ে হ্যালামকে কাছে পাবার চেষ্টা করেছেন টেনিসন ['To thee too comes the golden hour', 'we lose ourselves in light', 'Be near me when the light is low', 'an infant crying in the night, an infant crying for the light', 'His inner day can never die', 'His night of loss is always there', 'I felt and fell though left alone', 'His being working in mine'—ইত্যাদি উক্তিগুলি লক্ষণীয়], মৃত্যুর পরেকার আধ্যাত্মিক সঙ্গসুখের আকাঙ্ক্ষা করেছেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিক শোক যেমন আত্মচেতনার অবলুপ্তিতে বিশ্বচেতনায় পরিণতি পেয়েছে ['Sees himself in all he sees', 'Behold I dream of good, And mingle all the world with thee'] প্রেমের তেজে মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে, ক্ষণিক জীবনে শাশ্বত অমরতার জয়গানে মানুষের যে মহত্ত্ব নিহিত তা যেমন প্রমাণিত হয়েছে, অক্ষয়কুমারকে ক্রমান্বয়ে ঠিক তেমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা পেতে দেখেছি। নিম্নে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি লক্ষ্য করলে কবিচিত্তের মানসিক অবস্থার স্বরূপটি বুঝতে পারা যাবে :

ক। ধারা অতি অন্ধকার।

খ। রবি নিরুজ্জ্বল
আকাশের এক প্রান্তে করে টলমল।
সমস্ত আকাশ ভরি'
ছিন্নভিন্ন মেঘ পড়ি'
নিশীথে চরেছে শূন্য যেন সৈন্য দল।

গ। আবার আশায় করি ভর,
ঘরে বা তুলসীতলে
যদি তার দীপ জ্বলে,
যদি তার শুনি কণ্ঠস্বর।

ঘ। অচল অটল অন্ধকার।
অবিশ্বাস-সংশয় বিষম,
বিহ্বল হৃদয়।

চ। মরেছে তাহার দেহ,
মরেনি ত প্রেম স্নেহ—
রেখে যেন গেছে সমুদয়।—
সেই ক্ষুদ্র সুখ দুখ আশাতৃষা ভয়।

ছ। কোথা তুমি বিশ্বস্বামী—
কোথা ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি
কত তুচ্ছ সুখ দুঃখ জীবন মরণ।

জ। দেহ হতে আমি যাই বাহিরিয়া,
সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি প্রিয়া,
লয়ে চির অনুরাগ ?

ঝ। আজি মোর প্রিয়তমা
তব করে বিশ্বরমা,
ভাসিছে ইন্দিরা সম সৃষ্টি-নীলিমায়।

ঞ। সহি দুঃখ প্রেম-গরিমায়।

ট। দুরন্ত বাসনাবর্তে সতত ঘূর্ণন
নিরন্তর আত্মপূজা
তোমারে না যায় বুঝা
সৌভাগ্যে বিস্মৃতি ব্যক্ত, দুর্ভাগ্যে দূষণ।

মানব চঞ্চল মনে
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে,
বুঝিতে না দেয় তুমি কত যে আপন।

ঠ। তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা নয়।

এই ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বিপিনচন্দ্র পালের অত্যুক্তির মধ্যে অন্ততঃ এইটুকু সত্য আছে যে, 'দু-একস্থলে কোন কোন শব্দের অনুবাদ সত্ত্বেও কিছুতেই অক্ষয়কুমারের কবিতাটিকে টেনিসনের অনুকরণ বলা যায় না—ইহা ভাবের আংশিক ঐক্য। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায় হিন্দুর ভাবে হিন্দুর তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কবিতাটি লিখিয়াছেন। টেনিসন খৃষ্টীয়ানী ভাষায় খৃষ্টীয়ানী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কবিতা রচিয়াছেন।'[৫] অক্ষয়কুমারের সমগ্র কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রেও এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে আয়ত্ত করে তাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই দেখা যায়।

ইংরিজি কাব্যের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক আত্মকেন্দ্রিক কল্পনাকে কবি আয়ত্তে এনেছিলেন বলেই অক্ষয়কুমারের কাব্যের ভাব যতই বিদ্রোহাত্মক হোক, ভাষা সংযত ও নিয়মনিষ্ঠ। এই সচেতন লিরিক রচনা তাঁর ঈপ্সিত বলেই সমর্থনের জন্য 'ভুল' কাব্যের প্রারম্ভে গ্যেটের একটি উক্তি তিনি উদ্ধার করেছিলেন,

'All good lyrics must be reasonable as a whole,
and yet in details a little unreasonable'

যে রোম্যান্টিক কল্পনা তাঁর চিত্তকে উদ্বেল করেছিল সেই কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গার্হস্থ্যরসের কবি ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো কল্পনার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি।

ছন্দের ক্ষেত্রে মাইকেলের প্রবহমান পয়ার অক্ষয়কুমার গ্রহণ করেন নি। সাধারণ ভাবে বিশিষ্ট কলা মাত্রিক রীতিই গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে এই রীতির দীর্ঘ পদভাগের ছন্দই তিনি ব্যবহার করেছেন বেশি।

স্তবক গঠনের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন; মিলেও নতুনত্ব এনেছেন। একটি ত্রিপদী বন্ধের উদাহরণ দিই:

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি।

সর্বাঙ্গে প্রভাতরশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দিরশ্রেণী, স্বর্ণ কলস
ঝলসে কিরণে ;
বালকণ্ঠ সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ
চলিছে সময়,
ভ্রূভঙ্গে ফিরিছে সঙ্গে ক্রমব্যতিক্রম
উদয় বিলয়। 'মানব-বন্দনা'। প্রদীপ।

৮।৬।৬ এর ছ-টি ত্রিপদী-বন্ধে একটি বারো পংক্তির ত্রিপদী গড়ে উঠেছে। শব্দের সূক্ষ্ম অনুপ্রাস ও রুদ্ধ দলের স্পন্দন কবিতার ভাবগাম্ভীর্যকে প্রকাশ করেছে। যমক পয়ারের চতুষ্কের উদাহরণ :

এস বর্ষা, এস তুমি, নিদাঘের শেষ,
লয়ে এস অন্ধ নিশা ঘুচাও এ মৃত্যু ক্লেশ!
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ—কোথা প্রেম পুণ্যজল!
চারিদিকে মরীচিকা হাসিতেছে খলখল।
'নিদাঘে'। কনকাঞ্জলি।

কখখক পংক্তি মিলের স্তবকে ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করা যায়। অক্ষয়কুমারের মধ্যে সে উদাহরণও পাই :

ও কথায় কাজ নাই আর
আকাশে না দেখি ইন্দু
এখনি হৃদয়-সিন্ধু
কাঁদিবে করিয়া হাহাকার! 'ও কথা'। কনকাঞ্জলি।

কখকখ মিলের চতুষ্ক :

বনে বনে ফিরিতেছি পাখী আর গাহে না ;
নয়নে নাহি কি আর প্রণয়ের রাগ!
বনে বনে ফিরিতেছি, ফুল আর চাহে না ;
কপোলে নাহি কি আর চুম্বনের দাগ?
'প্রৌঢ়'। বিবিধ কবিতা ও গান।

ওমর খৈয়ামের অনুবাদে ও অনুকরণের ক্ষেত্রে চতুষ্কে ব্যবহৃত ফারসি রুবাই-এর মিল অক্ষয়কুমার ব্যবহার করে নতুনত্ব এনেছেন :

চাল তবে ঢাল সুরা, ঢাল হৃদি ভরি'
চরণ মঞ্জীর তব উঠুক গুঞ্জরি
প্রেয়সী, নিচোল কষি' হাসি হাসি' চাও—
প্রেম হোক বিশ্বব্যাপী আপনা বিস্মরি'। 'পান্থ', ৩০ বিবিধ।

সনেট রচনার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের পক্ষে ছন্দের বন্ধন বরণীয় হবার কথা। কিন্তু কোথাও তিনি পেত্রার্কের নিয়ম মেনেছেন, কোথাও মানেন নি। 'শঙ্খ' কাব্যের 'নিত্য কৃষ্ণ বসু' কিংবা 'সন্ধ্যায়' খাঁটি পেত্রার্কা-রীতিতে রচিত। কিন্তু অন্যত্র দেখতে পাই অষ্টকের মধ্যেই মিলের স্বাধীনতা এনেছেন কিংবা পেত্রার্কার রীতিতে আরম্ভ করে শেক্স্পিয়রের রীতিতে, মিত্রাক্ষর দ্বিপদীতে, শেষ করেছেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রপ্রভাবেই তিনি সনেট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

১। অক্ষয়কুমার বড়াল : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'; মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ২২, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৩।

২। অক্ষয়কুমার বড়াল : 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' : মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ২৪, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৪৩।

৩। Epipsychidion · 4th Stanza.

৪। 'আঁখি' কবিতাটি শেলির ভাবানুসরণ, 'গেছে' কবিতাটি ব্রাউনিঙের ভাবানুসরণ। এ ছাড়া 'শঙ্খ' কাব্যের 'আদর' কবিতাটির প্রতি শ্লোকের শেষাংশ ছড়ের কবিতা থেকে গৃহীত।

৫। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 'এষা' কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এগারো

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উনিশ শতকের নব জাগরণের সব কটি প্রধান লক্ষণ দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩—১৯১৩) মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙলা কাব্য চর্চায় বিদেশী শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে মননকে অগ্রাধিকার দিয়ে এবং বিশুদ্ধরুচি বিদেশী প্যারডির আদর্শে হাসির গান রচনা করে বাঙলা কাব্যের দিগন্তকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান বংশে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মেছিলেন। পিতা কার্তিকচন্দ্র রায় শুধু কৃষ্ণনগরের দেওয়ান হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না, চরিত্রের মহত্ত্বে, ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত ও আত্মজীবনচরিত রচয়িতা কার্তিকচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি নবযুগের মনীষীদের বন্ধুত্ব পেয়েছিলেন। বাঙলা, ফার্সি ও ইংরিজি তিনটি ভাষাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কার্তিকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্রলাল ও তৃতীয় পুত্র জ্ঞানেন্দ্র-লালের কাছেই দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরিজি সাহিত্যে পাঠ নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কে বলেছিলেন[১] :

> তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই আমাকে এমনি আশ্চর্য কৌশলে ও বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিলেন যে, সেই গোড়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই আমি অতি অনায়াসে নিতান্ত অসুস্থ শরীর লইয়া এবং তেমন মনোযোগের সহিত বেশী দিন অধ্যয়ন করিতে না পারিয়াও পরে, এম. এ. পরীক্ষায় তবু যা হোক একটু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ইংরিজি সাহিত্যে এম. এ. পড়েন। এম. এ.-তে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্টেট্‌স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান। সেখানে বিদেশী সঙ্গীত চর্চা করেছিলেন। ইয়োরোপীয় সঙ্গীত চর্চা পরবর্তী কালে গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়েই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'Lyrics of Ind' প্রকাশিত হয়।

ইংরিজি ভাষাতে লেখা হলেও এই কাব্যগ্রন্থটির সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কালের বাঙলা কবিতা ও গানের বিশেষ সম্পর্ক আছে। আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডেই দ্বিজেন্দ্রলালের আলাপ হয়। তাঁর সাক্ষ্য থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-চর্চার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়[২] :

'দ্বিজকে শেলী-ভক্ত আমিই করি। ফরাসী সাহিত্য তাহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। ক্রমে সে কিছু ফরাসী শিখিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে এই সময়েই তাহার অত্যন্ত অনুরাগের উদয় হয়।'

অবশ্য সাহিত্যের অনুরাগ ছোটবেলা থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল। বিলাত যাবার আগেই জাহাজে দেখছি[৩] :

'একদিন এক সাহেব আমাকে বলিলেন, তুমি যে কেবল পড়ই দেখিতেছি, গল্প কর না কেন? আমি জাহাজে শেলী (Shelley), কীট্স (Keats) পড়াতে আমার নাম কবি রাখিলেন এবং কার্লাইল (Carlyle) পড়াতে আমাব নাম স্কলাব (Scholar) রাখিলেন। আমাকে কেহ বিরক্ত করিতে আসিলে শেক্‌সপিয়র, বায়রণ বা শেলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। তাহাতে সকলেই রণে ভঙ্গ দিতেন।'

Lyrics of Ind-এর বিবরণ উপলক্ষ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল 'নাট্যমন্দির' নামক মাসিক পত্রে লিখেছিলেন[৪] :

"বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে, বিদ্যাভ্যাস কালে Manfred ও Childe Harold-এর দুই canto এবং মেঘদূত-উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাতে গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম ও তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare পড়িতাম। বিলাতে গিয়া ইংবাজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এড্‌উইন আনল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসহ কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন এবং সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে 'Lyrics of Ind' আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি।"

কিন্তু 'Lyrics of Ind' প্রকাশিত হবার আগেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'আর্যগাথা' [প্রথম ভাগ] প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি বলেছিলেন :

'প্রকৃতি-বিষয়িণী গীতি এদেশে তত প্রচলিত নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বোধ হয় ইহা নিন্দনীয় হইবে না। সঙ্গীতের কবিতা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়। প্রকৃতিমাধুর্যে উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তবে হৃদয়ের কবিতা বলিয়া গণ্য হইবে না কেন ?'

অবশ্য শুধু প্রকৃতি-গীতি এই কাব্য সংকলনে নেই। ঈশ্বব প্রকৃতি, আত্মানুভূতি ও দেশপ্রেম-চেতনার প্রকাশ এতে আছে। ঈশ্বর ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার মধ্যে কবি মানবলোক ও দেবলোকের সম্বন্ধ-সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে কবির দৃষ্টিতে প্রকৃতি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের আধাররূপে প্রকাশ পেয়েছে :

ক। কতবার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আঁখি,
তুলি নীলিমায় স্পন্দহীন রাখি,
ধরে না এ মনে ও বিস্তার তব ,
যোগ্য প্রতিনিধি তুমি বিধাতার ,
নিস্পন্দ নয়নে, ওই জ্যোতির্ময়ে,
নিশীথে রতনখচিত হৃদয়ে
নিরখি নিরখি স্তব্ধ হয়ে থাকি,
চাহি না হেরিতে ক্ষুদ্র বিশ্বে আর—।

'আকাশ'। সা. প. স. পৃ. ১।

খ। চাই না বিজ্ঞান, চাই না জ্যোতিষী,
জানিতে কি দ্রব্য এই রূপরাশি,
কেবল তারকে বড ভালবাসি
ও জ্যোতি আঁধারে।

'একটি নক্ষত্র'। সা প. স পৃ. ১১।

প্রাকৃতিক কবিতাতে যে বিষাদ ফুটেছে তাই আরও স্পষ্ট হয়েছে 'আর্যগাথা'র 'বিষাদোচ্ছ্বাস' অংশে। মনের রোম্যান্টিক প্রবণতা বা আকাঙ্ক্ষা আত্মানুভূতি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে স্পষ্ট। ইংরিজি রোম্যান্টিক কবিতা পড়ে সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার ফলেই যে এমন মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশী শিক্ষার ফলস্বরূপ ইতিহাসবোধ ও স্বদেশচেতনা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে অল্প বয়সেই যে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ 'আর্যগাথা' কাব্যের 'আর্যবীণা' অংশ। এই স্বদেশপ্রেমের গান দেশ সম্পর্কে এক অস্পষ্ট

ধ্যানের ফল। তখনও স্বদেশী আন্দোলনে বিশিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে অস্পষ্ট প্রেমস্বপ্নের দোষ-ত্রুটি ধরা পড়েনি। সেই জন্যই হেমচন্দ্রকে 'ভারত ভিক্ষা' রচনা ক'রে 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'-এর বন্দনায় পঞ্চমুখ হতে দেখেছি। দ্বিজেন্দ্রলালও গেয়েছেন :

গাও আর্যসুতচয়।
মিলিয়া গাওবে ব্রিটন মহিমা
ভাস রে হরষে ভারত হৃদয়।

যাই হোক, রোম্যান্টিক প্রবণতা ও দেশপ্রেম চেতনা—বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র—এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বেব ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল দেখা দিয়েছেন এই সময়। এবং তৎকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে বহু পঠিত বায়রন ও মুর উভয়েরই প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালেব 'আর্যগাথা'য় পাচ্ছি। সমুদ্রেব কবিতায় [সাগর—যাও রে কল্লোলি] বায়রনের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, আর্যবীণার দেশপ্রেমের গানেও মুরের আইরিশ মেলডিজের সুরের রেশ একেবারে মিলিয়ে যায়নি।

পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিদেশ যাত্রা ও সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে 'Lyrics of Ind'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইয়োরোপীয় ভাবনা-চিন্তাকে বাঙলা কাব্যে রূপ যে দেবার আদর্শ রেখেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই আদর্শেরই অনুরাগী হয়েছিলেন। তাই তিনি 'Lyrics of Ind'কাব্যে শ্বেতদ্বীপের কাব্যসরস্বতীর সঙ্গে শ্বেতভুজা ভারতীর একটি মিলনসূত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন। এই কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন :

> My principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian Poetics as they ought to be.

কবির এই উদ্দেশ্য যদিও একটি কাব্যেই সীমাবদ্ধ, পরবর্তীকালে কিন্তু বিলিতি গীতিসুর ও ইংরিজি সাহিত্যের ভাবনা-চিন্তাকে তিনি বাঙলা ছন্দে ও বাঙলা সঙ্গীতে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'আর্যগাথা'র [প্রথম ভাগ] অস্পষ্ট বিষাদোচ্ছ্বাস 'Lyrics of Ind'-এর মানসী প্রতিমাকে নির্ভর করে এক নতুন রসের সৃষ্টি করেছে।

'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। দশ বছর আগেকার 'আর্যগাথা'র কবি এখন যতটা প্রকৃতিপ্রেমিক তার চেয়েও বেশি মানবপ্রেমিক। এই দ্বিতীয় ভাগের কবিতার মূল প্রেরণা নারী-প্রেম, কবিপত্নী

সেই প্রেমের উৎস। এই প্রেরণায় কবি পেলব, সূক্ষ্ম, তন্দ্রাতুর লিরিক্যাল কবিতা রচনা করেছেন। 'প্রেমপ্রবাহিনী'র বিহারীলাল যেমন প্রিয়ার অন্বেষণে ঘুরেছিলেন, 'কল্পনা'র রবীন্দ্রনাথ যেমন 'শিপ্রা নদীর পারে' পূর্ব-জন্মের প্রথমা প্রিয়াকে খুঁজতে গিয়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও দেশ-বিদেশে সেই মানসী প্রতিমার পূর্বরূপ যেন দেখেছিলেন :

আগে যেন কোথা ভাল দেখছি তোমারে
কোথা বল দেখি ?
মর্মর প্রতিমা এক 'টাইবাব' ধারে
দেখেছিনু, সেকি তুমি !
অথবা সে—
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে
যবে তাহা সহসা-উদ্ভাসে
বিকশিত হয়েছিল কুমারী বয়ানে ?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-শকুন্তলা ফুলময় কথা
কালিদাস মুখে, মনে পড়ে।—সেকি তুমি ?

এই প্রথম দেশ-বিদেশেব শিল্প-সৌন্দর্যেব মিশ্র স্মৃতিতে বাঙালী কবির মানসী-প্রতিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। Tender is the night | And haply the Queen Moon is on her throne-এই কিট্‌সীয় ভঙ্গিতে দ্বিজেন্দ্রলাল রোম্যাণ্টিক পবিবেশ সৃষ্টি করে মানসী-প্রতিমাকে আহ্বান করলেন :

ঘুমায় সুরভি ফুলে, নিকুঞ্জে ঘুমায় গান,
ঘুমায় জগৎ পাশে চাঁদের অলস প্রাণ,
আয় লো স্বপন খানি
যামিনী বহিয়ে যায়,
অধরের মধুর হাসি
আয়—আয়—আয়।

'আর্যগাথা', দ্বিতীয় খণ্ড। সা. প. স. পৃ. ৮০।

এই সময় কবি প্রকৃতিকে প্রেমেরই অবলম্বন হিসাবে দেখেছেন, হৃদয়রাণী ছাড়া প্রকৃতির কোন সৌন্দর্যেই পরিপূর্ণতা চোখে পড়েনি তাঁর। কিন্তু এই

তন্ময়তা ও সূক্ষ্ম রূপের প্রতি আকর্ষণ বেশি দিন কবির মনে স্থায়ী হয় নি। কারণ নৈর্ব্যক্তিক রূপতন্ময়তাকে বারবারই ব্যক্তিমানবীর সান্নিধ্যের অনুভূতি এসে বাধা দিয়েছে। লিরিকের সুর-মূর্ছনা বরাবরই স্থূলচিন্তার অবলেপনে অন্তর্হিত হয়েছে এবং অনেক সময়েই গদ্যাত্মক ভাষা ইমেজগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে দেয়নি।

এই বইয়ের 'পিউ' নামক অংশে [কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত, 'কুহু' ও 'পিউ'] দ্বিজেন্দ্রলাল অতি প্রসিদ্ধ ইংরিজি, স্কচ ও আইরিশ সঙ্গীতের অনুবাদ করেছেন। ইংল্যাণ্ডে থাকবার সময় তিনি যে ইংরিজি, স্কচ, আইরিশ গানের প্রতি কত দূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা এই সময়ের কয়েকটি চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছে। স্কচদের জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন[৫] :

> 'স্কটল্যাণ্ডবাসী ইংলণ্ডবাসীকে ঘৃণা না করুক অন্ততঃ তাহাদের সহিত হরিহর আত্মা নয়। স্কট-কবি নিজের পাহাড়ময় দেশেরই গান করেন: 'The land of Lakes, the land of Lakes,' 'Auld lang Syne' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান ইংলণ্ডের মহিমাকীর্তন নহে।......স্কটল্যাণ্ড বীরের জননী। তাহাদের দেশও ক্রস ওয়ালেসের প্রসূতি। তাহাদেরও বিস্তৃত সাহিত্য আছে, তাহাদেরও স্কট, বার্ণস ও কার্লাইল আছে। স্কচ জাতির দেশপ্রেমিকতা গভীর অপরিমেয়। প্রতি গানেই তাহার স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান।'

অন্যত্র আয়ারল্যাণ্ড সম্পর্কে লিখেছেন :

> 'আয়ারল্যাণ্ড ডিউক অব ওয়েলিংটন, বার্ক ও মূরের জননী। তাহাদের বাহুবল আছে, বুদ্ধি আছে...... ।'

ইংল্যাণ্ডে থাকতে দ্বিজেন্দ্রলাল স্কচ ও আইরিশদের মতো দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। স্কট, বার্নস, মুর প্রভৃতি কবিদের সঙ্গীতগুলি কবিকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুবাদ-সঙ্গীতগুলির মধ্যে এঁদের সকলেরই কিছু কিছু অনুবাদ আছে। স্কচ গানের মধ্যে Auld lang Syne, Robin Adiar, Land of the Leal, Annie Laurie, Bluebells of Scotland, Auld Robin Gray ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শেষে উল্লিখিত গানটি স্কটল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত গাথা। এটির স্থানিক পরিবেশকে বদলে দিয়ে কবি বাঙলা দেশের গ্রাম্য গাথায় পরিণত করেছেন।

ইংরিজি গানের মধ্যে 'Home sweet Home', 'Lines to an Indian air', 'Under the green wood tree', 'Weep no more, Ladies', 'Rule Britania' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'Rule Britania'-র আদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল 'যখন নীলিমা জলধি হৃদয়ে উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে' ইত্যাদি লেখেন। পরিণত বয়সে এইটিরই পরিবর্তন করে লেখেন: 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে'। অনূদিত আইরিশ গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'Last Rose of Summer' ও 'Go where glory waits thee'। রবীন্দ্রনাথের মতোই দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ও ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর ও ভাবগত মিলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। সে প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকলেও তাতে আমাদের সঙ্গীত যে সমৃদ্ধ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী কাব্য 'আষাঢে'তে (১৮৯৯) দ্বিজেন্দ্রলালের কবিসত্তা অন্য এক-রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই রচনা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি ইংরিজি ব্যঙ্গ-কাব্যের ঋণ স্বীকার করেছেন[৬]:

> 'বিলাত হইতে ফিরিয়া বাঙ্গালা ভাষার হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legends-এর অনুসরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়া 'আষাঢে' নামে প্রকাশ করি।'

কিন্তু 'আষাঢে'র সঙ্গে Ingoldsby Legends-এর খুব বেশি আত্মিক সম্পর্ক নেই। কবি বারহামের [Rev. Richard Harris Barham] আকর্ষণ ছিল grostesque miracle-এর দিকে। মধ্যযুগের গল্প, সংস্কার, ভৌতিক ব্যাপার, ধর্মব্যবস্থা, অমার্জিত লোকগীতি প্রভৃতি বিষয়কে এই কাব্যে লঘু ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে। 'আষাঢ়ে' কাব্যে কেবল 'ভট্ট সভা'তে প্রাচীন কাহিনীর ব্যঙ্গাত্মক অনুসরণ আছে। এছাড়া Ingoldsby কোনো কোনো কবিতার শেষে মর্মার্থ যোগ করেছেন। Ingoldsby-র গল্প বলবার বিশেষ ভঙ্গি এবং ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য ও 'আষাঢ়ে'র দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রভাবিত করেছিল। বারহামের হাস্যকর মিল [limb: thats' him, saw: caw, claw: Jackdaw, swore: snore, Captatin m'Fuze: Snooz ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলালে পাচ্ছি: যোয়া: ধোয়া, বাধা: গাধা, নাটক: আটক, দুর্গেশনন্দিনী: ভাবতেন বসে তিনি, বিশ্বাস: ফাঁস ইত্যাদি], বিচিত্র ভাঙা ছন্দের মিশ্রণ, কোমল, শুদ্ধ ও স্ল্যাঙের মিশ্রণ, চার পাঁচটি ভাষার মিশ্রণ ও উদ্ধৃতি, শব্দ ভেঙে বাকি অংশ দিয়ে পরের পংক্তির সূচনা ইত্যাদি গুণগুলি

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। ইংরিজি, হিন্দী, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, চলতি ও স্ল্যাঙ সব মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসের উপাদান তৈরি করেছেন। 'হাসির গান' রচনার সময়ে [১৩০৭] Ingoldsby-এর স্মৃতি সজাগ ছিল। এই কাব্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতাগুলি রচনার পদ্ধতি, Ingoldsby-র কাহিনীর মতো, এই সব কাহিনীতেও কালাতিক্রমণ দোষ ঘটিয়ে উদ্ভট ঘটনা ও চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরাবেত্তা বারহাম ঐতিহাসিক ঘটনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকায় তিন চার শতাব্দীর ঘটনা একত্র করে কৌশলে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ, রামবনবাস, দুর্বাসা, কালোরূপ, কৃষ্ণরাধিকা-সংবাদ-এ সমস্তের মধ্যেই কালগত অসঙ্গতি হাস্যরসের অবতারণা করেছে। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের অসঙ্গতিকেও তিনি বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করেছেন।

Reformed Hindoos, বিলাত ফের্তা, নতুন কিছু করো, হল কি, তা সে হবে কেন, বদলে গেল মতটা, কবি চণ্ডীচরণ ইত্যাদি গানে কবির সমাজ-সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যাবে। এসব গানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালব্ধ অভিমানী সমাজের অনেক সত্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃত্ব-সর্বস্ব দেশপ্রেমিক, অপদার্থ হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যাতা, অহঙ্কারী ভাবুক, দুর্বোধ্য রচনাকার, প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল এবং নারী মুক্তিবিরোধী সকলেই বাণবিদ্ধ হয়েছেন। যে সব কবি, নাট্যকার, সমাজব্যাখ্যাতা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে দেশে তখন হৈচৈ সে সবের উল্লেখও গানে পাওয়া যাচ্ছে:

১। নাস্তিক এক দলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে;
Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়তে লাগলাম সঙ্গে,
'বদলে গেল মতটা'। সা. প. স. পৃ. ২৮৫।

২। না পড়েছে Shakespeare না পড়েছে Ganot…
Adam Smith-এর Political Economy জানে না,
Malthus-এর Theory of Population মানে না,…
Huxley, Tyndall, Spencer, Mill-এর ধারও ধারে নাক।
'জানে না'। সা. প. স. পৃ. ৩২৭-৮।

৩। রৈল শুধু গেটে শিলার, ডারুইন, মিল,
আর ছেলের খরচ মেয়ের বিয়া,
'যায় যায় যায়'। সা. প. স. পৃ. ২৭৯।

বলা বাহুল্য এই মানসিকতা বিদেশী সংস্পর্শেই সৃষ্ট হয়েছিল; দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাসির গান প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন[৭] :

…'দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানী করিয়া দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া বিলাতী ঢঙ্গের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান বাঙ্গালা ভাষায় যেমন অপূর্ব, সে গানের সুর ও গীতিপদ্ধতিও তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গায়িতেও তিনি স্বয়ং তেমনি অতুল্য ছিলেন।…দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল।'

'মন্দ্র'কাব্যে [১৩০৯] দ্বিজেন্দ্রলালের গীতিধর্মী ও তর্কপরায়ণ এই দুটি স্ববিরোধী সত্তা পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্রধর্মী উপমা অলঙ্কারে সাবলাইম ও রিডিকিউল একত্রে মিশে কবিতাগুলিকে কঠিনে-কোমলে বিচিত্র করে তুলেছে। কল্পলোক ও কঠিন সংসারের টানা-পোড়েনে কবি এখানে অসুস্থ ও অস্থির। এই মানসিকতার পরিচয় আছে 'স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। সমুদ্র, জ্যোৎস্না, কোকিলের কুঞ্জের পুষ্পবিকাশ থেকে কবির পতন হয়েছে বিজ্ঞানের কর্মময় কঠোর জগতে।

কি প্রভেদ! লীলাময়ী কল্পনার পরিবর্তে
এই দৈনন্দিন গদ্য। এ প্রভেদ স্বর্গে মর্ত্যে।
হায় সত্য! হা বিজ্ঞান! হা কঠোর! হা নৃশংস!
কাড়িয়া নিয়েছ সব জীবনের সার অংশ,
সুন্দর দেহের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া, তার
কঙ্কাল রেখেছ খাড়া শুদ্ধ শুষ্ক সভ্যতার।

সা. প. স. পৃ. ৩৬৭-৬৮।

বৈজ্ঞানিক যুগে রোম্যান্স ও আদর্শবাদ অতীতের কাহিনী-মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য কবিদের মতো পলাতক না হয়ে কঠিন মৃত্তিকাকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন কবি, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। ভাবাবেগমুক্ত বিচার-বুদ্ধিই তাঁকে এই সত্য গ্রহণে সাহায্য করেছিল। বোধ হয় ইতিপূর্বে আর কোনো বাঙালী কবি যুক্তিবাদী দর্শন ও বিজ্ঞান-চিন্তার আঘাতে আহত হয়ে সে আঘাত ফিরিয়ে দেন নি তাঁর কবিতায় :

দিব সত্য যত চাহো; ঊনবিংশ শতাব্দীর
শেষ ভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে, জানি স্থির
অন্ধ গান লাগিবে না, ভালো! তবে থাক সব,
সে করুণ, সে গম্ভীর সে সুন্দর গীতরব,
সে গভীর প্রশ্ন,—সেই জীবনের দুঃখ সুখ,
লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাগরূক।

সা. প. স. পৃ. ৩৬৯।

এরপর চরম সহ্যশক্তিতে প্রত্যহ ও শাশ্বতের বিরোধ মিটিয়েছেন। প্রেমের ক্ষেত্রে রক্তমাংসের সত্তা ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ তিনি দেখেন নি। বরং শাশ্বত কল্পনা যে প্রত্যক্ষ বিচারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিষ্ঠুর সত্যকে প্রকাশ করে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। প্রেম ও ঈপ্সা আসলে শুধু কাম ও লিপ্সা, সৃষ্টির প্রলোভনে পড়বার উপায় মাত্র। কবি এই ধরণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাঁর অনুভূতিগুলিকে সচেতন করে তুলেছেন। মানুষের সৌন্দর্য শবে পরিণত হয়, মৃত্তিকার ঘৃণ্যকীটের খাদ্য হয়, মৃত্যু এক বিচিত্র বিবাহ, যা গাঢ় অন্ধকারে ঘনস্তব্ধ নিরুৎসবে সম্পাদিত হয়, মৃত্যুর দেশ থেকে ফেরা যায় না, ইত্যাদি অনুভূতিগুলি নাস্তিকের বলিষ্ঠ উচ্চারণ, অজ্ঞেয়বাদীর হাহাকার বলেই মনে হয়। অথচ এই কবি আট ন-বছর বাদে 'পরপারে' নাটকে মহাসিন্ধুর ওপারের সঙ্গীত শুনিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি যে ইয়োরোপীয় নাস্তিক্যবাদের বিষণ্ণ হাওয়ার কবলে পড়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে'-ও বলা হয়েছে ['মানসী ও মর্মবাণী', ১৩২৩], একসময় হয়তো তিনি অজ্ঞেয়বাদী [agnostic] ছিলেন। কিন্তু শেষ কবিতা 'সুখমৃত্যু'তে প্রমাণিত হয়ে গেছে, কবি এই অজ্ঞেয়বাদের দ্বারা সাময়িকভাবে আক্রান্ত হলেও আসলে তিনি জীবন-রসিক। মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে মর্ত্য প্রেমের স্বাদ নিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছেন।

'আলেখ্য' [১৩১৪] বইটি দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগের পরেকার লেখা। পূর্বেকার বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি-এই সংকলনের কিছু কিছু কবিতায় আছে। তাছাড়া এসেছে স্ত্রী-বিরহ। বাৎসল্যরসের কবিতাও আছে। বিশেষ লক্ষণীয় বস্তু হলো নতুন সমাজচেতনা—গণতান্ত্রিক চেতনা, 'রাজা' কবিতায় যার প্রমাণ পাওয়া যাবে:

তোমার টাকা আছে? আছে না হয় টাকা,
তোমার কাছে আমি কিছু চাচ্ছি নাক;
যে চায় মাথা নিচু করুক তোমার কাছে,
মাথা নিচু কর্তে আমি যাচ্ছি নাক,
কিসের তরে দর্প! কিসের তরে গর্ব!
কিসের তরে তোমায় এত শ্রেষ্ঠ ভাব?
তোমার কাছে আমি ভাবো কিসে খর্ব?
তোমার কাছে মাথা নীচু কর্তে যাব? সা. প. স. পৃ ৪৭৭-৭৮।

এই শ্রেণীচেতনার পিছনে কোনো ইয়োরোপীয় চিন্তাসূত্র থাকা বিচিত্র নয়। গতশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রচলিত উদারনৈতিক মানবিকবাদের বিরুদ্ধে ইয়োবোপ ও আমেরিকায় যেভাবে সমাজবাদ ও কমুনিজ্‌ম্ ধীরে ধীরে মানসিকতাকে বদলাবার চেষ্টা করছিল সেই পরবর্তিত মানসিকতার ছোঁযাচ এই 'বাজা' কবিতায় লেগে থাকবে। পত্নীবিয়োগ-বিধুর সংশয়বাদী কবি ক্রমবিবর্তনবাদের ধাবায় এক মহাভবিষ্যৎকে কল্পনা করেছেন। সেই কল্পনাব যুগ, বিজ্ঞানেব বলিষ্ঠ অগ্রগতিব যুগ। পৌরাণিক যুগ নয়, নতুন সত্যযুগ। 'আলেখ্যে'র উনবিংশ চিত্রে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি:

অবোধ্য যা বোধ্য হবে, অস্পষ্ট যা স্পষ্ট হবে, অজ্ঞাত যা জ্ঞাত,
দূরত্ব অতীত হবে, জটিল যাহা সহজ হবে, দুঃখ হবে দূর,
পরার্থেই ইচ্ছা হবে, ইচ্ছা হবে ফলবতী; কার্য সুমধুর,
আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দ উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ,
স্বার্থত্যাগে স্বর্গীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত মহাভবিষ্যৎ।

সা. প. স. পৃ. ৪৮।

শেষ কাব্য 'ত্রিবেণী' (১৩১৯) অপেক্ষাকৃত স্থির-গম্ভীর স্মৃতি-বেদনার কাব্য। অতীত-স্মৃতির পর্যালোচনা করে কবি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে রহস্যজিজ্ঞাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। জগৎ ও জীবনের অর্থজিজ্ঞাসার তৃষ্ণায় কবি বলছেন:

আবার ছুটি চিন্তারাজ্যে প্রাণের তৃষ্ণায় করি ধ্যান
জগতের এক নতুন তথ্য, নতুন অর্থ, নতুন জ্ঞান।

'প্রবাসে'। সা. প. স. পৃ. ৫১৮।

হৃদয়-বৃত্তি ছাড়াও বুদ্ধি-মার্জিত মননশীলতারও যে প্রয়োজন এযুগে সে কথা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয় বার বার। সমকালীন অন্যান্য কবির মতোই মানবিকতার মহত্ত্ব দেখেছেন তিনি পৌরাণিক কাহিনীতে। হয়তো মৃত্যুচিন্তা মানুষের প্রতি তাঁব শ্রদ্ধাকে আরও গভীর মৌনে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যেই কবি দেবতাকে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রণাম কবেছেন নরদেবতাকে। উনিশ শতকেব মানবিকবাদের এই পরিণতিই স্বাভাবিক হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অতি সচেতন, পরীক্ষাবিলাসী এবং রীতিমতো স্বাধীন-পন্থী। বাঙলাকাব্যেব ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে যে নতুন পৌরুষ সঞ্চয় করেছিল তার যথাযোগ্য সম্মান এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সমসাময়িক কোন কবিকে দিতে দেখা যায় নি। 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্যেব আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন।[৮]

> 'ইহা নূতনতায় ঝলমল কবিতেছে এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবলীলাকৃত এবং তাহাব মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসেব একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে।
>
> 'সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি বিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদিগকে বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদেব মনকে শেষ পর্যন্ত তবঙ্গিত করিয়া রাখিয়াছে।…
>
> 'কিন্তু নর্তনশীল নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে 'মন্দ্র' কাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য-বিষাদ-বিদ্রূপ-বিস্ময় সমস্তই পুরুষের। তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। … …
>
> 'দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে সে ক্ষমতা কতটা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু বাংলা কাব্য ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে কেমন অনায়াসে তরল হইতে গম্ভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদু মন্থর আবেশ ভারাক্রান্ত নহে তাহা কবি দেখাইয়াছেন।
>
> 'ছন্দ সম্বন্ধেও যেন স্পর্ধাভরে কবি যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন…'

কবি নিজে যে এই ব্যাপারে কতখানি সচেতন শিল্পী ছিলেন তা 'আলেখ্য' কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় এবং অংশতঃ 'আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশ পেয়েছে। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় ছন্দ আলোচনা করে শেষে ভাষা সম্পর্কে বলেছেন :

> 'যতদূর স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষা ব্যবহাব কর্তে পারি (সুশ্রব্যতা মর্যাদা ও সদর্থ বজায় রেখে) চেষ্টা করেছি। ক্রিয়াপদের সর্বত্র প্রচলিত আকার ব্যবহার কবেছি—যেমন যাচ্ছি, কর্চ্ছিলাম ইত্যাদি। অন্য পদ বির্বাচনে আমার লক্ষ্য প্রধানতঃ প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা, তবে অপ্রচলিত শব্দ একেবাবে বর্জন কবিনি। নানা খনি হ'তে রত্ন আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমাব ধাবণা এই যে, যেখানে বাঙ্গালা শব্দ বা বচন আসল বাঙ্গালা ভাষাটি বেশী জোরে প্রকাশ কবে অথবা যেখানে বাঙ্গালা শব্দটি বা বচনাটি বেশ নিজের জোরে দাঁড়াতে পাবে সেখানে সেই বাঙ্গালা শব্দ ও বচনই ব্যবহার কবা কর্তব্য, তাতেই বাঙ্গালা কবিতা হবে। ইংরেজী বা সংস্কৃত বচন অনুকবণ করে লিখলে সে ইংরেজী বা সংস্কৃত কবিতাব অনুকবণ হবে। কবিতা হবে না। 'গুঁতোব চোটে বাবা বলায়' কি 'ভাতে মেরো না', এই রকম জোরের বচন কেহ ইংবেজীতে কি সংস্কৃততে অনুবাদ করুন দেখি।'

'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে কবির বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যেতে পারে :

ক। 'কেয়া হুয়া বাবু' !—আরে কেয়া! সর্বনাশ!
স্ত্রী চুরি—তার উপরে এ কোথা থেকে এসে
চাপল একটা অন্ধকারে মেয়ে স্কন্ধ দেশে!
স্বামীর নাম ও বলে নাক বলে বাপের নাম
কোথাকাব এক মুক্তোগাছিব কোন্ এক শম্ভুরাম।
উপায়? হা হরি এখন যে কি করি,
বলে পড়লেন হাকিম একটা বেঞ্চের উপরি।

'অদল-বদল', আষাঢ়ে।

খ। 'আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে'—চেঁচাও কেন দাদা?
'ফরাস বিছা', 'সরিয়ে রাখ, পাতার এই গাদা';

'তামাক কৈ'।—'আনছে, খুড়ো মামা ভুলনা এ গোলে';
'এখনো বর এলোনা'।—'আহা এই যে এলো বলে'।

'নববধূ'। মন্দ্র।

তবে কবি যদিও বলেছেন যে ইংরিজি বা সংস্কৃত ছন্দ অনুসরণ করলে ইংরিজি বা সংস্কৃতেরই নকল হবে, কিন্তু তাঁর কবিতাতেই ইংরিজির অনুকরণ অনেক সময়েই শ্রুতিকটু হয়েছে। অবশ্য এ শ্রুতিকটুতা 'আষাঢ়ে' কাব্য-রচনার আগেই ঘটেছে। 'আষাঢ়ে'র পর থেকে তিনি বাঙলা ভাষার ধাত মেনেই এগিয়েছেন। 'আর্যগাথা'র [দ্বিতীয় ভাগ] সমালোচনা কালে রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন:

> গ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজী প্রথায় ভাষা আমাদের কানে খারাপ লাগিয়েছে। 'কাঁদিব না দীনাহীন-কঠোরা তাপসী ঘৃণা', 'চেয়ো না বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে', 'ঘৃণার তুহিন পাশে প্রেম লো শুকায়ে যায়' ইত্যাদি পংক্তিগুলি কৃত্রিম শোনায়।

ছন্দের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম যুগে হেমচন্দ্রের রচনাভঙ্গিকেই অনুসরণ করে বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাগত দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধরনের। 'আর্যগাথা'র দ্বিতীয় ভাগে সরল কলামাত্রিক ছন্দে যুক্তাক্ষরের চমৎকার ব্যবহার করেছেন, যদিও সর্বত্র তা ত্রুটিমুক্ত নয়। এই কাব্যেই তিনি দূরান্বিত মিলে মুক্ত ছন্দের ব্যবহার করেছেন 'উদ্বোধন' কবিতাটিতে। সমিল মুক্তকের ব্যবহার করেছেন 'আশীর্বাদ' কবিতাটিতে। 'উদ্বোধন' কবিতাটির প্রথম স্তবকটি তুলে দিচ্ছি:[৭]

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মতো মনোহর—
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘনসম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়,
    সুন্দর!
কভু ভাবি মনে,
    তুমি নও শীত
    ধরণীর;

কোন সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে'
একবিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা-গীত,
আলোক ও প্রেমে
আলোক-লালিত এক অমর স্বপনে।

'উদ্বোধন' ১। মন্দ্র।

'আর্যগাথা'র দ্বিতীয় ভাগে 'পিউ' নাম দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে বিদেশী গানের অনুবাদ করলেন তাতে প্রথম সঙ্কোচক দল উচ্চারণ সম্পর্কে নানাভাবে পরীক্ষা শুরু করেছেন দেখা যায়। বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের সঙ্গে কোথাও দলমাত্রিকের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, কোথাও দলমাত্রিক ছন্দের সঙ্কোচন ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় উচ্চারণভঙ্গি প্রবর্তন করেছেন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, বিদেশী দলমাত্রিক দীর্ঘ যতিভাগের (caesurio) ছন্দের আদর্শে বাঙলা পদভাগের ছন্দে সঙ্কোচক দল উচ্চারণের নতুন রীতি প্রবর্তন করেছেন। এই রীতি 'ত্রিবেণী' কাব্যেও দেখা গেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য[১০] :

'তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাই তাতে যৌগিক ছন্দের শ্লথ বিন্যস্ত শৈথিল্য নেই ......অথচ তাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের নৃত্যপরায়ণতাও নেই। এভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অভিনব Syllabic ছন্দে স্বরবৃত্তের চটুলতা ও যৌগিকের অলস একটানা সুর বর্জিত হয়ে একটি অভিনব পৌরুষশক্তি জেগে উঠেছে যার সন্ধান আমরা পাই ইংরেজী Iambic ছন্দের কবিতায়। আর দ্বিজেন্দ্রলালের এই Syllabic ছন্দেই প্রবহমানতা অর্থাৎ enjambement আনা সম্ভবপর ইংরেজীর মতো। আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে enjambement আনা সম্ভবপর বলে মনে হয় না।'

যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলালের এই রীতিকে বলা যেতে পারে দীর্ঘপদযতি ভাগের ছন্দের দলমাত্রিক রূপ। আট ছয় বা দশ মাত্রার পদযতিভাগে তিনি রুদ্ধ-মুক্ত নির্বিশেষে প্রত্যেক দলে এক কলা উচ্চারণ রেখেছেন। তার ফলে সমস্ত ছন্দের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের দৃঢ়তা এসেছে।

ক। তোমাদের সাথে জড়ানো মোর ছিল বাল্য প্রেমের স্বপন

জানে প্রতি চিন্তা তব মনে,

অন্তিমের ভিক্ষায় আমার জগতের পিতার পদে

তোমার কথা জাগিবে গো মনে,

সুখী সে সব সখা প্রেমী তোমার গৌরব সুখের সময়

দেখতে যারা রইবে পরে জীয়ে,

তার পরেই প্রিয়বর এই বিধির প্রসাদে হেন

তোমার জন্যে মরার সুখটি প্রিয়ে।

'when he who adores thee'

'আর্যগাথা'। দ্বিতীয় ভাগ।

খ। নাইক আলোক নাইক শব্দ, কেবল আকাশ দীর্ণ করে

মুহুর্মুহু পূর্বভাগে খেলে বিদ্যুচ্ছটা,

কেবল দূরে অতি দূরে গুরু 'গুরু গুরু' শব্দে

মুহুর্মুহু বজ্র হানে কৃষ্ণ ঘনঘটা। একাদশ চিত্র। 'আলেখ্য'।

'ত্রিবেণী' কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত সনেটের তুলনায় দশপদী প্রবহমান, সঙ্কোচক দলমাত্রিক, আঠারো মাত্রা পংক্তির নতুন রীতির কবিতা বেশি পছন্দ করতেন। আমাদের মনে হয় এই নতুন কাব্য-রীতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কতকগুলি সার্থক খণ্ড কবিতা লিখেছেন, যেগুলি বাঙলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ সনেটগুলির সমান মর্যাদা পেতে পারে। 'গোধূলি' কবিতাটি তুলে দিচ্ছি:

সূর্য অস্ত গেল! দিবার শুভ্র আলোক, অন্ধকার লেগে

ভেঙ্গে গেছে,—চূর্ণ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা ঝড়ে;

শুয়ে বর্ণগুলি চারিধারে-আকাশে ও মেঘে।

যেন একটা বর্ণ-সৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে;

যেমন একটা মহানদী বহে গিয়ে পূর্ণ খরবেগে

শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে,

যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাছন্দে জেগে,

ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শতভগ্ন মূর্চ্ছনাতে বেজে।

সূর্য অস্ত গেল! বিশ্ব ঘেরে এল কৃষ্ণসুপ্তি নেমে,

মিশিয়ে গেল মহানদী সিন্ধুজলে, গীতি গেল থেমে।

সা. প. স. পৃ. ৫৩২।

এ বর্ণনা যে কোন, মহাকাব্যের অন্তিম পরিণতির উপযুক্ত পরিবেশ হতে পারে। সঙ্কোচক দলমাত্রিক রীতিতে প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ার যে কত বলিষ্ঠভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং মহাকাব্যের মহৎ বিষয় যে এই ছন্দের সাহায্যে সার্থকভাবে প্রকাশ পেতে পাবে তার প্রমাণ এই ধরনের কবিতাগুলি।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্তবক গঠনে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও মিলের নানা বৈচিত্র্য এনেছেন বিদেশী আদর্শে। এ বিষয়ে দিলীপকুমার রায় বলেছেন [১১] :

"দ্বিজেন্দ্রলাল 'আষাঢ়ে'তে সম্পূর্ণ স্বকীয় ভঙ্গিতে চলে যখন বাংলা ছন্দে একজন নব পথিকৃৎ বলে গণ্য হন তখন তিনি এ ছন্দ ও মিলের কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন রিচার্ড হ্যারিস বাবহাম-র বিখ্যাত ইনগোলড্‌বি লেজেণ্ডের ছন্দ ও মিল থেকে, কিন্তু শুধু এই বইটি থেকেই নয়। টমাস ক্রফ্‌টন ক্রকার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে 'পপুলাব সংস্ অফ্ আয়র্লণ্ড' বলে একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রকাশ কবেন। তাতেও বারহাম প্রবর্তিত মিলের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়েছিল! যথা—who wise is-এব সঙ্গে no ice is-এর মিল our shop-keepers have a cant এব সঙ্গে they charge us extra-vagant জাতীয় মিল।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'আষাঢে'তে এই পথেই নানা বাঙলা মিলের প্রবর্তন করেন বটে, কিন্তু তাঁব স্বকীয় প্রতিভার বলে অভিনবত্ব বজায় বেখে সুষ্ঠু ঘরোয়া মিলও বর্ষণ করেন ছত্রে ছত্রে। যথা :

ক। সে প্রকাণ্ড কার্যে
প্রচার কবতে হিন্দু ধর্ম চেতন করতে আর্যে
পাঁচিলগুলো ভাংলো
চালা কবলো বাংলো। নসীরামের বক্তৃতা। 'আষাঢ়ে'।

খ। প্রেমটা ভাবি মজাব ব্যাপাব প্রেমিক মজাব জিনিস
ভাবিস কিবে এমনি গো তাব থাকবে চিবদিন! ইশ;
কত 'প্রিয়তমে প্রাণেশ্বরী' তাহাবি উত্তর
(এই) প্রিয় সম্বোধন শেষে হায়, 'ওগো শোনো'য় ফিনিশ।
'হাসির গান'।

এছাড়া মধ্য মিল :

পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন।
'নন্দলাল'। হাসির গান।

এছাড়া আছে inverse rhyme, মোহিতলাল যাকে বলেছেন জোড়মিল :

যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা

তখন ভাই নাহি ক্ষেপে হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্—'।

আরও দুএকটি স্তবকের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-রীতি প্রসঙ্গ শেষ করছি :

ক। নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ এতটুক ;
শূন্য অবসাদে, এস মাথা রাখি
ও কোমল অঙ্কে, এস চেয়ে থাকি
ও আনত নেত্রে,—তুমিই একাকী
ফিরায়ো না মুখ।

'দাঁড়াও'। মন্দ্র। পৃ. ৩৪৮। সা. প. স.।

খ। আমরা ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চলে সশরীরে, যাচ্ছি চলে মধুপুর।
শুনছি বসে নিশিদিন, কানের কাছে বাজছে বীণ,
খাচ্ছে যত অর্বাচীন, ঐ গাঁজা গুলি চরস,
সস্তা হোক না, তার চেয়ে ভাঙ লক্ষগুণে সরস,
নেশার রাজা সিদ্ধি যেমন মনির মধ্যে কোহিনুর।
ভাঙ খেয়ে হয়ে আছি চুর।

ভাঙ। 'হাসির গান'। পৃ. ৩২১। সা. প. স.।

১। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী। পৃ. ৮০।

২। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী। পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী। পৃ. ১৯৯।

৪। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী। পৃ. ১৯৯।

৫। দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী। বিলাতের পত্র, পৃ ১৬৯-১৭০।

৬। নাট্য মন্দির : শ্রাবণ ১৩১৭।

৭। সাহিত্য, আষাঢ় ১৩২০। দেবকুমার রায় চৌধুরীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' বইতে উদ্ধৃত। পৃ, ২৮৪-৫।

৮। বঙ্গদর্শন : কার্তিক, ১৩০৯। 'আধুনিক সাহিত্যের' অন্তর্ভুক্ত।

৯। 'মন্দ্র' কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতাটি 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে—ইতিপূর্বে একটু অন্যরূপে পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে কবিতাটির নাম 'উৎসর্গ'। কবিতাটির ছন্দ বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখছেন: এতে প্রথমেই 'উৎসর্গ' কবিতাটি [তাঁর সহধর্মিণী সুরবালা দেবীর উদ্দেশ্যে] রচিত হয় বলাকার ছন্দে অর্থাৎ সমিল অক্ষরবৃত্ত প্রবহমান মুক্তক ভঙ্গিতে। এ থেকে একটি ছোট উদ্ধৃতি দিলেই আমার বক্তব্য সপ্রমাণ হবে যে, এ বলাকার ছন্দেরই অগ্রদূত বটে।·· বলাকার বিখ্যাত মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রলালই বটে। 'দ্বিজেন্দ্রলালেব ছন্দ প্রতিভা'।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্যসঞ্চয়ন। পৃ. ১।

১০। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ: উদয়ন ১৩৪০, আশ্বিন। পৃ. ৬৪৭-৬২। ড. নীলরতন সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ' বইতে উদ্ধৃত।

১১। 'দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ প্রতিভা': দ্বিজেন্দ্র-কাব্যসঞ্চয়ন:

দিলীপকুমার রায়।

বারো

কামিনী রায়

উনিশ শতকের শেষ দিকে যে কজন মহিলা কবি বাঙলা কাব্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি কবতে পারেন। তাঁর এই উচ্চাসন পাবার ক্ষেত্রে বিদেশী শিক্ষাই যে বিশেষ ভাবে তাঁকে প্রেরণা দিয়ে সাহায্য করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছোটবেলা থেকে তাঁর মনের ওপর তাঁর পরিবারের ধর্মপ্রাণতা ও ভাবুকতা প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতৃদেব চণ্ডীচরণ সেনের অধ্যয়নশীলতা তাঁর ওপবেও বর্তেছিল। স্কুলে পড়তেই দর্শন শাস্ত্রের নানা বই-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ঘটে। কিছু দিন কামিনী দেবী মিস ক্রয়েড প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের বোর্ডার হন। তারপর প্রায় দেড বছর পিতৃদেবের কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে খুব সম্ভব স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত 'আলো ও ছায়া রচয়িত্রী' প্রবন্ধে কবিব এই সময়কার পড়াশোনা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

> "প্রতিদিন সকালে উপাসনার পরই হয় বাইবেল না হয় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ কন্যার পাঠের জন্য নির্দেশ করিয়া দিতেন। 'Morning and Evening meditation' নামক পুস্তক হইতেও প্রতিদিন একটি করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন।"

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুল থেকে কবি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংস্কৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে পাশ করেন। উল্লিখিত প্রবন্ধেরই এক স্থানে বলা হয়েছে :

> 'সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম, তাঁহার আদর্শ বেশির ভাগ ইংরিজী ও সংস্কৃত সাহিত্য জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনা প্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাচে ঢালা হইতে পারে নাই।'

ইংরিজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠিকা কামিনী রায় রবীন্দ্র-যুগের [illegible] উচ্ছ্বসিত লিরিক প্রবণতাকে শিল্পরুচি-সম্মত সহজ সরল [illegible] [illegible] [illegible]

সমর্থ হয়েছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, হেমচন্দ্রের কবিতা তাঁর কবি প্রতিভার উদ্বোধক হয়েছিল। তার কারণ ঠিক হেমচন্দ্রের লিরিক প্রবণতা নয়, হেমচন্দ্রের তেজস্বিতা ও সহৃদয়তাই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেছেন:

> 'রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তাঁহার জলন্ত স্বদেশ প্রীতি, নারী জাতির প্রতি তাঁহাব শ্রদ্ধাপূর্ণ অকপট সহানুভূতি, দেশাচারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার, জাতীয় পবাধীনতায় ক্লেশ ও লজ্জাবোধ—এসকল তাঁর মত তেজস্বিতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার পূর্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখনকাব বিচাবে তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক ত্রুটি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমরা সেকালে কলাকুশলতা (art) হইতে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় (heart) দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।' মন্মথনাথ ঘোষকে লিখিত চিঠি। ১১ই জুলাই, ১৯২৩।

বোঝা যাচ্ছে, নিবলংকাব উচ্ছ্বাসকেই তিনি পছন্দ করতেন বলে রবীন্দ্রনাথের শিল্প কুশলতাকে তিনি বিশেষ আমল দেন নি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, কৈশোরের কিছু কবিতায় হেমচন্দ্রের লিবিক 'চীৎকার' ধীরে ধীরে কমে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের অনতিক্রম্য প্রভাবেই তাঁব কবিতায় অন্তর্ভেদী ক্রন্দন ফুটে উঠেছে।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের রোম্যান্টিক বহস্তময় কবি কামিনী রায় তৃপ্ত হতে পারেন নি। জীবনের সুখদুঃখকে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন এবং এইখানেই তিনি যে হেমচন্দ্রেবই উত্তর সাবিকা তা প্রমাণ হয়ে গেছে। উল্লিখিত চিঠির মধ্যেই আর এক স্থানে বলেছেন:

> 'ছন্দ, সুব, নিখুঁত মিল, উপলাহত গিবিস্রোতের কলকলধ্বনি, ইন্দ্রধনুর নানা বর্ণের ক্ষণিক খেলা, আবছায়া স্বপ্নের আবেশ এই সব তাহাদের মতে কবিতায় একান্ত আবশ্যক, এগুলি উপাদান বটে এবং অতিশয় উপভোগ্য তাহারও ভুল নাই, কিন্তু কেবল এইগুলি দিয়াই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, আরও কিছু চাই। সুখ, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা আশা আকাঙ্ক্ষা, গভীর আনন্দ ও তীব্র বেদনা এই সকল দিয়া যে মানব জীবন তাহার একটা জাগ্রত অস্তিত্বও আছে, এবং তাহার একটা সবল প্রকাশের উপযোগী কবিতাও আছে ও থাকিবে।' মন্মথনাথকে লেখা চিঠি। ১১ই জুলাই ১৯২৩।

অর্থাৎ জীবনকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও অনেক বেশী স্থূলভাবে, অগভীর ভাবে আস্বাদ করতে চেয়েছিলেন কামিনী রায়। ফলে রোম্যান্টিক কবিদের দুর্লক্ষ্য কল্পনাভিসার তাঁর কাব্যে নেই, ভাষার মধ্যেও প্রথাগত সংস্কারকে

কাটিয়ে ওঠবার কোন আগ্রহ নেই, কাজেই নিতান্ত সহজ 'সাদামাঠা' ভাষায় রবীন্দ্রযুগের রোম্যান্টিক হতাশা-বেদনা পরিস্ফুট হয়েছে। মনে হয়, কবি যেন রবীন্দ্রযুগের সঙ্গে সত্যগত হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের যুগের মধ্যে আপোষ করবার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর কবিতা ব্যক্তিক হয়েও বাস্তব যা প্রত্যক্ষের প্রতি উদাসীন নয়।

হেমচন্দ্রের ভূমিকা সম্বলিত 'আলো ও ছায়া' [১৮৮৯] কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'ভাবতী' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রবন্ধটিতে যা বলা হয়েছে তা আগেই উদ্ধার কবছি, প্রযোজনবোধে তার পূর্বেব বাক্যটি সমেত উদ্ধার করছি :

'কোন সমাজের কোন দিকই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই। সামাজিক জীবনে অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশীর ভাগ ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য-জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনা প্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই।'

এ ছাড়া 'আলো ও ছায়া' প্রসঙ্গে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :

'আমার মনে হয় আমি কিছু অকালপক্ক ছিলাম। কতক-বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথেব পূর্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন।' 'বঙ্গের মহিলা কবি'। পৃ. ৮৩।

স্বর্ণকুমাবী দেবীর কথিত ইংরিজি সাহিত্যের আদর্শ হলো বিষাদময়তার ও বিশ্ব প্রেমের রোম্যান্টিক আদর্শ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ হলো বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র-গ্রহণ। 'আলো ও ছায়ার' অনেক কবিতাতেই বিষাদের প্রকাশ :

ক। গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরল মুকুল ;
সকলি গিয়াছে কি আছে আর।
নিবিল আকাশে আশাব প্রদীপ
ভেঙ্গে চুরে গেল বাসনা যত
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন
জীবন মরণ একই মত। সুখ।

খ। লুকান বিষাদ মানব হৃদয়ে
গভীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী নৈরাশ চীৎকার
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙ্গে না তায়। সুখ।

গ। ধরা আর ত্রিদিবের মাঝে করে বাস
আলো আর আঁধারের মিলন সীমায়
আধ কাঁটা, আধ তাব সৌরভ সুহাস,
কাঁটা ধরি, সে সুবাস ধরা নাহি যায়
সেই তার কুমারী-হৃদয়।
বিহগ-বালিকা ছুটি দূর শূন্য ঘবে।
মুক্ত কণ্ঠে কত গীত গাহে মধুময়,
ভুলে ভুলে ভাবি আমি, অভাগারি তরে
বিষাদের মৃদু স্রোত: তার সাথে বয়
আধেক আমারি সেই কুমারী হৃদয়। পঙ্কক ৩।

প্রায় হেমচন্দ্রের ভাষায় এই রোম্যান্টিক বিষণ্নতা পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ কৈশোর কাব্যে ও যৌবনারম্ভের কাব্যে প্রকাশ কবেছেন। এই বিষাদ যে বোম্যান্টিক ও সমসাময়িক ইংরিজি কাব্যগুলিরও বিশেষত্ব সে নিয়েও 'ভাবতী'তে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন এবং বায়রনের যে কবিতাটি অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ রোম্যান্টিক মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছিলেন তার উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে, কামিনী রায়ের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি কোন কাব্যাদর্শের প্রতিরূপ:

যদিও বা ত্যজি বিরামের আশা
যথন গভীর রাতি,
হাসি আলপেতে থাকি নিমগন
আমোদে প্রমোদে মাতি।
তবু সে ভগ্ন প্রাসাদের মত
লতায় পাতায় পোরা
বাহিরেতে তাব হরিত নবীন
ভিতরেতে ভাঙ্গা চোরা।
রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ। 'ভারতী' ১২৮৭ আশ্বিন। পৃ.২৮৯।

কামিনী রায়ের কাব্যে বিশ্বপ্রেমের কথাও আছে যা রোম্যান্টিক কবিদের

মধ্যে, বিশেষ ক'রে ভিক্টোরিয়ান কবি টেনিসনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। 'ভালোবাসার ইতিহাসে' কবি বলেছেন :

কে যেন সে মরে গেছে তার শ্মশানের 'পরে
উঠিয়াছে ধীরে ধীরে চারু দেবালয়,
বিশ্বহিত পুরোহিত নিয়ত ভকতি ভরে
পূজিতেছে বিশ্বদেবে, ত্রিভুবনময়
বিচরিছে ভালোবাসা, স্বাধীনা আননে তার
দিব্য প্রভা কণ্ঠে দিব্য সঙ্গীতের সুধাধার।

ভালোবাসার ইতিহাস। 'আলো ও ছায়া'।

কিন্তু কামিনী রায়ের পূর্বেই 'কবি কাহিনী'তে কিশোর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমের নবাগত আদর্শ প্রচার করেছিলেন :

এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়!

কবিকাহিনী। অচলিত সংগ্রহ। পৃ. ৪৪

কাজেই কবির যে মন্তব্য, রবীন্দ্রনাথের আগেই তিনি কিছু নতুন বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন, তা সত্য নয়। প্রায় সমস্ত কিছুই তখন বাঙলা কাব্যে এসে গেছে যা নিয়ে কামিনী রায় কাব্যচর্চা করছিলেন। খুব সম্ভব স্মৃতিভ্রংশতার জন্যই পরবর্তী কালে কবি এই দাবি করেছিলেন।

'আলো ও ছায়া'র শেষে 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' নামে দুটি দীর্ঘ কবিতা আছে [১৮৮৬, রচনাকাল]। সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র নিয়ে বাঙলায় স্বতন্ত্র কাব্য রচনা এই প্রথম। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় এবং পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল চরিত্রগুলির সমসাময়িক বিদেশী কাব্যরূপ কবিকে এই দুটি কাব্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে পৌরাণিক ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের চরিত্র ও পরিবেশ আশ্চর্য ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একমাত্র এই ক্ষেত্রে কামিনী রায় অগ্রবর্তিনী বলে দাবি করতে পারেন।

পরবর্তী কাব্যগুলি হলো 'নির্মাল্য' (১৮৯১) 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭) 'গুঞ্জন' (১৮৯৭) 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), 'অশোকসঙ্গীত' (১৯১৪) 'অম্বা' (১৯১৫)

'ঠাকুরমার চিঠি' (১৯২৪) 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯) এবং 'জীবনপথে' (১৯৩০)। 'পৌরাণিকী' ও 'অম্বা'র মতো রোম্যান্টিক নাট্যকাব্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের থেকেই নেওয়া। বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ব্রাউনিঙ ছিলেন আদর্শ। 'গুঞ্জনে'র শিশু-কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'র অনুসরণ। 'মাল্য-নির্মাল্য' থেকেই রবীন্দ্র-প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করা যায়। হতাশ নারীর অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয় ও আত্মবিলাপের ইচ্ছা এই কাব্যে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। 'অশোক সঙ্গীতে' কবির পুত্রশোকাতুর হৃদয়ের প্রকাশ হয়েছে অনেকগুলি সনেটে। বিদেশী এলিজির আদর্শ তো আছেই, রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'ও রয়েছে আদর্শ হিসাবে। 'দীপ ও ধূপে'র কবি মনে মনে 'নৈবেদ্যে'র অনুসারী। 'জীবন পথে'র সনেটগুলিও ভাবে ভাষায় রবীন্দ্রানুগামী।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের পরিবেশে কামিনী রায়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন দান নেই। হেমচন্দ্রের অনুযায়ী হলেও হেমচন্দ্রের লঘু ছড়া জাতীয় রচনাকে বা সংস্কৃতের মতো উচ্চারণীয় কবিতাকে তিনি আদর্শ করেননি, করেছেন প্রবহমান, যতিপ্রান্তিক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি ছন্দবন্ধ, বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দ এবং বিভিন্ন স্তবকবন্ধের অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে সমিল প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন কামিনী রায়। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ওই আদর্শ পেয়েছিলেন কীটসের কাছ থেকে। এখানে একটি চৌপদী ও দ্বিপদীর মিশ্র স্তবক উদ্ধার করছি:

কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁর ফুরায়েছে আঁখিজল,
ভালবাসা তপস্বিনী কাঁদে নাকো আর,
বিষাদ-সরসে তার ফুটিয়াছে শতদল,
শারদ গগন ভরা কৌমুদীর ভার,
নলিনী নিশ্বাস বাহী সুমধুর সন্ধ্যাবায়,
দেখিতেছে, ভালোবাসা কে যেন মরিয়া যায়।

ভালোবাসার ইতিহাস। 'আলো ও ছায়া'।

কামিনী রায় একশোর বেশি সনেট লিখেছিলেন। বেশির ভাগ সনেটের মিল বিন্যাসে পেত্রার্কারই অনুসরণ করেছেন। তবে ভাবগত অষ্টক-ষট্ক বিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট রাখেন নি। কল্পনার গাঢ়তা সনেটগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই সার্থক করেছে। একটি সনেট উদ্ধৃত করে কামিনী রায়ের প্রসঙ্গ শেষ করছি:

বসন্ত কি সহসা এ নির্জন আকাশে
পশিয়াছে চুপি চুপি, নবীন পল্লবে
সাজিয়াছে তরুরাজি, ঝেড়ে দিলে কবে
পুরাতন জীর্ণপত্র, শীতল বাতাসে
বাতাবি ফুলের গন্ধ ধীরে ভেসে আসে
আমার গবাক্ষ পথে , ঘন কুহু রবে
মুখরিত আম্রবন বসন্তই হবে।
উদ্যান উজ্জ্বল শত শ্বেত পুষ্প হাসে।
আজিও ধরণী মোরে রেখেছে ধরিয়া
তার স্বর্ণ কারাগারে বর্ণ গন্ধ গানে,
বসে স্পর্শ দিতে চাহে দেহে আর চিতে
নবপ্রাণ, কিন্তু হায় নিঃশেষে ভরিয়া
কই দিতে পারে মধু ? দূরে কোন্‌খানে
থাকে অদেহীরা, বঁধু, পার বলে দিতে।

বসন্তাগমে। 'জীবন পথে'।

তেরো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এসে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কথাটি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে প্রয়োগ করতে হয়। কারণ বাঙলা কাব্যের অন্য যে কোন কবির প্রসঙ্গে [রবীন্দ্র-পূর্ব সাহিত্যে, রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেও] 'পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' কথাটি যত সহজে ব্যবহার করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ততটা সহজে পারি না। যেহেতু পাশ্চাত্ত্য সংঘাতের পরিণত ও শ্রেষ্ঠ ফল তিনি, সেই হেতু তাঁব উপর প্রভাব তাঁব স্বভাবের মতোই সহজ। কাজেই সে প্রভাবের উৎসসন্ধান মাঝে মাঝে নিতান্তই ব্যর্থশ্রম বলে মনে হবে। হঠাৎ ফুলেব অবণ্যে ঢুকলে এক ঝলক গন্ধ আসে, কিন্তু সে গন্ধে এমন এক জটিল মাদকতা থাকে যাতে কোন্ কোন্ ফুলের গন্ধের মিশ্রণে সে গন্ধেব সৃষ্টি হয়েছে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়। ববীন্দ্র-কাব্যে প্রভাব নির্ণয় কবা তেমনি এক দুঃসাধ্য ব্যাপাব। হঠাৎ শেলি কীট্সের সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়ে চমকে উঠে যেমন আবাব নীরব হয়ে যেতে হয়, তেমনি বৈষ্ণব কবির কোনো পংক্তি পেয়েও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব স্বাদ ঠিক পাওযা যাচ্ছে না। সব কিছুর মধ্যে জড়িত মিশ্রিত থেকেও, অনেক কিছুকে অবলম্বন করেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তবু সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে তাব উৎসের উপকরণ সংগ্রহ আমাদের যথাসাধ্য কর্তব্য এবং সে কাজ এক অসীম কৌতূহলেরও বিষয়।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ওপর পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব সম্পর্কে আলোচনাগুলির মধ্যে দুটি মত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একপক্ষে রবীন্দ্রনাথেব সব কিছু স্বাভাবিক ভাবনা চিন্তার মধ্যে ইয়োরোপীয় কবিদের প্রভাব খুঁজবার দুঃসাহসিক চেষ্টা দেখা যাচ্ছে এবং সে চেষ্টা কখনো কখনো হাস্যকর হয়েছে। বিশেষ করে Two Cities পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ [Centenary Number] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র 'পশ্চিম পানে অসীম সাগর'কে ইয়োরোপের আভাস বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং 'প্রভাব' কথাকে যান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করে প্রমাণাতীত

প্রভাবের সুযোগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোগহন থেকে বোদল্যেয়রকে খুঁজে পেয়েছেন। সুনীলচন্দ্র সরকার তাঁর 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব' প্রবন্ধটিতে বদল্যেয়রের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন[১] :

> 'বিলাত বাসের সময় রবীন্দ্রনাথ এই কবির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এসম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। …সমস্ত 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যটি পড়লে সন্দেহ থাকতে পারে না যে কবি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমসাময়িক ইয়োরাপীয় সাহিত্যের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ামণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর কাব্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বদলেয়ার সূত্রের কতকটা সার্থক প্রয়োগ।'

বোদল্যেয়রের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যে থাকা সম্ভব। বোদল্যেয়রের কাব্যেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব পরিচয় যে ছিল সে সম্বন্ধে পবে যথাস্থানে বলা যাবে। তাতে বুদ্ধদেব বসু ও সুনীলচন্দ্র সরকারের অনুমান নির্ভব সিদ্ধান্তের খানিকটা সত্য ভিত্তি হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধে অনেক সহজ প্রমাণ ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত সিম্বলগুলির অদ্ভুত ব্যাখ্যা করে ইয়োরোপীয় প্রভাব খুঁজবার হাস্যকর চেষ্টা আছে।

রবীন্দ্রনাথের ওপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অন্য উল্লেখযোগ্য মতটি হলো এই যে, ববীন্দ্রনাথ শেলি, কীট্স, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিঙ, সুইনবার্ণ ইত্যাদি কবিদের ভালবেসে থাকতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যকেই সমনোযোগে অনুসরণ করেছেন। 'সাহিত্য অ্যাকাডেমি' থেকে প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংকলনে অধ্যাপক তারকনাথ সেনের রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কিত রচনায় এমন একটা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যে ধ্যানে মনে আদর্শে ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তা আমাদের অজানা নেই। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে গিয়ে একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়েছে, অন্যদিকে ক্রমাগত সংকোচনশীল বিশ্বের কবি হয়ে অনিবার্যভাবেই তাঁকে শ্রেষ্ঠতর সাহিত্যের অনুভূতি ও চিন্তার প্রকাশকে সামনে রেখে আমাদের ভাষার ধাতুতে সেই আদর্শ অনুযায়ী নতুন চিন্তা ও প্রকাশ-ভঙ্গি সৃষ্টি করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রভাব অনেক সময়েই অদৃশ্য, হুবহু নকলের ছাপ প্রায় কোথাও নেই [যা তিনি বরদাস্ত করতেন না ', কিন্তু বিশেষ রুচি, ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় যথাসম্ভব

ভারতীয়ভাবে কবি নতুন আইডিয়া ও ভঙ্গিকে জীবনে ও শিল্পে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। সেই রুচি, ভাব ও আদর্শকেই যে সব সময়ে নিয়েছেন তা নয়, সেগুলি প্রেরণামাত্র, উপলক্ষমাত্র। সেগুলিকে চোখের সামনে রেখে নিজের স্বভাবে পরিণত করবার চেষ্টা করেছেন। অন্যভাবে বললে বলা উচিত, পাশ্চাত্ত্য কাব্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই হয়েছেন, নামহীন অনুকারকের দলে ভিড়ে যান নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ওপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সামান্য অংশমাত্র প্রমাণের অপেক্ষা রাখে, কিছু অংশ আভাসে ইঙ্গিতে অনতিস্পষ্ট, কোথাও রাসায়নিক 'আত্তীকরণে' সম্পূর্ণ অব্যক্ত। আদর্শ কোথাও কোথাও পাশ্চাত্ত্যের হতে পাবে। উপকরণ ও উপস্থাপনা কিন্তু প্রায়ই তাঁর নিজস্ব। কবির সমগ্র সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে বুঝতে গেলে সব কিছুরই আলোচনা প্রয়োজন।

'রবীন্দ্র-জীবনী' থেকে আমরা প্রমাণ পাই, কবি চিরকালই নিজের পড়াশোনা, বিশেষ করে ইয়োবোপীয সাহিত্যপাঠ সম্পর্কে জানাবার ব্যাপাবে খুবই নিস্পৃহ। তিনি পড়েছেন অজস্র, এদেশী বিদেশী নানা বই তাঁর চিন্তা ও আবেগকে উদ্বুদ্ধ কবেছে, কিন্তু সে সব পড়াশোনার খববের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সগর্বে ঘোষণা কবে যাননি। চিঠিপত্রে, আলোচনায় ও কথাবার্তার মধ্যে অনেক বিস্ময়কর তথ্য আমবা পেয়েছি যা তাঁব জ্ঞাতসারে জানতে পারি নি, আমাদেবই খুঁজে নিতে হযেছে। উপনিষৎ, কালিদাসের কাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী—এই তিন সাহিত্য তাঁব লেখায় স্বীকৃতি ও ঘোষণা পেয়েছে যতটা, বিদেশী সাহিত্য মোটেই ততটা পায় নি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্পর্কে এই নিস্পৃহতাকে স্ববিরোধ বলেই মনে হবে, কারণ ইয়োবোপের সঙ্গে তিনি যেভাবে নিবন্তব যুক্ত হয়েছিলেন, সে ভাবে সমসাময়িক কালে আর কোন সাহিত্যিকই যুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়ে অবশ্যই বুদ্ধদেব বসুর মত বিশেষ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয[২] :

> 'অন্তত এ বিষযে সন্দেহ নেই যে পশ্চিমেব প্রতি তাঁর মনোভাব ছিলো উভমুখী, একদিকে প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে অবমানিত পরাধীন স্বজাতির জন্য তীব্র বেদনা বোধ। যেমন পবিণত বয়সে বিলেতি বেশবাস ধারণ করতে তাঁর স্বমর্যাদাবোধ এতদূব পর্যন্ত আহত হয়েছে যে তার বদলে তিনি রচনা করে নিয়েছিলেন এক বিচিত্র পরিচ্ছদ যা আধুনিক কালে পৃথিবীর কোন দেশেই প্রচলিত নেই, এবং যা এক ও অনন্ত রবীন্দ্রনাথ

ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষেই অব্যবহার্য—তেমনি তাঁর রচনার মধ্যেও পশ্চিমপ্রীতি খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় নি, যেহেতু ভারতের বর্তমান শোষক ও উৎপীড়কগণ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাঁর ভ্রমণকালীন দিনলিপির পাতায় পাতায় এই সচেতন বিমুখতার আমরা প্রমাণ পাই। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যে প্রতীচীতে দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় সহনশীলতা, গণতন্ত্র ও সর্বমানবের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি, তার প্রতি কখনো কখনো শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করা যদিও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তবু ঐ দিনলিপিগুলিতে তিনি অবিরলভাবে ব্যক্ত করেছেন পাশ্চাত্য দ্রুতি ও ব্যস্ততার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, নিরন্তর ইচ্ছা করেছেন তাঁর বাংলার অখ্যাত নিস্তরঙ্গ গৃহকোণে ফিরে যেতে। 'কী ভালো হোতো যদি বিদেশীরা ভারতবর্ষের সন্ধানই না পেত কখনো'।—এই রকম একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাও একবার তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যদি তাই হোত, যদি বিদেশীরা না আসতো তাহলে আমাদের আকাশে রবীন্দ্রনাথ নামক জ্যোতিষ্কেরও উদয় হোতো না। আর তিনি তা নিজে জানতেন না তাও নয়।'

একটা কথা মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা এবং বিজ্ঞান আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে একথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বলেছেন তার 'কালান্তর' প্রবন্ধে [১৩৪০]। সমান্তরাল দৃষ্টান্ত তুলে তিনি বলেছিলেন:

> 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত ইউরোপের মনে যখন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যস্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।'

কিন্তু অন্যদিকে জাতীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য অর্থাৎ ইংরেজের অন্য রূপ তাঁকে বিচলিত করেছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশীয় ধর্মবোধ ও ন্যায়বোধ দিয়ে তার সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে কোনো আদর্শের নকলনবিশি রবীন্দ্রনাথ কখনো করেন নি বলেই প্রভাবগুলি স্বীকারে তাঁর কুণ্ঠা ছিল বলে মনে হয়। আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত। তা হলো এই যে, বেদ উপনিষৎ কালিদাস এবং বৈষ্ণব পদাবলী—যাতে ওতপ্রোত হয়ে তাঁর

কবি-চিত্ত আকার পেয়েছে সেগুলি সম্পর্কে তিনি কুণ্ঠাহীনভাবে তাঁর ঋণের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু ঠিক এইভাবে ওতপ্রোত হন নি তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে। ইংরিজি সাহিত্যের প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস, তার বিচিত্র ভাবনা ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বরাবরই কবিকে মুগ্ধ করেছে, 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি থেকে আরম্ভ করে শেষ বয়সের চিঠিপত্রে পর্যন্ত সে সবের উল্লেখ ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু সব কিছুকেই ভারতীয় তথা বাঙালী ধাতুতে গড়ে পিঠে নিয়েছেন তিনি। এই কারণেই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য 'পুরাতন অথচ পুরাতন নয়, নতুন অথচ নতুন নয়' এই ভ্রম সৃষ্টি করে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইয়োরোপীয় প্রভাব আলোচনা করার আগে ঠাকুর বাড়ীর পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়াব কথা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। দ্বারকানাথের পাশ্চাত্ত্যপ্রীতির কথা সুবিদিত। উনিশ শতকের ইংরেজ-সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক বনিয়াদের অনুকরণে তিনি মন দিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডেব শিল্পকেন্দ্র ও খনিকেন্দ্রগুলি তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। আয়ারল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন লর্ড রসের টেলিস্কোপ দেখবার জন্যে। ইয়োরোপকে জানবার ও বুঝবার জন্যই তিনি সে দেশে গিয়েছিলেন। দ্বারকনাথের বাগানবাড়ি, তার গৃহের স্থাপত্য, গৃহসজ্জা সমস্তই ছিল ইয়োরোপীয়। আহার-পানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সনাতনী আদর্শের চিহ্ন বিশেষ ছিল না তাঁর জীবনে ও আচরণে। যা পাওয়া যায় তা মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবক্ষয়ের চিহ্ন। আগেই বলেছি যে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই আমাদের Age of Reason শুরু হয়। এই সময় থেকেই ইয়োরোপীয় বিপ্লবী, দার্শনিক, ধর্মজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের বইগুলি এদেশে আসতে আরম্ভ করে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চারজন তরুণ বাঙালী যাঁরা চার বছর আগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেছিলেন তাঁরা সভার কাজ চালাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সভার কাজ ছিল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান চর্চা ও ভারতীয় ধর্মালোচনা। দেবেন্দ্রনাথ নিজে শুধু যে প্রাচ্য দর্শনগুলি পড়েছিলেন তা নয়, তিনি স্কচ দার্শনিকদের রচনা, বেন্থাম থেকে মিল পর্যন্ত ইউটিলিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌-বিষয়ক আলোচনা, কাণ্ট ও হেগেলের রচনা এবং অক্সফোর্ড আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের রচনাও পড়েছিলেন। হেগেলের রচনা দেবেন্দ্রনাথকে দ্বৈতবাদ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। তিনি বলেছিলেন[৩]:

'তিনি আমাদের শরীর-মন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই নিকটে দেখি। তিনি শরীব মন্দিরের দেবতা। তিনি আমাদের নিজস্ব ধন।·········তাঁহার সঙ্গে প্রতি আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতি শরীরের পুরস্বামী, তিনি প্রতিজনের গৃহ দেবতা। আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার স্বসা; ঈশ্বরও সেইরূপ আমার ঈশ্বব, তিনি আমাব হৃদয়েশ্বর।'

পুরোপুরি অদ্বৈততত্ত্বে আস্থা স্থাপন করেন নি দেবেন্দ্রনাথ। সম্পূর্ণ অদ্বৈত মতে মুক্তি একেবারে কৈবল্যমুক্তি হয়ে দাঁড়ায। তাতে ব্যক্তিব স্বাধীন কর্তৃত্ব ও ক্রমিক উন্নতির অবকাশ থাকে না। দেবেন্দ্রনাথের আত্মার উন্নতির ধারণায় হেগেলেব ডায়ালেক্‌টিক্‌সের প্রভাব ছিল। তিনি লিখেছিলেন[৪]:

অতএব ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি ব্রহ্মেতে লয় হওযা নহে, ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি আত্মাব অনন্তকালের উন্নতি।

ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কর্তৃত্ব সম্পর্কে তাঁর ধারণায় কান্টের প্রভাবও আছে[৫]:

আমাদের ইচ্ছা কখনো তাঁহাব মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামিনী হয়, কখনও বা বিরোধিনী হয়।·· এই স্বাধীনতা শক্তি মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের এক অমূল্য দান।···আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্বস্ব দান করি, আমারদিগকে স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায় এই। এ স্থলে অনুরোধ, ভয়, বাধ্যতা এ সকল কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে প্রীতি করি তিনি এই চাহেন।

শেষ পর্যন্ত অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈতসাধনা এমন একটা মতবাদ দেবেন্দ্রনাথের ধারণায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জগৎ ও মানুষের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি বলেছিলেন[৬]:

'সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ; কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টিব সৌন্দর্যে, মানুষেব মুখশ্রীতে, ধার্মিকের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রভাবের প্রতিরূপমাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে।'

কিন্তু আত্মা ঈশ্বরের নির্দেশ মানতে পারে একমাত্র প্রেম ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে। এবং এই প্রেম ও সৌন্দর্যকে ঈশ্বরানুভূতির উপায় হিসাবে ধরে নিয়ে তিনি কান্টের Rigorism-কে খানিকটা পরিবর্তিত করলেন। Rigorism

এবং Hedonism এই দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নিরাসক্ত কার্য পদ্ধতি বলে দিলেন। এবং যে পরিমাণে ওই প্রেম ও সৌন্দর্যের সঙ্গে ঈশ্বর সাধনাব ক্ষেত্রে অহং যুক্ত হলো, ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে স্থান দেওয়া হলো,—সেই পরিমাণেই দেবেন্দ্রনাথ শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, মানুষের ভাবাবেগমুক্তির পথকে সহজ করে নিয়ে নতুন যুগলক্ষণকে ফুটিয়ে তুললেন।

রুশো, কাণ্ট এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে নতুন প্রকৃতি-দৃষ্টির উদ্বোধন করলেন সে দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথেব মধ্যেও স্পষ্ট দেখা গেল[৭] :

> ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসেব সমাগমে বসন্তেব দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্রমুকুলের গন্ধে সদ্যপ্রস্ফুটিত লেবুফুলেব গন্ধ মিশ্রিত কবিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিঃশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসাব সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সবারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি কবিয়া চকিতেব মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল।

এই নতুন আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-দৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কবা যাবে।

দেবেন্দ্রনাথ যে নতুন ধর্মনীতির সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে হৃদয় ছিল, ভক্তি ছিল। কিছু পরেই রামকৃষ্ণদেব ও কেশবচন্দ্র সেন যে ধর্মান্দোলন আবম্ভ করলেন তা-ও হৃদয়েব ভক্তিকে অবলম্বন করেই। ব্যক্তিত্ববোধের কথা আগেই বলেছি, তার সঙ্গে এল নব্য হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যেব প্রতি মোহ।

এই বকম প্রেম-সৌন্দর্যেব পথে ব্যক্তিমনের প্রকাশ মহাকাব্যের বিষয় হতে পারে না, metrical romance-এরও না। খণ্ড-কবিতাতেই ব্যক্তি হৃদয়ের মৌহূর্তিক আবেগগুলিকে বেঁধে রাখা সম্ভব। বামমোহন প্রার্থনাব ব্যাপারে গানের প্রচলন কবেছিলেন। মহর্ষির উৎসাহে এই চলন আরও বৃদ্ধি পেল। মহর্ষি নিজে এবং আনন্দচন্দ্র মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসংগীত রচনা করে লিরিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। বিহারীলালের গানে ও কাব্যে অন্তর্দৃষ্টির ছাপ পড়েছিল রীতিমতো। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতি—তিন ব্যাপারেই বিহাবীলাল গভীর ভাবে অন্তর্মুখীন হতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় অন্তর্মুখীনতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে।

নবীনচন্দ্রের প্রেম কবিতাগুলির প্রণয়োচ্ছ্বাসের উৎস খুব গভীরে নেই, কবিতাগুলি ক্ষণিক উত্তেজনায় সৃষ্ট। প্রকৃতি-দৃষ্টিতেও তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতায় ছাপ পড়েনি।

কাজেই সৃষ্টিশীল বাঙালী কবিগোষ্ঠী সার্থক গীতিকবির অপেক্ষা করছিলেন। আর বাঙলাদেশের সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকেই নিজের পথ চিনেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই আমরা পড়েছি[৮]:

> এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধ হৃদয়ে লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখনো কখনো রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণ করিতেছেন। এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐসকল কবিদের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে।

এর কিছু আগেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন[৯]:

> গীতিকাব্য যেমন প্রাচীন কালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতিলাভ করিবে।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মালেন [১৮৬১] তখন 'বাঙালি একশো বছর ইংরেজ বানিয়া, স্কুল মাস্টার ও খৃষ্টান পাদরীদের ছোঁয়াচ পাওয়া নতুন মানুষ।' কৈশোর ও যৌবনের অপরিণত কল্পনার অরণ্যে একেই তো রবীন্দ্রনাথের কবিমন দিশাহারা, তার ওপর সেই দিশাহারা ভাব আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ইংরিজি শিক্ষা ও আদর্শ। খুব নিরপেক্ষভাবে কবি পরিণত বয়সে এই প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তখন ইংরিজি সাহিত্যের অসংযমের দিকটাই তাঁকে নাড়া দিয়েছিল বেশি[১০]:

> এ সাহিত্যে ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না— মানুষ আপনার হৃদয়বৃত্তিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এই জন্যই এই সাহিত্যে প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা, প্রাচুর্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির সুর আমাদের এই অত্যন্ত শিষ্ট সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘুম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলই আচারের

ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধ লীলার দীপক রাগিণীতে আমাদের চমক লাগিয়া গিয়াছিল।

বাঙলা সাহিত্যে রুচি ও চিন্তার অভাব যেমন ছিল [যে অভাবের তাড়না কিছু পূর্বে রঙ্গলালকে অনিবার্যভাবে ইংরিজি কাব্য-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল], তেমনি এই হৃদয়াবেগের অভাবটাও ছিল বড় বেশী। রুচি ও ভাবনার উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ক্রমশঃ তখনকার বাঙালী কবিরা রোমান্টিক আন্দোলনের প্রচণ্ড শক্তির (furious egoism) দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-সময় সেই অভিভবের কাল। উদ্ধৃত অংশের ঠিক পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন[১১] :

> আমাদের সমাজ, আমাদের ছোট ছোট কর্মক্ষেত্র এমন সবল নিতান্ত একঘেয়ে বেড়ার মধ্যে ঘেরা যে সেখানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না, সমস্তই যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ, এই জন্যই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের, এই বেগ ও রুদ্রতা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল যাহা আমাদের হৃদয় স্বভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্য-কলার সৌন্দর্য আমাদিগকে যে সুখ দেয় ইহা সে সুখ নহে, ইহা অত্যন্ত স্থিরত্বের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই সুখ, তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাঁক উঠিয়া পড়ে সেও স্বীকার।

এই 'হৃদয়ের ঝড়ঝাপটে'র ফলে যে শ্রেণীর মানুষের মনের জানলা খুলে গিয়েছিল তাঁরা হলেন রোম্যান্টিকতাপ্রবণ মানুষ। এখানে রবীন্দ্রনাথ নিজের ঐতিহ্যধারার ভালোমন্দ উভয় দিকের কথাই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বর্ষেই মধুসূদনের 'আত্মবিলাপে' যার সূচনা, বিহারীলাল, অক্ষয় চৌধুরী ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে যার উন্মাদনা এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যার সঠিক চরিত্র— সেই রিলিক ধারার কথাই তিনি এখানে বলেছেন। ফলে শেক্‌স্‌পিয়রের যুগের দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছেন, আতিশয্যে উত্তেজিত হয়েছেন এবং তার প্রায় দুশো বছর পরেকার 'ফরাসী বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতাল'-এর সময়কার কবি বায়রন তাঁদের বশ করেছেন, শেলি কীটসের কাব্যকলা থেকে আবেগটুকু নিয়েছেন তাঁরা, কীট্‌সের সংযম সাধনার কথা তাঁদের কাছে আমল পায়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রোম্যান্টিক বাঙলা কবিতার সূচনা ও পরিণতির ধারায় মধুসূদনের মহাকাব্যের সংযত-সজ্জার মধ্যেও গীতিকবিতার সুরের

আমেজে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু সংযম ধাতে বলেই সনেটের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর। আর ফর্ম-সচেতন কবি রবীন্দ্রনাথ শৈশবে ও যৌবনে উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য কাটাতে না পারলেও পরবর্তীকালে তা কাটিয়ে উঠেছেন। মানসী-সোনার তরী-পর্বের ঠিক পরেই উচ্ছ্বাস কেটে গেছে তাঁর রচনায়। এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই সংযম সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল[১২]:

> আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজি-সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিতেছে। য়ুরোপের যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যকলার মর্যাদা সংযমের সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সে সাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এই জন্যই সাহিত্য রচনার রীতি ও লক্ষ্যটি এখনো আমরা ভালো করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

এই সংযমের সাধনা মাইকেল করেছিলেন। কিন্তু মহাকাব্যের পাঠ, চর্চা ও রচনাতেই তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। ইংরিজি কবিতার লেখক রোম্যান্টিকদের ভক্ত মাইকেলকে আমরা বাঙলা ভাষার কবি হিসাবে পাইনি। বিহারীলাল ও অক্ষয় চৌধুরীর মধ্যে এই সংযমের অভাব ছিল, তাঁদের আতিশয্য রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে মুগ্ধ করলেও পরে পীড়িত করেছিল। ইংরিজি সাহিত্যের এই উত্তেজনাকে যিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম সঞ্চার করেছিলেন সেই অক্ষয় চৌধুরীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্বীকার করেছিলেন যে, সে হৃদয়াবেগের মধ্যে স্থূল-সূক্ষ্ম বাছবিচার ছিল না। অক্ষয় চৌধুরী যখন বিভোর হয়ে ইংরিজি কাব্য আওড়াতেন তখন তার মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের দাহ—এ সমস্তের মধ্যে যে আতিশয্য আছে তাই ইংরিজি সাহিত্যের সার বলে তখন রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন। অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকেই চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় থেকেই চ্যাটার্টন হবার চেষ্টা করছিলেন। তা ছাড়া কবিগানের ওপরেও অক্ষয় চৌধুরীর বিশেষ টান ছিল। তার প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব সঙ্গীতে'র কয়েকটি কবিতায় পড়েছে। পার্নেলের 'দি হার্মিট' কাব্যের অনুসরণে অক্ষয় চৌধুরী 'উদাসিনী' (১৮৭৪) নামে যে গাথাকাব্য লিখেছিলেন, তার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বনফুল',

'কবিকাহিনী', 'ভগ্ন হৃদয়'। এই তিন গাথাকাব্যের উচ্ছ্বাসের মূলে আছে অক্ষয় চৌধুরীর উদ্দীপনরসের ঝোঁক।

পিতার সঙ্গে হিমালয়ে থাকতে পিতার কাছ থেকে নিয়মিত সংস্কৃত, ইংরিজি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ নিতে হতো রবীন্দ্রনাথকে। হিমালয় থেকে ফিরে এসে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে 'ম্যাকবেথ' নাটক পড়ে বাঙলা ছন্দে তার অনুবাদ (১৮৭৪) করেন তিনি। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন 'বনফুল কাব্য' 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হচ্ছে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' ও 'দুঃখসঙ্গিনী' এই তিনটি কাব্যের সমালোচনা করেন। এই তাঁর প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা। পনের বছরের বালকের তখন এপিক ও লিরিক সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট। পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যগুলির সঙ্গে তখন পরিচয় হয়ে গেছে। শেকস্‌পিয়ারের অন্যান্য নাটক ও রোম্যান্টিক কাব্য, টমাস মূরের Lalla Rookh ও Irish Melodies, ওড, সনেট প্রভৃতি কাব্যকৌশল সবই তাঁর আয়ত্তে। রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন 'কালমৃগয়া', 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রবিচ্ছায়া' 'মায়ার খেলা'র অন্তর্গত অনেকগুলি গানের সুর Irish Melodies-এর সুরচ্ছায়ায় লেখা। পরের বছর 'ভারতী'তে প্রকাশিত হলো তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা। এই লেখাটিতে বোঝা গেল এই বয়সে দেশী-বিদেশী সাহিত্যে তাঁর রীতিমতো অধিকার এসে গেছে। [এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। 'এক্ষণ', জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যা, ১৯৬৭। রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্য ছাড়া হোমারের মহাকাব্য, দান্তের মহাকাব্য, মিল্টনের মহাকাব্য এবং শেকস্‌পিয়ার ছাড়া অন্যান্য কয়েকখানি ট্র্যাজিডির সঙ্গে এই সময় তাঁর পরিচয় হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।]

এরপর স্থির হয়, ব্যারিস্টারি পড়তে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাবেন। তার আগে তাঁকে পাঠানো হলো আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ইংরিজি চর্চার জন্য। 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি থেকে এই সময়কার পড়াশোনার প্রমাণ পাওয়া যায়:

> মেজদাকে বলিলাম, 'আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনিয়া দিন।' তিনি আমার সম্মুখে টেন প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার বিচার মাত্র না করিয়া অভিধান

খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি অ্যাংলো স্যাক্‌সন ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলিও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি।

বোম্বাই-এর পাণ্ডুরং পরিবারের সঙ্গে থেকেও রবীন্দ্রনাথের বিলিতি রুচির চর্চা হয়েছিল বিলাত যাবার আগে। এই সময়ে ভারতীতে যে প্রবন্ধগুলির কথা উল্লেখ কবি করেছেন সেগুলি সমস্তই বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে :

১. স্যাক্‌সনজাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য, শ্রাবণ ১২৮৫।

২. বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য, ভাদ্র, ১২৮৫।

৩. পিত্রার্কা ও লরা, ১২৮৫।

৪. গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ, কার্তিক, ১২৮৫।

৫. নর্মান জাতি ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য, ফাল্গুন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬।

৬. ইংরাজদিগের আদবকায়দা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫।

৭. চ্যাটার্টন ও বালক কবি, আষাঢ়, ১২৮৬।

এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ দান্তের অন্যান্য অংশ অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটি সনেটের অনুবাদও করেছিলেন। এটি দান্তের Vita Nova র প্রথম সনেট। এখানে অনুবাদটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করছি :

প্রেমবন্দী-হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সঙ্গীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন মোরে অর্থ কি ইহার।
যে কালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থভাগ হয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হোলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয়প্রদেশ।
দেখে মনে হোল যেন প্রফুল্ল আনন,
মোর হৃদ্‌পিণ্ড রহে করতলে তাঁর,
বাহু 'পরে শান্তভাবে করিয়া শয়ন

ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমেব আদেশে
সভয়ে জলন্ত হৃদি করিলা আহার!
তারপরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ আকার।

সনেটেব চতুর্দশ পংক্তির বন্ধন এক্ষেত্রে মানা হয় নি। আর একটি প্রবন্ধের মধ্যে অনুবাদ অংশে লিখছেন :

তুমি মোবে ভালবাস যদি
ওই অধবেব শুধু একটি চুম্বন মধু
হবে মোবে দুখেব ওষধি।

এই সব অনুবাদেব মধ্য দিয়ে খাঁটি রোম্যান্টিক প্রেমকবিতার ভাষা তৈরি হচ্ছিল। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি পেত্রার্কের একটি সনেট অনুবাদ কবেছিলেন শেক্স্‌পিবীয় সনেটেব আদর্শে :

হাবে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন,
সুখঋতু অকালে গাহিছিস গীত।
ফুবাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুবাইছে দিন,
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!
ওরে বিহঙ্গম তুই দুখ গান গাস
যদি জানিতিস কি যে দহিছে এ প্রাণ
তাহলে এ বক্ষে আসি কবিতিস বাস
এব সাথে মিশাতিস বিষাদেব গান॥
কিন্তু জানি না তোব কিসের বিষাদ,
ভ্রমিস রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়ত সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!
সুখদুঃখ চিন্তাআশ যা কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত!

এই সব কবিতার নতুন গঠিত ভাব—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমের অতৃপ্তি ও তার জন্য বিষাদ এবং তার উপযুক্ত ভাষা, এই সময়েই কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তৈরি হয়ে গিয়ে, 'কড়ি ও কোমলে'র কবির পথ করে দিয়েছে।

এই সময়েই শৈশব সঙ্গীতের কতকগুলি গান লেখা হয়। 'গোলাপফুল ফুটিয়ে আছে', 'দেখে যা দেখে যা', 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি', 'বলি ও আমার গোলাপবালা' ইত্যাদি গানগুলিতে আইরিশ মেলডিজের অনুসরণ আছে।

২

১৮৭৮-এ সেপ্টেম্বরে কবি বিলাত গেলেন। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে তিনি ব্রাইটনে যান এবং সেখানে একটি স্কুলে ভর্তি হন। পরে লণ্ডনে এসে যখন রিজেন্ট পার্কে থাকতেন তখন তাঁকে ল্যাটিন শেখাবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। তারপরে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চার মাস পড়েন। সে সময় ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি মর্লির অধ্যাপনা পদ্ধতিতে তিনি মুগ্ধ হন। বিলাত যাবার আগেই ভারতীতে যে 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হচ্ছিল তা পরের বছর প্রকাশিত হলো।

'কবিকাহিনীর' আখ্যায়িকার মধ্যে শেলির 'অ্যালাস্টারে'র [Alastor] প্রভাব আছে। কিছু আগেই 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় অ্যালাস্টারের গল্পকাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। 'অবোধবন্ধু'র পাঠক রবীন্দ্রনাথ সেখানে শেলির বিষাদ-রসকে পেয়েছিলেন, শান্ত রসকে খুঁজে পাননি। 'Alastor or the Spirit of Solitude'-এ নির্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে আত্মরতি যেমন শেলিকে পেয়ে বসেছিল তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও। অ্যালাস্টার সম্পর্কে সমালোচক বলছেন[১৩] :

> What the poem actually conveys, none the less, is entranced self-absorption, and although the poet dies, beautifully worn out, it seems obvious that Shelley found it an intoxicatingly lovely death, enjoying in it a refined from of the ordinary death-bed fantasy of the self-preoccupied.

যে কবির কাছে 'প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত' সে কবি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হলেন, অবশেষে মরণের মধুর নেশায় আত্মবিলীন হলেন। অ্যালাস্টারের সেই beautifully worn out অবস্থাকে আমরা 'কবিকাহিনী'র নায়কের মধ্যে দেখতে পেলুম :

জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির।
সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা,
ক্রমশঃ মিলায়ে আসে রবিব কিরণে,
তেমনি ফুবায়ে এল কবির জীবন।

এ কাব্যে বিশ্বপ্রেমের আমদানিও পাশ্চাত্ত্য কাব্যপাঠের ফল। বৃদ্ধ কবিকে আমরা দেখেছি :

সমস্ত ধরাব তলে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবিব নেত্র কবিল পূর্ণিত।
যথা সে হিমাদ্রি হতে ঝবিয়া ঝবিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্বর।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবিব হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়।

সে সময় বিশ্বপ্রেমেব সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ ছিল টেনিসনের 'ইন মেমোয়িয়াম'। এছাড়া দেশপ্রেমচেতনার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে :

সবল সে দুর্বলেবে পীড়িতে কেবল
দুর্বল বলেব পদে আত্মবিসর্জিতে।

তাই কবির প্রার্থনা :

এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত।
কবে দেব, এ বজনী হবে অবসান ?
নাহিক দবিদ্র ধনী, অধিপতি প্রজা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কাবো দাস।

এই প্রার্থনায় রোম্যান্টিকদের great age, নতুন গ্রীসের স্বপ্নবিলাসের প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়।

'কবিকাহিনী' রচনার আগে এবং পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'প্রলাপ' নামে কবিতাগুচ্ছ ও 'বনফুল' নামে কাব্য। 'কবিকাহিনী'র পর সেগুলি ছাপা হলো (১৮৮০)। বনফুলের প্লটে অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের প্রভাব আছে এবং 'উদাসিনী',—আগেই বলেছি,

'হি হার্মিটে'র ভাবানুসরণ। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক গাথাকাব্যের যুগ। যাই হোক 'বনফুলে'র মধ্যে আমরা রোম্যান্টিক কবিদের খুবই প্রিয় প্রতীক বিষাদিনীকে দেখেছি :

এলো এলো চুলে ফিরিব বনে
রুখো রুখো চুল উড়িবে বায়ে।

কখনো কখনো রোম্যান্টিকদের উপমাও পেয়েছি। হাল ভেঙ্গে যে নাবিক-কবি দিশাহারা হয়ে তীর দেখতে পান বা তীরের স্বপ্ন দেখেন সেই Prelude এর কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপমার মতো। রোম্যান্টিক মনের পক্ষে এ উপমা দেওয়া স্বাভাবিক :

সাগরের মাঝে তরণী হতে
দূর হতে যথা নাবিক যত
পায় দেখিবারে সাগরের ধারে
মেঘলা মেঘলা ছায়ার মত।

পরে জীবনানন্দ দাশের মধ্যেও এই উপমা একটু পরিবর্তিতরূপে আমরা পেয়েছি।

কিছু পরেই (১২৮৮, আষাঢ়) 'গোলামচোর' প্রবন্ধে সামাজিক বিবাহের প্রতি যে কটাক্ষ কবি করেছিলেন রোম্যান্টিকদের মতো, তারই আভাস পাচ্ছি কমলার উক্তিতে :

বিবাহ কাহারে বলে জানিতে চাহিনা
তাহারে বাসিব ভাল, ভালবাসি যারে
তাহারই ভালোবাসা করিব কামনা
যে মোরে বাসে না ভাল ভালবাসি যারে।

পরবর্তী কাব্য 'ভগ্ন হৃদয়' রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম গাথাকাব্য। নাটকের আকারে লেখা হলেও এ কাব্য রোম্যান্টিকদের লিরিক্যাল ড্রামার মতো। নলিনী চরিত্রটির মধ্যে ইয়োরোপীয়ান সমাজের প্রভাব আছে। 'রুদ্রচণ্ড' নাটিকা হলেও প্রকৃত পক্ষে গাথাকাব্যের সগোত্র, 'ভগ্নহৃদয়ে'র তুলনায় নাটকীয়তার প্রকোপও কিছু বেশী। এই সময়ে আরও কতকগুলি ছোট ছোট গাথাকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি পরে 'শৈশবসঙ্গীতে' (১৮৮৪) সংকলিত হয়। এর মধ্যে 'প্রতিশোধ' নামক গাথাটিতে হ্যামলেটের ছায়া আছে। সেখানে হ্যামলেটের মতোই কুমারের পিতার প্রেতাত্মা এসে কুমারকে পিতার হত্যাকারীর বিরুদ্ধে

প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়েছে। রূপকগাথা 'ফুলবালা'র কিশোর-কিশোরীর প্রেমের কাহিনী 'পৌল বর্জিনী'র স্মৃতিবহ।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলন 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে পড়েছিলেন। তার মধ্যেকার বৈষ্ণব কবিতাগুলির ভাষার সমগ্র অর্থোদ্ধার করা কবির পক্ষে সম্ভব না হলেও তার শব্দ ও ছন্দোরহস্য এবং প্রাচীনত্বের মোহ কবিকে পেয়ে বসেছিল। ইতিমধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর কাছে তিনি টমাস চ্যাটার্টটনের রচিত এবং 'T Rowley' ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রাচীন ইংরেজ কবিদের অনুকৃত জাল কবিতার কথা শুনেছিলেন। কবি লিখছেন, 'কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র এই হলো জন্মরহস্য (পুস্তকাকারে ১৮৮৪)। ১২৮৪ সালের 'ভারতী'তে কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

গাথাকাব্যের পালা শেষ করে কবি ধরা পড়লেন নিজেরই অস্ফুট বাসনার জালে। ড সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন[১৪]:

> সৃষ্টিসম্ভাবনার ব্যাকুলতা নবযৌবনের অব্যক্ত বেদনার সহিত মিলিত হইয়া কবিমানসকে সঙ্কুচিত, প্রকাশ-ভীরু ও স্পর্শকাতর করিয়াছিল। অন্তরঙ্গবন্ধনের গুটি কাটিয়া বাহির হইবার বেদনাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র অধিকাংশ কবিতায় গুঞ্জরিত।

আরও বলেছেন:

> নবযৌবন বেদনায় প্রেমের যে অব্যক্ত তাড়না আছে তাহা আত্মনিপীড়নের মধ্যে স্বস্তি খোঁজে।

তাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' (১৮৮২) কবি প্রাণের সঙ্গী হিসাবে দুঃখকে আহ্বান জানালেন। গাথা কাহিনী নয়, সৌন্দর্যের সুদীর্ঘ মঙ্গল গান নয়, 'অবকাশ রঞ্জিনী'র মতো প্রণয়োচ্ছ্বসিত পদ্যও নয়, নির্বস্তুক ভাবের খণ্ড খণ্ড রক্তাক্ত কাব্যরূপ। বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে এ একেবারেই নতুন জিনিষ। কবি নিজেই বলেছেন[১৫]:

> সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতার থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।

কবিতাগুলি বিশিষ্ট কলা মাত্রিক রীতিরই নানা ভঙ্গিময় প্রকাশ; কাজেই সে হিসাবে ছন্দ নতুন নয়। এখানে 'ছন্দ' বলতে কবি সাধারণ ভাবে কাব্যরূপ বুঝিয়েছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিষয়বস্তু ও তার কাব্যরূপ বাঙলা কাব্যের নতুন

দিগন্ত খুলে দিল। জড় ও অচেতনকে চেতনবস্তুর ক্রিয়াকলাপে সঞ্জীবিত করে, নির্বস্তুক ভাবকে মানবিক রূপ দিয়ে এমন এক অনাস্বাদিত জগৎকে সৃষ্টি করলেন, যাতে মনে হলো যেন এক পদক্ষেপেই বাঙলা কাব্য আধুনিক লিরিক কাব্যের যুগে পদার্পণ করলো। কবিচিত্ত পথিকের প্রবাসী হৃদয়ের অতৃপ্তি, পরিবেশের ব্যাপ্তি ও বিজনতা, ভালোবাসার অস্ফুট রূপ, প্রিয়তমার কেশ-এলানো দূরাগত রূপাভাস ও কণ্ঠস্বর, মৃত্যুর প্রতি অকারণ আসক্তি, দুঃখের বন্দনা ও দুঃখ ভোগের শ্রান্তি ও শান্তি-কামনা—সমস্ত রোম্যান্টিক লক্ষণই ফুটে উঠলো এ কাব্যে। অনেকে শেলি কীট্‌সের কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে বা কোনো কোনো কবিতার ইমেজের সঙ্গে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মিল খুঁজে পেয়েছেন। তা যদি প্রভাব হয় তাহলে কয়েকটি প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সুনীলচন্দ্র সরকার মন্তব্য করেছেন[১৬]:

> 'তারপর কিন্তু এমন একটা গহন সাইকোলজির অস্পষ্ট লোকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও বিবরণ যা শেলিযান নয়, ব্রাউনিঙের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও এর চেয়ে অনেক স্পষ্ট লোক-জীবন-জগতের। এইভাবে নিজের গহন ও গোপন মনস্তত্ত্বকে কবিতায় উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো অনেকটা মনে হয় গ্যেটের হ্বার্থারের প্রভাবে—ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বোদলেয়ারের দান। ··· বোদলেয়ারের 'Evening Twilight', 'Evening Harmony', 'I adore you as much as the Vault of Night'—প্রভৃতি কবিতায় সন্ধ্যার অস্পষ্ট লোকের যেমন একটা ছবি, কবি হৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন একটা দুর্লক্ষ্য বিষাদের সুর এবং বিষাদকেই উগ্রমধুর কোন বিষফলের মত আস্বাদন করার যেমন আগ্রহ তারই আভাস পাই এই কবিতায় এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র আরও অনেক কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক, হৃদয়ের শিরা-ছেঁড়া রক্ত, হলাহল পানের উগ্র উত্তেজনা ইত্যাদি যা 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' ছড়িয়ে আছে, তা বোদলেয়রের মূল মনোভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত একথা স্বীকার করলেই তবে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র জন্মরহস্য ধরা পড়ে। যেমন ভানুসিংহের দু'একটা শ্রেষ্ঠ কবিতায় মোটামুটি একটা প্রভাবের পরিমণ্ডলে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সুরের প্রকাশ, তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' বোদলেয়ারের আদর্শে কবির আত্মকথা ও অতিসত্য অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি। এই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন 'বাংলার শেলি' হিসাবে। 'সন্ধ্যা' কবিতার উপমার দ্রুত

পরিবর্তন ও এক ধরণের সূক্ষ্ম sensitiveness-এর প্রকাশ এই তুলনার কারণ। কিন্তু সমস্ত 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যটি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে, কবি বাংলা সাহিত্যকে সমসময়িক ইওরোপীয় সাহিত্যের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া-মণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর কাব্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বোদলেয়ারের সূত্রের কতকটা সার্থক প্রয়োগ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ বোদল্যেরের এই প্রভাবের সম্পর্কে সচেতন হলেন কোন্ সময়ে?

সুনীলচন্দ্র সরকার অনুমান করেছেন[১৬]:

> বিলাতবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ যে এই কবির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পাবে না।

কিন্তু দেশে থাকতেই বোদল্যেরের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ঠাকুরবাড়িতে ফরাসী চর্চার আবহাওয়া তো ছিলই এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের পূর্ব থেকেই ছিল। প্রিয়নাথ ছিলেন বোদল্যেরের ভক্ত। পরবর্তীকালের 'কাব্যকথা' প্রবন্ধে ও 'মানসী'-কাব্যের আলোচনায় বোদল্যেরের সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার পর এই জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছিলেন[১৭]:

> তৎপূর্বে 'ভগ্নহৃদয়' পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম।

অবশ্য তবু সন্দেহ থেকে যায়। কারণ 'ভগ্নহৃদয়' রচনার পর যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' লিখছিলেন ঠিক সেই সময় প্রিয়নাথ বোদল্যের পড়েছিলেন কিনা জানা নেই। কারণ প্রিয়নাথের যে সব রচনায় বোদল্যের-প্রসঙ্গ এসেছে সেগুলি সবই উনিশ শতকের শেষ দশকে [বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রমথ চৌধুরীর সংগ্রহে বোদল্যেরের Les Fleurs du Mal রয়েছে। কিন্তু সে বই অক্সফোর্ডে কেনা, ১৮৯৪ সালে] অথবা বিংশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকে লেখা।

যা হোক, সন্ধ্যাসঙ্গীতের এই জগৎকে রবীন্দ্রকাব্যে আর দ্বিতীয়বার পাই না। এ হলো সেই জগৎ, যেখানে:

> ..... and aching pleasure nigh,
> Truning to poison while the beemouth sips.

কবি বলেছেন :

প্রাণের মর্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে
তুই হাতে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদসম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
ভাঙে তো ভাঙিবে বাদ্য, ছেঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী—
নে রে তবে তুলে নে রে, সবলে বাজায়ে দে রে
নিতান্ত উন্মাদসম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্।
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়ে
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গণি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়—
দুঃখ তুই আয় তুই আয়। ।দুঃখ-আবাহন।

অন্যত্র বলছেন :

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে।
কে জানে কেন সে গান গায়
গলি' সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে
প্রতিধ্বনি কবে হায় হায়। ।হৃদয়ের গীতিধ্বনি।

এই কণ্ঠস্বর যুদ্ধোত্তর বাঙলা কাব্যেব পূর্বে আর শোনা যায় নি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিপবিণতি কতখানি, সে সম্পর্কে সুনীলচন্দ্র সরকারের সুচিন্তিত মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

ইওরোপীয় প্রভাবের মধ্যে তখনকার যুগের সুবিখ্যাত টেনিসনের পরিমার্জিত ভাষা ভাব ও শিল্প চেষ্টার প্রভাব রবীন্দ্রনাথে অতি অল্পই। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলি, কীট্সের প্রভাবের ফল তাঁর জীবনে ফুটেছে আরও পরে। এবং তিনি বোদলেয়ারের মধ্যে পেয়েছেন তীক্ষ্ণতা, একটা একাগ্র সন্ধানের তন্ময়তা। আধুনিক কবির গ্রহণযোগ্য চারটি প্রস্থান পথের কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে; যথা—১. অনাসক্ত জ্ঞানানন্দ ও জীবনানন্দ, ২. রূপ ও প্রেমের জগতের অনুবর্তী আদর্শায়ন, ৩. আধ্যাত্মিক রূপায়ণ ও ৪. আংশিক কবিমানসের খণ্ডিত ক্ষমতার

ও প্রস্থান পথের ব্যবহারে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় তীক্ষ্ণ ও অনাবিষ্কৃত উপলব্ধি লাভ। এর মধ্যে যে পথটি স্বভাবতই রবীন্দ্রচরিত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সেই চতুর্থ পথটিই তিনি ঘটনাচক্রে ও বোদলেয়ারের প্রভাবে ব্যবহার করেছেন সন্ধ্যাসঙ্গীতে। এর দ্বারা জেনেছেন এ পথ তাঁর নয় এবং একটা খোলা আকাশ, মুক্ত জীবনের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন স্থায়ীভাবে। তৃতীয় পন্থা, রূপলোক সৃষ্টির প্রয়াস এখনো অনাগত। কিন্তু প্রথম দুটি পথে তাঁর স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকেই আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর অন্তর্জীবনের একটি কঠিন দ্বন্দ্ব এসে এই প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে তাঁর পথ ঐ বিরাট বিশ্ব, ঐ বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের পথ। অবশ্য বিশ্বমানবের আইডিয়াটা এবং বিশ্বপ্রকৃতিরও, তাঁর সারা জীবন ধরে বিবর্তিত হয়েছে। আর এছাড়া এও প্রমাণিত হলো যে, দ্বিতীয় সূত্রেও তাঁর নিঃসন্দেহ অধিকার, জীবনরস ক্ষুণ্ণ না করেও আধ্যাত্মিক রসের কাব্যিক ব্যবহারে তাঁর সাধনালব্ধ দক্ষতা যা বাংলার বা সমসাময়িক ইওরোপেরও কোন কবির মধ্যে ছিল না।

বোদলেয়রের প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহ থেকে গেলেও 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র বিশিষ্টতাটি যে এই মন্তব্যে চমৎকার ভাবে প্রকাশিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'প্রভাতসঙ্গীতে'র (১৮৮৩) প্রথম কবিতায় কবি বলেছিলেন :

আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মতো।

প্রভাতসঙ্গীতে সেই রুগীর ঘরে আলো এসে পড়লো। সে আলো রূপ ও প্রেমের জগতের আলো। হঠাৎ এই আলোর ঝলকে সমস্ত রুগ্‌ণতা কেটে গেল। পৃথিবী নতুন রূপে দেখা দিল। চোখের সামনে থেকে যেন 'সাম্প্রতের আবরণ গেল দ্রুত খসি'। এই আবরণ উন্মোচনের পিছনে রোম্যান্টিক কবিদের দৃষ্টি যে প্রেরণাস্থল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। যিনি বাঙলা কাব্যে রোম্যান্টি-সিজম্‌কে পরিণত রূপ দেবেন তাঁর পক্ষে কেবল রোম্যান্টিক প্রবণতা ও রোম্যান্টিক কাব্যচর্চাই বড় কথা নয়, সেগুলিকে অবলম্বন করে যতক্ষণ না তিনি ধ্যানস্থ হচ্ছেন, নতুন দৃষ্টিতে বিশ্বসংসার দেখতে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই। 'জীবনস্মৃতি'তে এই অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়[১৮] :

একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে

একটা আলোরকশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতে একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে ধারা আসিয়া দেশে-কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং প্রতিধ্বনি রূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ, আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ—'প্রতিধ্বনি' কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকে ও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

রোম্যান্টিসিজ্‌মের মূল ধর্মের যেন হুবহু প্রতিলিপি এই অংশটি। সমালোচক মন্তব্য করেছেন[১৯]:

> The most universal image is perhaps that of light, a fit symbol of spiritual illumination of the transcendental vision, of the work of the imagination or of the ideal to which the poet aspires. It takes many forms but the sun, moon, and stars are especially prominent because of their associations with heaven, their nature as permanent sources of light.

'প্রভাতসঙ্গীত' এই রবিকিরণেরই কাব্য। কবি বলছেন:

জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে
রবিকর নাচে তার পরে।

ইতিমধ্যে কিছু আগে থেকেই ১২৮৭-১২৮৮ সালের 'ভারতী'তে 'বাঙালি কবি নয় কেন', 'বাঙালি কবি নয়', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', 'যথার্থ দোসর', 'অকারণ কষ্ট', 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন', 'কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' ইত্যাদি প্রবন্ধে রোম্যান্টিক কবিদের কবিতা অনুবাদ করে ও উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বাঙলা কাব্যে রোম্যান্টিক মনকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শেলির অনুবাদ করলেন।

তারপর ম্যাথু আর্নল্ড, ও'সনেসির কবিতা অনুবাদ করলেন। ১২৮৮ আষাঢ় সংখ্যায় উগোর কবিতার অনুবাদ করলেন তিনি। 'প্রভাত সংগীতে' উগোর কবিতা স্থান পেয়েছে। পরে 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' রচনার সময় [১২৯১, শ্রাবণ] শেলি, মিসেস ব্রাউনিঙ, আর্নেস্ট মায়ার্স, অগস্টা ওয়েব্‌স্টার, পি. বি. মার্‌স্টন্‌, ভিক্‌তর উগো এবং অব্রে দ্য ভেব-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উগোর Les Contemplations (১৮৫৭) কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের যে অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং যেগুলি 'প্রভাত-সঙ্গীত' ও 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলি এই :

১। কবি [ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া]
Le poete sén Va dans les champs……

২। বিসর্জন [যে তোরে বাসেরে ভাল]
Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui ..

৩। তারা ও আঁখি [কাল সন্ধ্যাবেলা ধীবে সন্ধ্যার বাতাস]
Hier, le vent du soir, don't le soufflecaresse

৪। সূর্য ও ফুল [বিপুল মহিমায় আগ্নেয় কুসুম]
Par-dessns l'horizon aux collines brunies

৫। বেঁচেছিল হেসে হেসে
Il vivait, il jouait, riante creature·· ···

প্রথম চারটি 'প্রভাতসঙ্গীত' এবং শেষেবটি 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে স্থান পেয়েছে [এই তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সদনেব শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের কাছে আমি ঋণী]। লক্ষণীয় যে, প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানে প্রিয়নাথ প্রায়ই Les Contemplation-এর উল্লেখ করেছেন। মনে হয় সেই সূত্রেই এই বইটির সঙ্গে তাঁব পরিচয়। প্রমথ চৌধুবীর সংগ্রহে রক্ষিত উগোর রচনাবলীর ফারসী সংস্করণে মূল ফরাসীর পাশে পাশে পেন্সিলে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদের কয়েকটি পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথ ফবাসী জানতেন বলে তেমন কোনো দৃঢ় প্রমাণ নেই। মনে হয় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিংবা ফরাসী-জানা বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী বা প্রিয়নাথ সেন তাঁকে সাহায্য করে থাকবেন।

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ প্রচুর অনুবাদ ও আলোচনার মাধ্যমে রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই কাব্যের মধ্যে আনিতে চাইছিলেন এবং সে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মধ্যে

পুরোপুরি এসেও গিয়েছিল। কিন্তু কবির কথায়[20] 'কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল।' কেবল সেই রূপ ও প্রেমের জগৎ চোখ-ধাঁধানো আলোয় কবির সামনে উপস্থিত। কিন্তু ক্রমশঃ কবি সেই পরিণত দৃষ্টিরই আকাঙ্ক্ষা করেছেন, উন্মাদনাও কমে গেছে :

মনেতে সাধ যেদিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু, দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব। 'চেয়ে থাকা'।

এবং মনে হয়, কবিতার শরীরের বাঁধন দৃঢ় করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ফরাসী কাব্যচর্চা বা অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদে যে আত্মশাসন আসে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'প্রভাত সংগীতে' সেই যে আহ্বান শুনেছিলেন তারই প্রতিক্রিয়ার উল্লাস জাগলো 'ছবি ও গানে' (১৮৮৪)। কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যে অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা তাঁকে দগ্ধ করেছিল, 'প্রভাত সংগীতে' সেই অপ্রাপ্তির বেদনা তাঁকে বড় মধুর করে বাজলো :

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো। 'কে'?

কবি বলেছেন[21] : 'এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না।' এখন থেকে রূপের প্রতি তাঁর কিছুটা সজাগ দৃষ্টি, প্রেরণা হলো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলি-কীটস্‌। 'একাকিনী' ও 'পাগল' কবিতায় The Solitary Reaper-এর ছায়া পড়েছে মনে হয়। শৈশব জীবনের স্মৃতি-মন্থন, শিশুর প্রতি আকর্ষণ, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একাত্মতা, 'গ্রামে,' 'আদরিণী', 'খেলা', 'স্নেহময়ী' ইত্যাদি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। রূপের জগতে নবীন শৈশবদৃষ্টি রোম্যান্টিকদের অবদান। এ দৃষ্টি ব্লেকের Songs of Innocence and Experience থেকে শুরু হয়েছে। কবি বলেছেন :

আলোতে ছেলেতে ফুলে একসাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায়। 'ঘুম'।

অন্যত্র বলছেন :

তোমার হাসিটি লয়ে হরষে আকুল হয়ে
খেলা করে প্রভাতের আলো,
হাসিতে আলোটি পড়ে, আলোতে হাসিটি পড়ে
প্রভাত মধুর হয়ে গেল।
পরশি তোমার কায়, মধুর প্রভাত বায়,
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি-সুধা দাও এই দিক পানে চাও
প্রাণে হোক প্রভাত বিকাশ। 'স্নেহময়ী'।

শিশুর ঘুমের মধ্যে কবি দেখেছেন নয়ন মেলে অপরূপ বিস্ময়ের জগৎ দেখবার সম্ভাবনা :

কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উটিবে কুসুম,
ওদেবো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম। 'ঘুম'।

'To Sleep' কবিতায় ঠিক একই কারণে ঘুমের বন্দনা জানিয়েছেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ :

Come, blessed barrier between day and day,
Dear mother of fresh thoughts and joyous health.

যে রোম্যান্টিক বিষাদিণীকে আমরা তাঁর গাথাকাব্যে কোথাও কোথাও দেখেছি, 'ছবি ও গানে' সেই রূপ প্রায়ই ধরা দিয়েছে :

ক। পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
এত সোনা কে কোথা দেখেছে।
তার মাঝে মলিন মেয়েটি
কে যেন রে এঁকে রেখেছে। 'একাকিনী'।

খ। চুপ করে হেলে সে বকুল গাছে,
রমণী একেলা দাঁড়ায়ে আছে।
এলোথেলো চুলের মাঝে বিষাদমাখা সে মুখখানি
চাঁদের আলো পড়েছে তার 'পরে। 'বিদায়'।

'ছবি ও গানে'ই প্রকৃতির রূপের জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটন হলো। তার

মাধুর্য-প্রভাব কবিকে নেশা ধরিয়ে দিলে। কীট্‌সের প্রভাব কাজ করতে লাগলো পিছনে, মাঝে মাঝে তা স্পষ্টও হয়ে উঠলো :

যাই যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্‌খানে কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন মাঝে,
কোথা হয়ে যাই নিমগন।···
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে। 'পূর্ণিমায়'।

কবির এই নেশা কীট্‌সের Ode to a Nightingale-এর কথা স্মরণ করায়। বিশেষ ক'রে 'drowsy numbness', 'Fade far away, dissolve, and quite forget', 'Away ! away ! I fly to thee' ইত্যাদি অনুভবগুলি স্মরণীয়। মনে হয়, 'ছবি ও গানে'র রূপের জগতে এসে কবি যেন মনে মনে কীট্‌সের সঙ্গ অনুভব করেছেন। এই কবিতাতেই একটি বিশিষ্ট রোম্যান্টিক চিত্রকল্প দেখা দিয়েছে আরও মহৎ ব্যঞ্জনা নিয়ে। সাধারণত রোম্যান্টিক কবিকে নিঃসঙ্গ যাত্রী হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে দেখি [পরেও রবীন্দ্র-কাব্যে দেখা গেছে], এখানে সমগ্র বিশ্বজগৎ যেন নিঃসঙ্গ নৌ-যাত্রায় নিরুদ্দেশে ধাবিত :

গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও নব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান। ঐ।

কিন্তু রোম্যান্টিক আলোতে নতুন সুস্থ দৃষ্টি পেয়েও মাঝে মাঝে সেই পুরোনো রোগের যন্ত্রণা মাথা চাড়া দেয়। 'রাহুর প্রেমে' কবি বলেছেন :

বিশীর্ণ-কঙ্কাল চিরভিক্ষা সম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর,
দাও দাও বলে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়ন-লোর।...
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে,

'ছবি ও গান' রচনার পর কবির জীবনে সবচেয়ে প্রধান ঘটনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী বউ ঠাকুরাণীর মৃত্যু। কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হাওয়ায় পূর্ববর্তী কাব্যগুলির তুলনায় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের বিষয় বিচিত্র, ভাব সুস্পষ্ট, ভাষা দৃঢ়, ছন্দের মধ্যে নিবিড়তর মাধুর্য এসেছে। শোকের আঘাতে কবিচিত্ত নির্লিপ্ত হলো খানিকটা, দৃষ্টির মধ্যেকাব আসক্তি কমে গিয়ে আনন্দদৃষ্টি ফুটলো সংসার-চিত্রণে। জীবনেব সকল রসকে গ্রহণ করবার আকাজ্ক্ষা ও তার জন্য অতৃপ্তি, নিছক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রকৃতির মধ্যে তারই আভাস বাঙলা কাব্যে একেবারেই নতুন। এই নতুনত্বের উৎস সন্ধানে শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায় বিদেশী প্রভাবের ইঙ্গিত করেছেন। ফরাসী সাহিত্য-বিলাসী আশুতোষ চৌধুবী 'কড়ি ও কোমল'র কবিতাগুলিকে সাজাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ফরাসী কোনো কোনো কবিব ভাবের মিল কবিতাগুলির মধ্যে আছে। ভাবের মিল থেকে প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবু শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায়ের মত বিচারেব অপেক্ষা রাখে[২২] :

> আমরা আশুতোষের এই বিশ্লেষণ পড়ে আশ্চর্য হই না, আমাদের মনে হয় Toru Dutt অনূদিত A Sheaf gleaned in French Fields (1878) বইখানি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরী থেকে তিনি পেয়েছিলেন। এই বইখানিতে বহু সনেটের অনুবাদ আছে। ফরাসী সাহিত্যের সহিত কবির পরিচয় ঘটে পৌলবর্জিনীর বাংলা অনুবাদ মাধ্যমে। ইংরেজী সাহিত্যের যে ইতিহাস পড়েন তা ফরাসী সাহিত্যিক টেইনের লেখা। কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলির মধ্যে ফরাসী প্রভাব আছে কিনা এবং আমরা যে কারণ অনুমান করছি তা কতদূর প্রামাণ্য তা আমরা বলতে পারিনে। মোট কথা এর সুরের সঙ্গে পুরাতন বাংলা কবিতার যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ।

তরু দত্তের এই বইটির কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে আমরা 'কড়ি ও

কোমলে'র কিছু কবিতার ভাবের মিল দেখতে পাচ্ছি। জীবনের রসোপভোগের মোহমুক্ত আকাঙ্ক্ষার সমর্থন মনে হয় কবি এই বইটির কয়েকটি কবিতা থেকে পেয়েছিলেন। আমরা অংশত উদ্ধার করছি :

Oh Death, thou canst wait : leave me to dream;
And strike at the hearts where Despair is Supreme,
And shame hails thy dart as a boon !
For me, Pales has or bours unknow to the throngs,
The world has delights, the muses have songs,
I wish not to perish too soon,......
Should this song of my prison hereafter inspire
Some student with leisure her name to inquire,
This answer at least may be given,
That grace marked her figure, her action, her speech
And such as lived near her, blameless, might teach
That life is the best gift of heaven.

The Young Captive : Andre Chenier

এই কবিতাংশটির সঙ্গে 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সনেটের গভীর জীবন-রসিকতাব মিল পাচ্ছি :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসিঅশ্রুময়,
মানবের সুখেদুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো বাঁচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদের মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।

হাসি মুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

উদ্ধৃত দুটি কবিতার মধ্যে মিল আছে—জীবনের প্রতি অসক্তির জন্য মৃত্যুর প্রতি অনীহায়। কিন্তু ফরাসী কবিতাটিতে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভালোবাসার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে এই সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে প্রাণতরঙ্গিত সংসারের বিচিত্র রসোপভোগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। এখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রভাবের যথার্থ মূল্য দিয়ে তাকে প্রেরণার সূচনামাত্রে পর্যবসিত করেছে।

তরু দত্তের অনূদিত আরেকটি কবিতা উদ্ধার করছি:

To be born with spring, to die with the rose,
On Zephyr to float where pleasures invite,
To quiver on breasts of flowers that unclose,
With scent to be drunk, and colour and light,
To shake off the dust from pinions while young,
To fly in the blue everlastingly, hung,
This is the lot of the bright butterfly :
And such is Desire that settles not down,
Skims over the earth, sips its wine's foaming crown,
And hastes to a home, unseen in the sky.

The Butterfly : A. de Lamartine.

এই জীবনমদিরাপানের পরিচয় আছে 'কল্পনামধুপ' কবিতাটিতে। উদ্ধৃত কবিতাটির ঘরে ফিরে আসা 'উজ্জ্বল প্রজাপতি' এখানে 'পাগল পরাণ' অলিতে রূপান্তরিত:

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুণগুণ গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল-হৃদয় লয়ে পাগল পরাণ
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ।
বেলা বহে যায় চলে—শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,

মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরির তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে কবি আমি কল্পমধু পান,
বিজনে সৌরভ ময়ী মধুময়ী মায়া,
তাহাবি কুহকে আমি কবি আত্মদান।
বেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিবে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

কাজেই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের অনুমান একেবারে মিথ্যা মনে হয় না। আবও উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক এই সময়েই ববীন্দ্রনাথের ফরাসী সাহিত্য ও তাব আদর্শেব প্রতি বেশ কিছুটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। তার মূলে বাড়ির আবহাওয়া তো ছিলই, প্রিয়নাথ সেনেবও কিছু প্রভাব ছিল। আগেই বলেছি, প্রিয়নাথ সেন উগো এবং গোতিয়ের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন। পারস্পরিক আলোচনাব ফল-স্বরূপই এই সময় 'ভাবতী'তে [জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১] রবীন্দ্রনাথকে উগোর অনুবাদ করতে দেখি। মাদ্‌মোয়াজেল মোপাঁ প্রিয়নাথ সেনের কাছ থেকে নিয়েই তিনি পড়েছিলেন এবং গোতিয়ের কলাকৈবল্যবাদে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সময়েই 'কড়ি ও কোমল' রচনার যুগ। সৌন্দর্যকেই এ সময়ে চারুকলারূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। 'ভারতী'তে [আষাঢ় ১২২১] 'সৌন্দর্য ও প্রেম' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

কবির কাজ সৌন্দর্য উদ্রেক 'কবিয়া দেওয়া।......অসারতা, অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।

এই আর্টসর্বস্বতার ঝোঁকেই 'কড়ি ও কোমলে' নারীদেহের জয়গান করা হয়েছিল। 'স্তন', 'চুম্বন', 'বিবসন', 'তনু', স্মৃতি', 'নিদ্রিতার চিত্র' কবিতাগুলি এই কথার প্রমাণ দেবে। প্রেমের সম্পর্কে সমগ্রতার ধারণা এই সময়েই হয়েছে। সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধারণার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করেছিলেন মিসেস ব্রাউনিঙের 'Inclusious' কবিতাটি। 'কড়ি ও কোমলে'র 'বন্দী' ও 'ক্ষুদ্র অনন্ত' কবিতা এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে কবি বলেছেন[২৩] : 'তার সঙ্গে বাহিরের কোন মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণভাবে।' আমরা সেই মিশ্রণের কথা

যথাসম্ভব বললাম। কাব্যরীতির দিক থেকেও বিদেশী প্রভাব কিছু আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো।

৩.

'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কবি ও শিল্পীর মিলন এই সময় থেকেই আরম্ভ হলো। 'মানসী'র উদ্ভব সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[২৪] :

> দেহসৌন্দর্যের অকৃতার্থতা ও বাস্তব প্রেমের অচরিতার্থতা কবি-চিত্ত-কে কর্মচঞ্চল নবজীবনের সঙ্কেত দিল কড়ি ও কোমলের সমে। মানসীতে সুর ফিরিল কিশোর-প্রেমের জ্বালাহীন স্মৃতির অন্তরায়। সেই স্মৃতির মধ্যে মর্মের কামনা মূর্তিমতী হইল মানসী প্রতিমা।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গীহীন সৌন্দর্যের আবেদন কবির বিরহী চিত্তে ব্যথার ঝংকার তুলেছে, আর সেই ব্যথার অন্তঃপুর থেকেই বেরিয়ে এসেছে মানসী। কবির কাজ হলো :

> রচি শুধু অসীমের সীমা।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স, উগো, গোতিয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আগে থেকেই। ১২৯৩ শ্রাবণের 'ভারতী'তে 'কাব্য জগৎ' নামক প্রবন্ধ লিখে বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী বললেন যে, ফরাসী কবির লেখা পড়ে তাঁর বৈষ্ণব কবির কথা মনে পড়লো। সে প্রবন্ধে ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের কথাও আলোচনা হলো। গোতিয়ের একটি কবিতার অনুবাদ করলেন[২৫]। এই সময়েই দার্জিলিঙে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আত্মীয়-পরিবেশে টেনিসন, ব্রাউনিঙ ইত্যাদি পাঠ করতে দেখছি। এর কিছু আগে ১২৯২, চৈত্রের 'ভারতী'তে কবি লিখলেন :

> প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোন প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া [আভাস অর্থে] দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বুদ্ধিমান সমালোচক ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।

এই রহস্যচ্ছায়াতেই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, চিঠির মধ্যে যাকে Despair ('Tears from depth of some divine despair'-টেনি-

মনের পংক্তি স্মরণীয়) ও Resignation বলা হয়েছে। আলোচিত বিদেশী কবিরা এরই পটভূমিকায় রয়েছেন এবং তার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে সত্যকার প্রাণ-মনের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক এই সময়ে অতিস্পষ্ট হয়েছে। যে বিষাদিণীকে 'কড়ি ও কোমলে'র পর্ব পর্যন্ত চকিতে এক-আধবার দেখতে পেয়েছি, সে 'মানসী'তে এসে 'যৌবন স্বপ্নের' মতো সারা বিশ্বের আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' যে Fatal woman কে দেখেছি, 'ছবি ও গানে'র 'রাহুর প্রেমে' যে একবার আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকে এখানে দেখছি না। এই Fatal woman আর সেই বিষাদিণীর মধ্যে পার্থক্য আছে। Fatal woman কবিকে জ্বালা-যন্ত্রণায় কাতর ও সন্ত্রস্ত করে, বিষাদিণী কবিকে দূর সৌন্দর্যের বিষাদে ডুবিয়ে দেয়। 'মানসী'তে প্রাকৃতিক রূপ-জগৎ বিষাদিনী-রূপকে প্রত্যক্ষবৎ করে তুলেছে। কিছু পরেই 'পঞ্চভূত' বই-এ 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তার মধ্যে এই নতুন আধ্যাত্মিক কবিদৃষ্টি সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন :

> প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতিব বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কবিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনাব নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই, কাবণ আমরা সন্দেহও করি নাই প্রশ্নও করি নাই। আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে। তবে সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার পরেই।
>
> কোনো একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনার পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রী-পুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; সেই

দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

এই দৃষ্টিই কবিকে বাঙলা কাব্য জগতে নতুন দিগন্ত খুলতে সাহায্য করেছে। এই দৃষ্টি দেবেন্দ্রনাথের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। আর দেবেন্দ্রনাথের উত্তর সাধক হওয়া মানেই রুশো, কাণ্ট, ফিক্তে, হেগেল, কুঁজ্যা, উপনিষৎ আর বেদান্তের উত্তব সাধক হওয়া। যাই হোক, এই প্রকৃতিকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে দেখে কবি মানসী প্রতিমার আভাস পেলেন কখনো কখনো, কখনো বা প্রিয়তমাকেই প্রকৃতিরূপে চেয়ে বসলেন :

ওগো তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূব পশ্চিমাচলে কনক আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে বও।
অমনি সুন্দরশান্ত অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীবব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীবে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী। 'সন্ধ্যায়'।

কিংবা প্রিয়তমাব সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও প্রকৃতিবই অঙ্গ হিসাবে কল্পনা কবে নিয়েছেন :

তুমি যেন ওই আকাশ উদাব
আমি যেন ওই অসীম পাথার
আকুল কবেছে মাঝখানে তাব
আনন্দ পূর্ণিমা। 'ধ্যান'।

কিংবা :

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু, আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে তোমারে লুকায়ে বুকে। 'শেষ উপহার'।

বিহারীলাল প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে যে, প্রকৃতিই ছিল রোম্যাণ্টিক কবিদের নাগরিক-জীবনের রুদ্ধশ্বাস জীবন-যাত্রা থেকে আশ্রয় নেবার একমাত্র জগৎ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'The Reverie of Poor Susan', 'Lines written in early Spring,' 'The World is too much

with us', কীট্সের 'To one who has been long in city pent' ইত্যাদি কবিতা তার প্রমাণ। 'মানসী'তে 'বধূ' কবিতাটির মধ্যে নাগরিক জীবনের নিষ্প্রাণ আবেষ্টনী থেকে উদ্ধার পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

'মানসী'পর্বে টেনিসন-ব্রাউনিঙ পাঠের কথা বলেছি। রবীন্দ্রকাব্য-সাধনার পরিণত অবস্থার প্রারম্ভে ব্রাউনিঙের প্রভাব বিশেষ অনুভব করা যায়।

১৯১৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি আমেরিকার Great Thoughts কাগজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি interview-এর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। [বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত কর্তিকাসংগ্রহ: Vol. 7, Page 109]। তাতে দেখছি, ব্রাউনিঙ ও কীট্সের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ সাক্ষাৎকারককে সচেতন করেছে। তাই তিনি শেষে লিখছেন:

His enthusiasm over Browning seemed greater than over any other British poet, save perhaps Keats. 'Browing was a great teacher', he said, 'he was a tonic force and was full of love for humanity. Many of his poems are dear to me. And his plays—they are wonderful'. তাই মনে হয়, 'মানসী'র 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' সম্ভবতঃ ব্রাউনিঙের ড্রামাটিক মোনোলগের প্রেরণায় লেখা। অবশ্য ব্রাউনিঙের কাব্যকৃতিত্ব এই দুটি কবিতায় পাই না। কিন্তু 'অনন্ত প্রেম' কবিতাটির প্রেরণা যদি বা ব্রাউনিঙ হন তবু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেক বেশি। 'অনন্ত প্রেমে'র মধ্যে যে মিষ্টিক দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা ব্রাউনিঙেরও নিজস্ব দৃষ্টি। উভয় কবির কাব্য থেকে অংশতঃ উদ্ধার করলে উভয়ের সাদৃশ্য বোঝা যাবে:

I wonder do you feel to-day
As I have felt, since hand in hand,
We sat down on the grass, to stray
In spirit better through the land,
This morn of Rome and may?
For me, I touch a thought, I know,
Has tantalised me many times,
(Like turns of thread the spiders throw

Mocking across our path) for rhymes
To catch and let go.……
Only I discern
Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

Two in the Campagna.

'অনন্ত প্রেমে' কবি বলেছেন :

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমেব ব্যথা,
অতি পুবাতন বিরহমিলন কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয অবশেষে,
কালের তিমিব রজনী ভেদিয়া
তোমার মূরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতাবকাব বেশে।
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমেব স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে কবিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ বিধুব নয়ন-সলিলে,
মিলন মধুর লাজে।
পুবাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে। 'অনন্ত প্রেম'।

রোম্যান্টিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, প্রথাগত ধর্মকে আঘাত করবার প্রবণতা। বিশেষ করে শেলি ও সুইনবার্ণের মধ্যে এই প্রবণতা জোরালো মনে হয়। দেশপ্রেম-চেতনা ও রাষ্ট্র আন্দোলনে ভদ্র বাঙালীর ঔদাসীন্য ও স্বপ্নালুতা রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেলির 'Peter Bell the Third' যেমন, রবীন্দ্রনাথের তেমনি 'দুরন্ত আশা' ও 'পরিত্যক্ত' কবিতা।

এই প্রসঙ্গে 'মেঘদূত', 'একাল ও সেকাল' ইত্যাদি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। কারণ যে সৌন্দর্য-লোকের বা মানসীপ্রিয়ার আকাঙ্ক্ষায় কবি চঞ্চল তার

কাব্য-রূপদানে সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং ইংরিজি সাহিত্যের সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গির ঐতিহ্যকে যুগপৎ আত্মসাৎ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা এই সময়েই দেখা গেল। 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় নিরবয়ব সৌন্দর্যের বন্দনা বিদেশী আদর্শের প্রেরণাতেই হয়েছে, 'উর্বশীতে' তার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। রোম্যান্টিকদের স্বপ্নপ্রতিমা রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাস্থল, যে প্রতিমার রূপ-রস জুগিয়েছেন প্রধানতঃ কালিদাস ও বৈষ্ণব কবি। কিন্তু 'অহল্যার প্রতি' কবিতাতে যে সৌন্দর্য-মূর্তি কল্পিত হয়েছে তাতে স্বাদেশিকতার ছাপ নেই, কলাকৈবল্যবাদীদের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যই এখানে প্রেরণা দিয়েছে মনে হয়ঃ

দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সবল, শুভ্র; হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষধারা
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।...
অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্র পুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
একবৃন্তে।

উর্বশীর অন্যতম প্রেরণা যে Aphrodite, তার স্মৃতিও কি এখানে নেই? এই সূত্রে 'মানসী'র আরেকটি বর্ণনা সম্পর্কে একটু বলে নিয়ে 'মানসী-প্রসঙ্গ শেষ করি। কবিতাটি হলো 'তবু'। যাঁরা 'গীতবিতানের' তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় অংশটি পড়েছেন, তাঁরা সবাই জানেন যে, 'কালমৃগয়া', 'বাল্মীকি

প্রতিভা', 'রবিচ্ছায়া' ও 'মায়ার খেলা'র অন্তর্গত 'মানা না মানিলি,' 'মরি, ও কাহার বাছা', 'ওহে-দয়াময়' এবং 'আহা, আজি এ বসন্তে' গানগুলি টমাস মুর-এর 'Go where glory waits thee' আইরিশ গানটির সুরপ্রতিবিম্ব। অর্থাৎ, একুশ বছর বয়স থেকে সাতাশ বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ টমাস মুরের ঐ গানের সুরে ভরপুর ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি জিনিসও লক্ষণীয় যে ওই গানটির ভাবেরও ছাপ পড়েছে রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশ বছর বয়সে রচিত 'তবু' কবিতায় [মানসী] এবং 'তবু মনে রেখো' গানে। তুলনার সুবিধার জন্য টমাস মুরের মূল গানটি এবং 'তবু মনে রেখো'র ইংরিজি অনুবাদটি [শ্রীক্ষিতীশ রায় কৃত] উদ্ধার করি :

Go where glory waits thee,
But, while fame elates thee,
Oh ! still remember me.
When the praise thou meetest
To thine ear is sweetest.
Oh ! then remember me.
Other arms may press thee,
Dearer friends caress thee,
All the joys that bless thee,
Sweeter far may be ,
But when friends are nearest,
And when joys are dearest,
Oh ! then remember me.
When, at eve thou rovest
By the star thou lovest,
Oh ! then remember me.
Think, when home returning,
Bright we've seen it burning
Oh ! thus remember me.
Oft as summer closes,
When thine eye reposes
On its ling'ring roses.
Once so loved by thee
Think of her who wove them,
Her who made thee love them,

Oh ! then remember me.
When, around thee dying,
Autumn leaves are lying,
Oh ! then remember me.
On the gay hearth blazing,
Oh ! still remember me.
Then should music, stealing
All the soul of feeling,
To thy heart appealing,
Draw one tear from thee
Then let mem'ry bring thee,
Strains I used to sing thee,
Oh ! then remember me.

'তবু মনে রেখো' গানটির অনুবাদ পাশাপাশি রাখা যেতে পারে :

(Anthology of One Hundred Songs Vol. 2. p. 190, Sangeet Natak Akademy, Rabindra Bhavana, New Delhi, 1967)

If I have to go far,
far away
and you are caught
in the toils of a new love,
and the dust of oblivion
settles over the old.
forget me not,
my love,
remember me.
If I remain close to you like a shadow
and you do not notice me,
forget me not.
my love, remember me.
If on a spring night your eyes

well over with tears
and you have to stop
in the very midst of your frolic,
or, of autumn morning
your daily round of duties is interrupted
for no reason, forget me not,
my love remember me.
Even if tears do not show
at some time when
I occur to you as memory,
forget me not,
my love remember me.

'মানসী'র 'বিদায়' কবিতায় দেখি কবিচিত্ত অকূল সাগরে তার জীবনতরী ভাসিয়েছিল মানসী প্রতিমাকে লক্ষ্য করে। সেই যাত্রাব অভিজ্ঞতা বোঝাই হয়েছে 'সোনাব তরী' (১৮৯৪)-তে। 'সোনার তবী' বচনার পূর্বে যখন 'মানসী' রচনা করেছেন তখন রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনাব উল্লেখযোগ্য খবর যা পাচ্ছি তা হলো প্রমথ চৌধুবীকে লেখা চিঠিতে (১৮৯০-এর ৩রা জুন) মূল জার্মানে গ্যেটের Faust পড়ার সংবাদ। আব ১৮৯১-এর ১৭ই মাঘ-এ প্রমথ চৌধুরীকেই লেখা আর একটি চিঠিতে পাচ্ছি Bashkirtseff's Journal পড়ার সংবাদ। 'সোনার তরী'র মধ্যে একদিকে সংসারের প্রতি আসক্তি অন্যদিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের দিকে যাত্রা—এই দুয়ের টানাপোড়েন চলেছে। রোম্যান্টিকদেব অবিশ্রাম অভিসারকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন নিজের প্রবণতা অনুযায়ী, কিন্তু একটা কোনো সামঞ্জস্যবোধের মধ্যে পরিসমাপ্তি চেয়েছে তাঁর মন। ফলে উভয় প্রবণতার দ্বন্দ্বে তাঁব কবিচিত্ত বিষাদাচ্ছন্ন। শেষের চিঠিতে কবি বলেছেন (১৮৯১, ১৭ই মাঘ):

> আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে, সেইজন্য একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে

কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্য সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা ও ঔদাস্য।

বৃহৎ জীবনের প্রতি আসক্তির প্রমাণ 'পদ্মা', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা', 'পরশ পাথর', 'আকাশের চাঁদ'। অন্যদিকে নিরুদ্দেশ অভিসারের প্রমাণ 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'হৃদয় যমুনা,' ইত্যাদি। 'মানস সুন্দরী' এই দুদিকের টানাপোড়েনে হতাশ্বাসে ভরা। প্রসঙ্গক্রমে এই কাব্যের একটি কবিতাংশ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। 'বর্ষাযাপন' কবিতায় কবি বলেছেন :

তারপরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই
উলটি পালটি দেখি পাত
কোথারে বর্ষার ছায়া অন্ধকার মেঘমায়া
ঝরঝর ধ্বনি অহরহ,
কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে লীন
জীবনের নিগূঢ় বিরহ!
বর্ষার সমান সুরে অন্তরে বাহিরে পুরে
সংগীতের মুষলধারায়
পরাণের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।

অধ্যাপক তারকনাথ সেন এই পংক্তিগুলিকে বিদেশী কাব্যের প্রতি রবীন্দ্র-নাথের বিবাগের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ একটা বিশেষ মর্জির ব্যাপার,—যে সময় দেশীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের উপযুক্ত বচনা বিদেশী কাব্যে তিনি পান নি। না পাওয়ারই কথা। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের আবিষ্কার এবং তার মধ্যে ব্যক্তিগত বিরহ-যন্ত্রণার প্রতিফলনে বিরহিণীরূপের আবিষ্কারের মূলে বিদেশী কবিদের বিশেষ প্রকৃতিদৃষ্টিই তো রয়েছে। কাজেই ভারতীয় বর্ষার রূপ রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যে নেই বলে তার ওপর বিরাগ জন্মাতে পারে না, রবীন্দ্রনাথেরও তা হয়নি।

অন্যপক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রমাণ হিসাবে আমরা 'হিং টিং ছট' কবিতাটির কথা তুলতে পারি। কবিতাটিতে ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতাকে তুচ্ছ করে (নিন্দাচ্ছলে স্তুতি) শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে যে, জাতীয়তার নামে আমরা আমাদের অতীতকে অনেক সময়েই অযৌক্তিকভাবে অতিরঞ্জিত করেছি, ইয়োরোপীয়

শিক্ষার যুক্তির আলোকে যা নিতান্ত অর্থহীন। উদ্ভট স্বপ্ন ব্যাখ্যার জন্য যবন পণ্ডিতকে আহ্বান করা আমাদের দেশী পণ্ডিতদের কাছে সময় নষ্ট বলে মনে হয়েছে: 'ডেকে এনে পরিহাস রেগে মেগে বলে'। কিন্তু ফরাসী পণ্ডিত তো ক্রুদ্ধ হবার পাত্র নয়। স্বাভাবিক শ্লেষের সঙ্গে সে রাজস্বপ্নকে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে:

ফরাসি পণ্ডিত ছিল হাস্যোজ্জ্বল মুখে,
কহিল নোয়ায়ে মাথা হস্ত রাখি বুকে,
স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে,
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান,
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভুরিভুরি
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট,
শুনিতে কি মিষ্ট আহা হিংটিং ছট!
শুনিয়া সভাস্থ সব কবে ধিক্‌ধিক্
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক।
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিক বিকার,
একথা কেমন করে করিব স্বীকার!
জগৎ বিখ্যাত মোরা ধর্মপ্রাণ জাতি!
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে! দুপুরে ডাকাতি!

বুদ্ধিদীপ্ত ফরাসী পণ্ডিতের আবির্ভাবের কারণ বোধ হয় এই যে, সে সময় আশুতোষ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখের মতো বন্ধু-বান্ধবের সংস্পর্শে এসে বিশেষ ভাবে ফরাসী মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কবি।

নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের প্রতি অভিসারে কবিকে যে শক্তি নিয়ত চালিত করে নিয়ে গেছে, যে কখনো কবির আশঙ্কাটুকুকে স্থান দিয়েছে নিজের তরীকে, কবিকে দেয় নি, কখনো বা যে কবিকে বিচিত্র সৌন্দর্যের ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে নীরব হেসে, কখনো যে 'অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল' দিয়ে সৌন্দর্যের মহান্ উপকূলে নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়েছে, সেই শক্তিকে ধীরে ধীরে অনুভব করলেন এই সময়ে। এই

ধারণার পিছনে শেলির Hymn to Intellectual Beauty-র প্রেরণা আছে বলেই মনে হয়:

The awful shadow of some unseen Power ·
Spirit of Beauty, that dost consecrate
With thine our hues all those dost shine upon
Of human thought and form,—where art thou gone ?
Why dost thou pass away and leave our state,
This dim vast, vale of tears, vacant and desolate ?

Bashkirtseff-এর যে জার্নাল তিনি পড়েছিলেন তার এক জায়গায় পাচ্ছি[২৬]:

The occupations of nature are to move the planets and attend to the physical wants of our world. But our intellect ? but our soul ? we must admit a God other than the vague idea of a personification of universal mechanism.

দ্বিজেন্দ্রলালের আক্রমণের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক Caird-এর রচনা থেকে নিম্নলিখিত অংশটি তুলে দিয়েছিলেন[২৭]:

Though man is essentially self-conscious, he always is more than he thinks or knows, and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unaware, but which nevertheless affect everything he says or does. Of these ideas we may, therefore, expect to find some indication even in the earliest stage of the development ; but we cannot expect that in that stage they will appear in their form or be known for what they really are.

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সূত্রে কবি তাঁর জীবনদেবতার অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। 'চিত্রা'তে এই অনুভূতি আরও স্পষ্ট রূপে কাব্যে দেখা দিয়েছে।

সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য যে টানটি প্রবলতর তা হলো জীবনে আসক্তি এবং বৃহৎ জীবনের আভাস। বৃহৎ মানব সংসারের প্রতি টান উনিশ শতকের মানবিকবাদেরই ব্যাপকতর পরিণতি। 'শৈশবসন্ধ্যা', 'যেতে নাহি

দিব', 'বৈষ্ণবকবিতা', 'দেউল', 'বিশ্বনৃত্য', 'পুরস্কার', 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' ইত্যাদি কবিতাতে এই মানবপ্রীতি আমাদের প্রথাগত ভাবনাকে পরিবর্তিত করেছে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় শুধু স্বর্গীয় সৌন্দর্য নয়, বিশেষ করে পার্থিব জীবনের ও মানবসংসারের প্রতি দারুণ আকর্ষণও প্রকাশ পেয়েছে। স্বর্গের অবিমিশ্র সম্পূর্ণতা ও সুখের চেয়ে যে পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখময় সংসারে মৃত্যুর রোমাঞ্চ-ঘেরা এই জীবন অনেক বেশী কাম্য তাই প্রকাশ পেয়েছে। 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র সেই ব্যথিত নায়ক কীট্‌সের Endymion-এর মতোই সিন্‌থিয়ার আকাশী প্রেমে দিশহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত একটু মানবিক চুম্বন, একটু মানবিক উষ্ণ নিঃশ্বাস এবং একটু মৃদু পীড়নের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবির বিশ্বাত্মবোধ বিবর্তনবাদনির্ভর। ইতিপূর্বেই 'মানসী' প্রকাশের সময় দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রার কালে Wallace-এর 'Darwinism' পড়েছেন। এই বই-এর বিষয় তাঁকে যে ভাবিয়ে তুলেছিল সেকথা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি'তে ইতিপূর্বেই প্রকাশ করেছেন। 'বলাকা'র আগে বিজ্ঞানের এমন কাব্যরূপ আর বোধ হয় বাঙলা কাব্যে দেখা যায় নি।

'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতাকে আমরা রূপকথা বলতে পারি: 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা'। এই ধারাটি 'কড়ি ও কোমলে'র 'উপকথা,' 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' 'সাত ভাই চম্পা' থেকে শুরু, 'কল্পনা'র 'ভ্রষ্টলগ্ন', 'সব পেয়েছির দেশে'র মধ্যে তার পরিণতি। এর পিছনে প্রির‍্যাফেলাইট কবিদের লোকগাথা ও রূপকথার জগতের প্রতি আকর্ষণ প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে মনে হয়। প্রির‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠির প্রায় সকলেই রবীন্দ্রনাথের পাঠ্য কবিদের তালিকাভুক্ত ছিলেন। 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছে' আমরা সুইনবার্ণ ও রসেটির কবিতার অনুবাদ দেখি। ঐ সময়কারই (১৮৮৪) একটি চিঠিতে উইলিয়াম রসেটির সম্পাদিত একটি সমলোচনা Swinburne's Poems and Ballads (১৮৬৬) বইটির উল্লেখ পাচ্ছি। যাই হোক, এই প্রির‍্যাফেলাইটদের রূপকথা-প্রীতির সঙ্গে মিশে ছিল কীট্‌সের স্বপ্নদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের রূপকথা জাতীয় কবিতাগুলির পরোক্ষ প্রেরণা হয়তো এইসব রূপকথা জাতীয় কবিতা।

'সোনার তরী'তে যে দ্বন্দ্বের কথা বলেছি, 'চিত্রা'তে এসে (১৮৯৬) সে দ্বন্দ্ব আরও পরিষ্কার ভাবে দেখা দিল। কবির মন বিশ্বকে নানা দিক থেকে

(সমাজ ও রাজনীতির দিক থেকে যেমন, তেমনি সৌন্দর্যলোকের দিক থেকেও) আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। আর এ সবের মূলে রয়েছে সে শক্তি, যা তাঁকে অন্তর্লোকে তাগিদ দিয়ে বহির্লোকে বিচিত্র রূপের আয়োজনদ্বারা সচেতন করে তুলেছে ('জীবন দেবতা' কবিতা স্মরণীয়)। এই শক্তির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্য বিদেশী সূত্রগুলি নির্দেশ করেছি। সে শক্তি কবিমনের ওপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তার কাব্য-রূপদানে কবি যে আরও কিছু উপকরণকে প্রেরণা রূপে দেখেছেন, সেগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ১৮৯৩-এর মার্চে তিনি কেয়ার্ডের দার্শনিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলি পড়ছেন।[২৮] তখনও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখা হয় নি। এটা লক্ষণীয় ১৮৯৪-এব মার্চে আমিয়েলের জার্নাল পড়ছেন[২৯]। ১৮৯৫-এর মার্চে একটি চিঠিতে লিখছেন :

> সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট গোলাপ ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে : এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা—এটা কেবল পুরুষেরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্য পুরুষের কাছে মেয়েদেব সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' নামে একটা কাব্য-গ্রন্থ পড়েছিলুম। তাতে সে সমস্ত জগৎ-সংসারকে স্ত্রী মূর্তিতে দেখেছে—চন্দ্র সূর্য, আকাশ, পৃথিবী সমস্তই স্ত্রী-সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা, সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সঙ্গীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ, কীট্‌সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎ ভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতি-দিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারিনে।

সৌন্দর্য বন্দনা যে 'স্তব' বা 'ধর্মোচ্ছ্বাস' এই অনুভূতি কীট্‌সেরও ছিল।

একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন (আগস্ট, ১৮২০) 'My imagintion is a monastery, and I am its monk'।

কীট্‌স ও ব্রাউনিঙের প্রতি কবির আসক্তির কথা আগে বলেছি। এখন মিসেস ব্রাউনিঙের কাব্য এবং বিশেষ করে কীট্‌সের কাব্য সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে লিখেছেন :

আমি যত ইংরেজ কবি জানি সবচেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশী করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড় কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই—কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগেব একটা আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আব হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে—যেটি তৈরী করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন সুইনবর্ণ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবিব অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে, তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখাব মধ্যে নিজের স্বাক্ষর সত্য পাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তি দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশী অন্তরঙ্গরূপে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যে সমস্ত ছত্র লেখে টেনিস-নের সচেতন আর্টিষ্ট তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমা-গতই আছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনায় কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছিরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্‌সেব লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোন কবিতায় প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে ঘনিষ্ঠ সঙ্গ দান করে।

'সোনার তরী'-'চিত্রা'-পর্বে কবির চিঠি থেকে এই বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়ার কারণ আর কিছু নয়—কবি যে এই সময়ে রোম্যাণ্টিকদের সৌন্দর্যোপাসনায় কীভাবে আত্মমগ্ন ছিলেন সেইটে বোঝানো, আর সেই আত্মমগ্নতাকে প্রকাশ করবার সুভীর আনন্দময় সজীব-উজ্জ্বল কলানৈপুণ্যের প্রতি তাঁর ঝোঁকের

কথা বলা। রোম্যান্টিকদের ওই যে ক্ল্যাসিকাল কলানৈপুণ্য—পাথরে খোদা ভাব, সেটি আনতে রবীন্দ্রনাথকে কষ্ট পেতে হয় নি। কারণ পাথর খোদায়ের অস্ত্র তাঁর ছিল—সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার আর বৈষ্ণব কবির ভাষা। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের অপূর্ব মিশ্রণে কবি সেই কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনা পরে করবো, এখন সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণই আমাদের আলোচ্য বিষয়। 'চিত্রা'য় যে আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যলোক উদ্‌ঘাটিত, 'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী', 'চিত্রা'র 'আবেদন', 'উর্বশী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'বিজয়িনী' ইত্যাদি কবিতায় যার প্রকাশ, সে সৃষ্টির পিছনে রোম্যান্টিকদের সৌন্দর্য-বিলাস বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। যে সময়ে তিনি শেষ উদ্ধৃত চিঠিটি লিখছেন সেই সময়েই 'চিত্রা'র এই কবিতাগুলি লেখা। কঠিন বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে কীট্‌সের একটি স্বাভাবিক বিরাগ ছিল, তাতে মানুষের সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা নষ্ট হয়ে যায় বলে তাঁর ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের কবিতাগুলি সেই ধারণাই বহন করে আনে। 'ফাইন রেষ্ট্রেন্ট'-এর বদলে 'ফাইন এক্‌সেস্' দিয়েই পাঠককে মুগ্ধ করেছেন কবি। কীট্‌স ছাড়াও সুইনবার্ণের সঙ্গীত ও রসেটির চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা প্রেরণা দিয়েছিল মনে হয়। 'উর্বশী' কবিতাটির মূলে সুইনবার্ণের Aphrodite যে আছেন তাতে সন্দেহ নেই, রূপবর্ণনায় এবং ধ্বনিতরঙ্গময় পরিবেশ সৃষ্টিতে Aphrodite-এরই প্রতিরূপ হলো উর্বশী :

A perilous goddess was born ;
And the waves of the sea as she came
Clove, and the foam at her feet
Fawning rejoiced to bring forth
A fleshly blossom, a flame
Filling the heavens with heat
To the cold white ends of the north.…

White rose of the white water, a silver splendour, a flame
Bent down unto us that besought her and earth grew sweet with her name.
For thine came weeping, a slave among slaves, and rejected but she

Came flushed from the full flushed wave and imperial
her foot on the sea.
And the wonderful waters knew her, the wind and
the viewless v
And the rose grew rosier bluer the sea-blue
stream on the b

'উর্বশী' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি বলেছেন :

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী !
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষপাত্র লয়ে বাম করে—
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

এই উদ্ধৃতি দুটির তুলনা করলে দেখা যাবে, মহাসিন্ধুর উচ্ছ্বসিত পাদপীঠে শুভ্র নগ্নকান্তি সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ মূর্তির সঙ্গেই শুধু এই Apl সাদৃশ্য রয়েছে। আর বাকি সবটুকুই ভারতীয় প্রাচীন সাহি উর্বশীর মূর্তি ও স্বভাবের অনুযায়ী করে কবি কল্পনা করেছেন। খৃষ্ট ঘৃণাবশতঃই খৃষ্টপূর্ব যুগের প্রাচীন দেবদেবীদের বন্দনা করেছেন সু রকম কোনো মনোভাব উর্বশীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়নি। পরি মানুষ যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না—এই আক্ষেপকে প্র জন্যই রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর রূপ ও স্বভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। উর্বশী 'দুর্লভ', কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকেও উর্বশীর 'দ্রুত ও 'অপ্রাপ্যতা' দেখা গিয়েছে। তা ছাড়া কালিদাসের নাটকেই ও আভরণের অতীত হয়ে কিছুটা অপার্থিবতা পেয়েছে। এমন কি উপমার ক্ষেত্রে কবি বিশেষভাবেই ভারতীয়। 'উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা' যেমন বৈদিক উষার স্মারক, তেমনি 'নূপুরগুঞ্জরি যাও আকুল অঞ্চলা—বিদ্যুৎচঞ্চলা' বিক্রমোর্বশীর কালিদাসের উপমা ও বৈষ্ণবসাহিত্যের রাধার স্মারক। কাজেই 'foam at her

feet' বা 'rejoiced to bring forth a fleshly blossom'—এইটুকুর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত বেণী বিবসনা'র সম্পর্ক। বাকিটুকু ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য অনুযায়ী। তাই যে 'মুক্তবেণী বিবসনা' Aphrodite-র জন্ম সামুদ্রিক ঝিনুকে, তাকে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ধ্যান-কল্পনার সংস্কারবশে কবি পদ্মাসনারূপে দেখালেন:

বিকশিত বিশ্ববাসনার / অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার / অতিলঘুভার।

কিন্তু এ তো গেল উর্বশীর স্বভাব ও রূপের কথা। কিন্তু এই রকম উর্বশীর মতো নারী মূর্তির মধ্য দিয়ে চিরন্তন সৌন্দর্যলোকের প্রতি কবিদের স্তবগান নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' নতুন মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু চিরন্তন নারী-মূর্তি-কল্পনাব পিছনে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে গ্যেটের Faust-এর দ্বিতীয় ভাগের শেষ লাইনের ছবি : Das Ewig Weibliche zeiht uns hinan অর্থাৎ The Eternal feminine draws us upwards. প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন (৬ই চৈত্র, ১৩০২, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৫):

তুমি যে লিখিয়াছ, 'উর্বশী বহুকাল পরে একটা কবি-কম্‌প্লিমেণ্ট পাইয়াছেন' সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়েছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewig-Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশীর মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের Faust পড়ার সংবাদ দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহেও [রবীন্দ্র সদনে] গ্যেটের নাটকাবলী ও ফাউস্টের উনিশ শতকের অষ্টম দশকের সংস্করণ রয়েছে।

কবির মানবিক বোধ যে এখন কেবল একটা অনুভূতির বিষয় নয়, বৃহত্তর মানবসমাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তি পেয়েছে সেই বোধ—তার প্রমাণ 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা। আফ্রিকার জুলু যুদ্ধের অভিঘাতের অন্তর্বেদনা প্রকাশ পেল এই কবিতাটিতে। বাঙলা কাব্য হলো বিশ্বমানব-সমাজের কাব্য। এই কবিতায় কবি যেন সভ্যতার ইতিহাসে দুর্দিনের মানব-নায়কদের নতুন করে দেখলেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা করলেন।

'Adonois কাব্যে শেলী (ll 37—45 Stanza V) এবং Fall of

Hyperion কাব্যে কীট্‌সও সাংসারিক জীবনে মানবপ্রেমিক বরেণ্য নায়কদের অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা করেছেন (ll 156—59) তবে Hyperion-এর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' মানবিকতায় অনেক বেশী বলি সম-সাময়িক একটি যুদ্ধ এ কবিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণাস্থল।

'সোনার তরী', 'চিত্রা'র মধ্যে সৌন্দর্যলোকের যে আকাঙ্ক্ষা ত সচল, 'চৈতালী'র (১৮৯৬) মধ্যে তা গভীর মাধুর্যে স্নিগ্ধ ও পরি সমর্পণের আত্মত্যাগে করুণ। ব্যক্তিগত প্রেমানুভবের যে কবিতাগু সেগুলিতে আছে উদ্দামতার পরেকার ক্লান্তি ও কারুণ্য। 'গীতহীন' 'স্বপ্ন', 'পল্লীগ্রামে' ইত্যাদি কবিতা এই ক্লান্তি ও কারুণ্যে ভবা। নারী রহস্যব্যাপারের যে কবিতাগুলি আছে সেগুলি নিরুদ্বেল মমত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের মূর্তি, অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা। উপনিষদে তাই হলো সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা। জীবনের সঙ্গে নিবিড়তায় কবি বুঝেছেন যে মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি মেমোরিয়াম'-এর শোকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ক্রমশঃ প্রকৃতি ও সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্বপ্রেমে পবিণত হয়েছে। সেই ধারণার সম্ভব এই ধারণার পিছনে কাজ করছে। টেনিসন যখন বলেছেন :

> My love involves the love before
> My love is vaster passion now ;
> Though mix'd with God and Nature thc
> I seem to love thee more and more.

তখন কবির এই পংক্তিগুলিকে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে :

> এ নীলাকাশ এত লাগিত কি ভালো
> যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো।
> অপরূপ মায়াবলে তব হাসি গান—
> বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
> তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে।
> তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে। প্রিয়া।

মৃত্যুর সম্বন্ধে ধারণা এই সময়ে একটা বিশিষ্টতা লাভ করেছে বলেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিরহ এবং প্রেম সম্পর্কে কবির ধারণা অনেক ব্যাপক ও গভীর হয়েছে।

এছাড়া 'চৈতালি'তে কতকগুলি কবিতা আছে যার মধ্যে কবি দুটি জিনিষকে আগ্রহভরে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এক. মানুষের অবজ্ঞাত শ্রেণী, দুই. পশুপক্ষী. তরুলতা। 'সামান্য লোক', 'কর্ম', 'দিদি', 'পরিচয়', 'অনন্ত পথে', 'পুঁটু', 'সঙ্গী', 'সতী', 'স্নেহদৃশ্য', 'করুণা', 'তৃণ', ইত্যাদি কবিতায় কবির মর্ত্য-প্রীতি অতিতুচ্ছ সাধারণ জীবন ও বস্তুকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ ও সামান্য বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে কবির চোখ খুলে দিয়েছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। তাঁর:

To me the meanest flower that blow can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

রবীন্দ্রনাথের 'দুর্লভ জন্ম' প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে:

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ ধরণীর ব্যর্থতম প্রাণ।

এই মর্ত্যপ্রীতির পরিবেশে কবির ভগবৎপ্রীতি এক নতুন রূপ নিল: 'জীবনেশ্বর'। জীবন ছেড়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। স্বদেশপ্রীতিও এক নতুন রূপ নিল। ভারতীয় কবি কালিদাসের সৌন্দর্যলোক আবিষ্কার করলেন কবি উনিশ শতকের রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে, আর প্রাচীন ভারতের সরল সংযত আধ্যাত্মিক জীবনকে বর্তমান জীবনে (যাকে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন: 'স্নেহ গ্রাস', 'বঙ্গমাতা', 'দুই উপমা', 'অভিমান', 'পরবেশ,' ইত্যাদিতে) ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। এক্ষেত্রে রোম্যান্টিক কবিদের ক্লাসিক্‌স্ চর্চা রবীন্দ্রনাথের কাছে নবজীবন সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহের দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করছে বলে মনে হয়।

দেশকালের দূরত্বেই প্রাচীন ভারত সুন্দর—কবি সে সম্পর্কে সজ্ঞান। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে নির্লিপ্ত হওয়াই রোম্যান্টিক রসদৃষ্টির লক্ষণ। সেই রসদৃষ্টি প্রকাশ পেল 'কথা'-'কাহিনী'-'কল্পনা' (১৯০০) কাব্যের অতীত-ধ্যানে রোম্যান্টিক কবিরা যেমন গ্রীসের অভিমুখীন ছিলেন, কীট্‌সের কবিতাগুলি যেমন অনেকাংশেই গ্রীকধর্মান্বিত, শেলী যেমন ক্লাসিকাল স্কলার, প্লেটোর শিষ্য, ইস্‌কাইলাসের বিষয় নিয়ে তিনি যেমন নতুন কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের ধ্যান হলো প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ, কালিদাসের নতুন ভাষ্যকারও তিনি। উনিশ শতকের বিদেশীদের প্রেরণায় সংস্কৃতিগত অনিবার্য প্রয়োজনে, কিছুটা প্রতিক্রিয়ায় আমরা যখন সংস্কৃত সাহিত্যের

ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদি পড়তে লাগলুম, তখন আমাদের দেশের প্রাচীন জীবনের পরিচয় আমরা পেলুম। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির এও পরিপ্রেক্ষিকা হলো। কাব্যের ভূগোল, কাব্যের শব্দ-ধ্বনি, কাব্যে রীতি—সব পাল্টে গেল। 'কথা ও কাহিনী'তে ব্যালাডের ধারায় হলো জীবন্ত, 'কল্পনা'য় কালিদাসের যুগ তার বিচিত্র কারুকার্য দিল। 'কথা ও কাহিনী'তে ইতিহাসের মধ্যে মানুষের ধর্মকে ঘোষণা করলেন কবি। ক্লাসিকাল যুগ রোম্যান্টিক কবিব হতাশা বৈরাগ্যের নতুন ঐশ্বর্য নিয়ে ফুটে উঠলো 'কল্পনা'য়। 'কল্পনা'র দুটি একটু উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। একটি হলো 'বর্ষশেষ', অপরটি 'হৃ গান'। 'বর্ষশেষ' কবিতাটি যে শেলিব Ode to the West W প্রেরণায় লেখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শেলিব কবিতাটি ঘ রবীন্দ্রনাথেব কবিতাটি সে তুলনায় তরল। তবে, এক্ষেত্রেও প্রভাব মাত্র। কারণ 'বর্ষশেষ' খাঁটি বাঙলাদেশের ঝড় ও বর্ষণের ছবি। 'হৃ গান' কবিতাটির প্রেরণা মনে হয় টমাস গ্রের Hymn to Adversity সমযেই প্রকাশিত হয় কিছুটা Gnomic Verse-এর ধরণের লেখা '২ কবিতাগুলি (১৮৯৯)।

'ক্ষণিকা' (১৯০০) রবীন্দ্র-কাব্য ধাবায় এক বিশিষ্ট সংযোজন। এই কারণে যে, এই কাব্যে কবিব মেজাজ পূর্বাপর কাব্যধারা থেকে এ স্বতন্ত্র। যদিও 'চৈতালী'র সেই 'দুর্লভ জন্মে'র বক্তব্যই এই কাব্যের বিষয়, তবু এমন উল্লাসে পলায়নপর বর্তমান মুহূর্ত আগ্রহভবে ধরে বাখবার দৃষ্টান্ত আগে নেই, পবেও বিশেষ নেই। শুধু নয়, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে বহিঃপ্রকৃতিকে অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে এক ক কবি অস্তিত্ব-মাত্র-বোধের নির্বন্ধন আনন্দ পেয়েছেন বর্তমান মুহূর্তে অবকাশে। নতুন তত্ভব শব্দে ও লৌকিক ছন্দে এই উল্লাসের সার্থক এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছেন [২৯]:

> ব্রিটিশ নন এমন ইউরোপীয় কবিকুলের মধ্যে একমাত্র হাইনের প্রভাবই তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্ষণিকা কবিতাগুলি যে এই হিন্দু তাপস ও সেই ফরাসীধর্মী জার্মান ইহুদি পরিচয়ের ফল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের হাইনের কবিতা মূল জার্মানে পড়বার প্রমাণ আছে, তাঁর

চিঠিপত্রে ৩০। হাইনের কিছু অনুবাদও তিনি করেছিলেন। হাইনের উল্লাসময় চিত্ত রবীন্দ্রকাব্যে ঐ সময়ে প্রভাব ফেলে থাকবে।

'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যে ধ্যানের জীবনের সঙ্গে কর্মোদ্যমের মিশ্রণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভারতীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করেছে।' কিশোর কবির রচনায় যে দেশ-প্রেম-চেতনা প্রকাশ পেয়েছিল সেই চেতনা গাঢ় হোল 'নৈবেদ্যে'। আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের উৎসাহে উপনিষদের বাণী শোনালেন কবি। মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক সম্ভাবনাকে সোৎসাহে প্রচার করলেন। দেশের প্রচলিত ধর্মে জনগণ বিশ্ব দেবতাকে মানুষের সঙ্গে সংস্রবহীন খণ্ডমূর্তিতে দেখে এসেছে, অখণ্ড মানব-দেবতার প্রতি লক্ষ্য দেয়নি। তাছাড়া রয়েছে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। বুয়রযুদ্ধে, সাম্রাজ্য লোলুপ রাজনীতিতে ইয়োরোপের সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা তখন প্রকট হয়ে পড়েছে। তাই আত্মশক্তিকেই কবি নির্ভর করতে বলেছেন। জ্ঞানযোগে বা কর্মযোগে বা ভক্তিযোগে কোন সিদ্ধি নেই। বিশ্বদেবতার করুণা অন্তরে সঞ্চারিত হওয়া চাই। মানুষের মধ্যেকার অনন্ত সম্ভাবনার ইঙ্গিতটি কবি যেমন উপনিষদ্ থেকে পেলেন, তেমনি বিশ্ব মানবতার মধ্যে বিশ্বদেবতাকে খুঁজে পেলেন কোঁত্-দর্শনের প্রভাবে। এই বিশ্বদেবতার ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছে পরেকার কাব্যগুলিতে। আপাতত এই পর্যন্ত বলেই থেমেছেন :

> তোমার বিচিত্র এ ভবসংসার
> কর্মপারাবার পারে হে
> নিখিল-জগৎ-জনের মাঝারে
> দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

কিংবা— ১।

> আজ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে
> সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
> গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
> তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ!
> আমি ছাড়ি নাই আশা ওগো মহারাজ। ৬২।

'নৈবেদ্য' রচনার পর উল্লেখযোগ্য কাব্য হলো স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশে লেখা 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ (১৯০৩)। 'চৈতালী'তে যে মৃত্যু-মাধুরীকে কবি প্রথম

আস্বাদ করেছিলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে সে মাধুর্যকে আরও নিবিড় করে পেলেন। টেনিসনের শোকস্মৃতি একাব্যে পড়েছে অবশ্যই। টেনিসনের ইন মেমোরিয়ামের

I felt and feel though left alone
His being working in mine.

মনে পড়ে, যখন পড়ি : 'আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আরও গভীর ও নির্লিপ্ত হয়েছে :

তোমার সে ভালো লাগা মোর চোখে আঁখি
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেল রাখি।
আজ আমি একা একা
দেখি দুজনের দেখা,
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।

এই রসোপভোগ, মৃত্যুজনিত বিরহের মধ্যেও নতুন দাম্পত্যজীবনের শুভ দৃষ্টির সূচনা টেনিসনে দেখিনি। এর পর লেখা হয়েছিল 'উৎসর্গ' এবং 'শিশু'র কবিতাগুলি। ১৯০৩ এর 'কাব্য গ্রন্থে' 'স্মরণ', 'উৎসর্গ' ও 'শিশু' প্রকাশিত হয়। এগুলি পুস্তকাকার প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯১৪, ১৯১৪ এবং ১৯০৯-তে। অবশ্য 'উৎসর্গ' নামে পৃথক বই হিসাবে এটি 'কাব্য গ্রন্থে'র অন্তর্ভুক্ত হয় নি। বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতার প্রবেশক রূপে এক একটি কবিতা লেখা হয়েছিল। সেগুলিই পরে 'উৎসর্গে' সংকলিত হয়। যাই হোক, এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি নিজের অন্তরের দ্বৈত রূপের সন্ধান পেয়েছেন। একটি মর্ত্যরূপ, আর একটি অতিমর্ত্য রূপ। অতিমর্ত্য রূপেই তাঁর যথার্থ পরিচয়। সেখানে তিনি নিখিলের আত্মীয়, বিশ্বলীলার রসিক। কবিহৃদয় যেন বিরহিনী নারী। সে দিন গুণছে, অদেখা প্রিয়ের প্রতীক্ষায় অশান্তচিত্তে। বৈষ্ণব পদাবলী ও মেঘদূতের মিশ্রবিরহের মাঝে মাঝে সেই unseen power, জীবন-দেবতার ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাবই হলো উৎসর্গের বিষয়। এই প্রতীক্ষারতার সিম্বলসূত্রেই 'খেয়া'র কবিতাগুলি গ্রথিত। ইতিমধ্যে শৈশব কল্পনার ওপর ভিত্তি করে তিনি কাব্য রচনা করলেন। স্ত্রী-বিয়োগ ব্যথা, মাতৃহীন শিশু-পুত্রের মূক বেদনা এবং কন্যার অসুখ কবি-হৃদয়ের বাৎসল্য-রসের দ্বার খুলে দিল। রোম্যান্টিক কবিরাই শৈশব-কল্পনাকে প্রথম সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে

প্রাধান্য দিয়েছিলেন। জীবনের সহজ সরল প্রাথমিক সত্যের অনুভূতির প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল, সেই সূত্রেই শৈশব জীবনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কল্পনার ওপর তাঁর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত একথা আমরা জানি এবং শেষ যুগের কাব্যের মধ্যেও এই শৈশব বিস্ময় মাঝে মাঝে জানান দিয়ে গেছে। 'শিশু' কবিতা রচনার কয়েক বছর আগে (১৮৯৯ সেপ্টেম্বর) প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ Alice Meynell এর 'Children' বইটি কিনবার জন্য বলেছেন। রোম্যান্টিকদের insights of childhood রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বভাবতঃই বিশেষ প্রবল ছিল, মিসেস মেনেলের 'Children' বইটিতে শিশু দৃষ্টির নবীনত্ব সম্পর্কে কোনো মন্তব্য তিনি পড়ে থাকলে তাঁর মনকে হয়তো নাড়া দিয়েছিল। তাই 'শিশু'কাব্যের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে আমরা 'great boys' (যে সমস্ত কবি, চিত্রকর ইত্যাদি তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে শৈশবের রোমাঞ্চকে ধরে রাখতে পেরেছেন তাঁদের মেনেল বলেছেন great boys)-এর পংক্তিতে নিশ্চয় বসাতে পারি।

'শিশু' কাব্যের কবিতাগুলি যেমন প্রকৃতপক্ষে সরল নয়, সরলতার প্রতীয়মান মাত্র এবং তাদের চারদিকে যেমন একটা রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তাতে জর্জ ম্যাকডোনাল্ড নামে এক অখ্যাত ভিক্টোরিয়ান কবির Poems for Children-এর প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর Where did you come from, Baby dear ? পড়লে রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা'র 'এলেম আমি কোথা থেকে' পংক্তিটি মনে পড়ে যায়, শিশুকে উভয়েই দেখেছেন বিশ্ব-জীবনের অংশ রূপে। কবি বলছেন :

> জানিনে কোন মায়ায় ফেঁদে
> বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
> আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে।

ম্যাকডোনাল্ডের কবিতায় রয়েছে : 'out of everywhere into here,' 'God thought about you and so I am here.'

রবীন্দ্রনাথের শিশু যেমন 'জগতের স্বপ্ন হতে' আনন্দ স্রোতে ভেসে এসেছে, ম্যাকডোনাল্ডের শিশুও তেমনি এসেছে 'out of the same box as cherubis wings.' রবীন্দ্রনাথের 'বীর পুরুষ' যেমন 'রাঙা ধূলোয় মেঘ উড়িয়ে' টগবগিয়ে ছুটবার স্বপ্ন দেখে, তেমনি ওই শিশুও ('Willie's) বলেছে :

I shall gallop and shout and call, waving my shining shord.

এ ছাড়াও ব্লেকের Songs of Innocence and Experience-এর কয়েকটি কবিতার চিন্তাসূত্রের স্পর্শ আছে 'শিশু'র মধ্যে। ব্লেকের The School boy-এর মধ্যে স্কুলে যাবার যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথের শিশুর মধ্যে পুথিপত্তর পাঠে বিরক্তি ও গল্প শোনার আগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে। টেনিসনের New Years Eve-এর

Though I cannot speak a word
I shall harken what you say.
And be often with you,
When you think I am far away,

এই পংক্তিগুলিব মধ্যে 'বিদায়' কবিতাটিব অন্তর্নিহিত সুর বেজে উঠেছে।

এর পরে 'খেয়া' কাব্য (১৯০৬)। 'খেয়া' কাব্যের কাব্য-গ্রন্থন সূত্রটির কথা আগেই বলেছি। বর্তমান জীবনের আশা-নিরাশা ব্যথা-বেদনা ক্লান্তি-অবসাদের মধ্যে নতুন জীবনের পূর্ণতার জন্য ধ্যানস্তব্ধ আত্মমুখী প্রতাক্ষা। নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 'খেয়া'র কয়েকটি কবিতায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মনেব মধ্যে একটা গোধূলিরাগ এসেছে যা বাইরের আঘাতে কিছুতেই দূর হচ্ছে না। অন্তরের মধ্যে দুই সত্তার প্রতীক্ষা ও সাক্ষাৎ চলছে। এক দিকে 'অন্তরতম-প্রিয় প্রয়াণ-পথিক রাজা' আর এক দিকে কবিচিত্ত 'গৃহকোণে অপেক্ষমানা বাসকসজ্জা বধূ।' এই সিম্বলে আমাদেরই দেশী ঐতিহ্য উঁকি দিচ্ছে। রাজা হলেন বুদ্ধ, বধূ হলেন চণ্ডালিকা। কিন্তু এই যে ভগবানেব প্রতি অভিসাবে সমস্ত অকস্মাতের আশা ত্যাগ করে 'এখন শুধু আকুল মনে যাচি / তোমার পরে খেয়া তরী ভাসা। জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি / ছেড়েছি আজ অকস্মাতেব আশা।'—এ romantic voyageটুকু বোম্যাণ্টিক কাব্যের প্রভাবে এসেছে। তফাত হচ্ছে, এই যাত্রায় রোম্যাণ্টিকদের অনিশ্চয়তা নেই, স্থির লক্ষ্য রয়েছে একটা।

'খেয়া'র পবে 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' (১৯১৪)। 'খেয়া'র এই যাত্রার চিত্র গীতাঞ্জলির গানেও দেখতে পাচ্ছি। কবি বলছেন :

জানিনে আর ফিরব কি না
কার সাথে আজ হবে চিনা
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।

কিংবা কবি বলছেন :

কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথ মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

কতকগুলি কবিতায় সহজ অনুভূতির মধ্যে পাওয়া সত্যকে কবি আকাঙ্ক্ষা করেছেন আমাদের দেশীয় মরমিয়া সাধকদের মতো। 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে যে বিশ্বদেবতাকে কর্মপারাবারের পারে দেখেছি, 'গীতাঞ্জলি'তেও দেখছি এই কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন :

হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে।

কিংবা,

ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচা কেনা।

কিংবা,

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো।

মানবতার পূজা যে ঈশ্বর পূজারই নামান্তর—কোঁতের এই প্রত্যক্ষ দর্শনের তত্ত্বকথা বাঙলা দেশেব কোঁত বাদীদের বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল। সমগ্র মানবতা যেখানে প্রত্যক্ষ বয়েছে সেখানে ঈশ্বরের ব্যর্থ অন্বেষণে লাভ কি? বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' এবং অরবিন্দের 'বাসুদেব' এই দুই দেশী নামের মধ্যে কোঁত্-দর্শনের প্রতিধ্বনি শুনি। হীন-পতিতের ভগবান যে বিশ্বজনের মাঝেই বযেছে, তাই বিশ্বজনেব মাঝে নেমে পড়বার জন্য কবির এত ব্যাকুলতা। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'রই একটি গানে সিম্বল সূত্রে এই ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করেছেন। তার থেকে অংশতঃ উদ্ধার করছি :

কী হবে, মা অমনতরো রাজার মতো সাজে
কী হবে ঐ মণিরতন হারে।
দুয়ার খুলে দাও যদি তো ছুটি পথের মাঝে
রৌদ্র বায়ু ধূলাকাদার 'পরে।
যেথায় বিশ্বজনের মেলা,
সমস্ত দিন নানান খেলা,

চারিদিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,
সেথায় সে যে পায় না অধিকার—
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন হার।

অন্তরতমের প্রতি আকর্ষণের জন্য কবিচিত্তে যে বিরহ জেগেছে তারই অপরূপ কাব্যরূপ হলো একষট্টি সংখ্যক গানটি :

সে যে পাশে এসে বসেছিল, জেগে দেখিনি
কি ঘুম তোর পেয়েছিল হতভাগিনী।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের Parable of the Ten Virgins-এর বক্তব্য এই ধরনের, তবে রূপায়ণের বিশিষ্টতা কবির নিজস্ব।

'গীতিমাল্যে' সেই unseen power-কেই আয়ত্ত করবার চেষ্টা। তার সঙ্গেই বিরহমিলন খেলা :

'এই যে তুমি', এই কথাটি
বলবো আমি বলে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
'আছ আছ'র স্রোত বহে যায়
'কই তুমি কই' এই কাঁদনের
নয়ন জলে গলে। ।১৪।

'গীতালি'তেও এই খেলারই অনুবৃত্তি। মাঝে মাঝে সেই romantic voyage-এর ছবি পাচ্ছি ; কেবল স্বস্তি এই যে :

হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।

জীবনের প্রতি তুচ্ছ বস্তুতে ঈশ্বরের পদ-পরশ অনুভব করে কবি যেন নতুন অর্থ পেয়ে নতুন জীবনের উপকূলে এলেন। রোম্যান্টিকদের ধ্রুব আদর্শের প্রিয় প্রতীক তারাগুলি (কীট্‌সের Bright star, would I were steadfast as thou art কিংবা শেলির Adonais-এর শেষ স্তবকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে) কবিকে এখানেও মাভৈঃ জানিয়েছে 'অনিমেষ নেত্রে'।

'বলাকা'য় (১৯১৬) এসে রবীন্দ্রনাথ নতুন জীবনের দিগন্ত খুঁজে পেলেন। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ও অ্যামেরিকায় ঘুরে এসেছেন। সমকালীন বিদেশী

কবি-সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পাউণ্ড তখন ফ্রান্সের ইমেজিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। কবিতার মধ্যে ছবি ও অন্তঃসংহতি আনতে ব্যস্ত। যে হ্যারিয়েট মনরো-র 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল সেই পত্রিকাতেই ইমেজিস্ট কবিতা (পাউণ্ড, অলডিংটন, হিল্ডা ডুলিট্ল্ ইত্যাদির লেখা) প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে অবশ্যই এই সংখ্যাগুলি পড়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব ঠিক পরবর্তী কাব্যগুলিতে (বলাকা, পলাতকা ইত্যাদি) এই ইমেজিস্ট সংহতির কোনো ছাপ নেই। তিনি তখন যুদ্ধ শঙ্কিত এই সংসারে জীবন-মৃত্যুব ওঠা পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের স্থায়িত্ব, প্রেম, শিল্প ইত্যাদিকে যাচাই শুরু করেছেন। ব্যক্তিগত লিরিক্যাল আবেগ এই সময় প্রায়ই বিশ্ব-প্রাণ-চৈতন্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আগেই এর আভাস পাওয়া গিয়েছিল 'নৈবেদ্য' কাব্যের 'অনন্তপ্রাণ' কবিতায়। বার্গসঁর তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলাকায় এক নতুন তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হলো। ১৯০৭ সালে বার্গসঁর Creative Evolution বইটি প্রকাশিত হয়। বিদেশবাসকালে বার্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় কবি তাঁর মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশ্বেব প্রাণ-প্রবাহে উভয়েই বিস্মিত। বিস্মিত হয়েই বার্গসঁ ক্ষান্ত, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নন। তিনি বিশ্বাস রেখেছেন এই জড়-জঞ্জাল-বিনাশী প্রাণ মানুষের মধ্যে কেবলই অতি-মানুষের উদ্বোধন ঘটাবার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে মানুষের লোভ-মোহ-আসক্তি ('চোরা ধন দুর্বহ সে ভার'—১১) যে সংঘর্ষ নিয়ে আসে সেই হলো সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে রাত্রির তপস্যা, রুদ্ররূপী ঈশ্বরের মার্জনা এই সংঘর্ষরূপেই নেমে আসে, রাত্রির তপস্যা 'রিক্ত আকাশে অন্তহীন নির্মল আলো'য় ভরা দিনে সার্থক হয়। মানুষের শিল্প (৭ম সংখ্যক), স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য মানুষের চেষ্টা (৬ সংখ্যক)-সমস্ত কিছুকেই জীবন-প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। কলাকৈবল্যবাদীদের প্রকোপে সৌন্দর্যের বন্দনা আগে করেছেন কবি, গোতিয়ের L'Art-এর পংক্তিগুলি :

All passes. Art aloneg has immortality
The bust of stone outlives the stone City.

তখন তাঁর প্রেরণার মূলে ছিল। কিন্তু বলাকায় সে 'সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জ প্রশান্ত পাষাণে' ফুটে উঠলো, 'এড়াইয়া কালের প্রহরী' তা অবিস্মরণীয় হতে চাইল, কিন্তু জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

কাজেই এই creative process (creation নয়) মানুষকে অতিমর্ত্য করবার চেষ্টা করেছে। কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বের কথা ছেড়ে দিলেও একথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বসৃষ্টি-প্রবাহের মতো জড় ও জীব সকলেরই ক্ষয় আছে, আর প্রতিমুহূর্তেই নতুন পদার্থের উদ্ভব হচ্ছে। এই চেতনা পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকেই এসেছে এবং বার্গসঁর কথা দিলেও 'বলাকার' পূর্বে ও পরে যে গতিচেতনা কবিচিত্তে কাজ করেছে তার পিছনে বৈজ্ঞানিক চেতনা অবশ্যই ছিল। তাছাড়া একথাও ভুললে চলবে না যে, 'feeling of life endless' রোম্যাণ্টিকদের একটা সাধারণ ধর্ম। ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের The Prelude, কীট্সের Endymion, শেলির Adonais তার উজ্জ্বল প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম এই রোম্যাণ্টিক ধর্মের পথেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে সেই সময়কার কবিজীবনে গতিচেতনা সম্পর্কে চিন্তাকে জোরালো করেছে নিজের নতুন বিশ্বপরিচয়, ইয়োরোপের জীবনবিক্ষোভ ও ইয়োরোপীয় দার্শনিক মহলের আলোচনা। বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগের সমসাময়িক আবিষ্কার সম্পর্কে কবির মোটামুটি ধারণা ছিল কৈশোর থেকেই। 'বলাকা' রচনার অনেক আগে ১৮৮৪ সালের একটি রচনা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করছি:

> এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পদচিহ্নহীন পথে অহর্নিশ হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, একনিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ....এমন একটি পৃথিবী কেন, যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ড বেগে কাঁপিতেছে, অতি বৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষ্য কোটি অযুত নক্ষত্র চন্দ্র, সূর্য, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, লক্ষ্য যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই, অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনল-গোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে ·· প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে, তখন কল্পনা অনন্তের কোন প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়। [কথাবার্তা, সন্ধ্যাবেলায়]।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞান-প্রমাণিত এই যৌবন, এই চিরবসন্ত কবির কল্পনাকে উদ্বোধিত করেছে। ভুলে-যাওয়া-যৌবন প্রকৃতির পট-পরিবর্তনের মাধ্যমে কবিকে জানিয়েছে চিঠি লিখে:

আছি আমি অনন্তের দেশে

যৌবন তোমার
চিরদিনকার।

প্রিয়াকেও এই বিবর্তনের মধ্যে মিশে গিয়ে রূপান্তরিত হয়ে নতুন নতুন প্রেরণার জন্মদাত্রী রূপে কবি দেখতে সুরু করেছেন। সেই বিবর্তনের রূপ হলো কবির ভাষায়:

চলছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ পাথারে।
পথেব দুধাবে
চলেছে ফুলের দল নীরব চবণে
বরণে ববণে,
সহস্র ধারায় ছোটে জীবননির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বচিত 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতায় যে গ্রহনক্ষত্রের কক্ষাবদ্ধ আবর্তনের বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাব্যে রূপ নিয়েছিল তা আরও বেগবান ও উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে 'বলাকা'র আট সংখ্যক কবিতায়, নদীর সিম্বলে:

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে:
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে,
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নি-ভরা মেঘে।
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে,
ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

বৈজ্ঞানিক চেতনা ও চিন্তার ফলশ্রুতির কথা বাদ দিলে দেখি, বলাকার

কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতার (ছয়-সাত ও একুশ সংখ্যক) প্রেরণামূলে কাজ করেছে বোধহয় শেলির 'Adonais'। বলাকার যৌবনরূপী বসন্ত আর জীর্ণতারূপ শীতের চিত্রকল্প 'Adonais'-এর অন্যতম চিত্রকল্পগুলির প্রধান। 'Adonais'-এর 'immortality theme' বলাকার কবি নিজের দর্শনে যেন 'জারিয়ে' নিয়েছেন।

ক। পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।......
তুমি চলে গেছ দূরে।

খ। আছি আমি অনন্তের দেশে।

কীট্সকেও শেলি এই চোখেই দেখেছেন :

ক। Dust to the dust ! but the pure spirit shall flow
Back to the burning fountain whence it came,

খ। The One remains, the many change and pass ;
Heaven's light for ever shines, Earth's shadows fly,

কীট্সের মধ্য দিয়ে শুধু যে জীবনের অতিমর্ত্যরূপকে শেলি বড় করে দেখেছেন তা নয়, জীবনের ক্ষণিক রঙীন উজ্জ্বলতার প্রতি তাঁর টান যে কম নয়, তারও প্রমাণ :

Life, like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until death tramples it to fragments.

মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবন অপূর্ব বর্ণময় হয়ে উঠেছে এই পংক্তিগুলিতে। রবীন্দ্রনাথও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মধ্যকার এক একটি নবোদ্ভূত শিল্প বা জীবনকে ঠিক এই রকমই বর্ণময় করে দেখেছেন :

ক। হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক........

খ। উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি,

বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই-চাঁপা-বকুল-পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।

কিন্তু 'বলাকা' প্রসঙ্গে এও শেষ কথা নয়। কবি সমস্ত বিশ্ব-চেতনাকে আত্মচেতনায় রূপান্তরিত করেছেন এখন। তাঁর 'বিশ্বকবিত্বে'র শুরু এই-খানেই। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই বিশ্বপরিস্থিতির সংকট তাঁকে আঘাত করেছে। এক দারুণ অস্বস্তিতে কবি বলছেন :

সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙ্গা-চোরার আয়োজন হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন।

'বলাকা'র প্রেরণায় ছিল এই অনুভূতিও, গতি-চেতনা ও যৌবনের আবেগে যা আরও শক্তিমান হযেছিল :

ক। ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ। [৩৭]

খ। রাত্রির তপস্যা সে কি আসিবে না দিন।

এগারো ও সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে।

'পলাতকা' কাব্যে (১৯১৮) 'বলাকা'রই অনুবৃত্তি। তবে ভাষ্য হিসাবে নয়, উদাহরণমালা হিসাবে। 'বলাকা'র আহ্বান যেন 'পলাতকা'র ব্যক্তি-জীবনে বিদায়ের সুর তুলেছে। বলাকার আহ্বান এই বন্দী প্রাণীগুলির মধ্যে মরণের ভিতর দিয়ে পূর্ণ পরিণতির পথ করে দিয়েছে। 'পলাতকা'র গল্পিকাগুলির নায়িকারা 'মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়েই' মুক্তির দিকে এগিয়ে গেছে :

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি।
দাও খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের
পারাবার। 'মুক্তি'।

'শিশু ভোলানাথ'-এ (১৯২২) ভিড়ের বন্দীশালা থেকে পালিয়ে কবি-চিত্ত

নতুন করে শৈশবের মুক্ত প্রাঙ্গণে ছুটি পেয়েছে। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে লিখছেন কবি :

> আমেরিকার বস্তু গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। প্রাচীনের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে মুক্ত করবার জন্যে।

শিশুর দেখা সর্বত্র পাওয়া না গেলেও শিশুতত্ত্বের স্বরূপ সর্বত্রই আছে। শিশুমনের বাসনা-প্রকাশে জীবনরসের পরম রসিক কবি প্রায়ই ধরা দিয়েছেন। 'শিশু' কাব্যের প্রতিধ্বনি কয়েকটি কবিতায় আছে। যেমন 'সময়হারা' বা 'মুখু' কবিতা। যাই হোক, 'সভ্যতা'গ্রস্ত মন শিশুর মত স্নিগ্ধ, নির্মল, ও মুক্ত হতে চাইছিল, তাই কবি প্রথম কবিতাতেই বলে দিয়েছেন :

> দেরে চিত্তে মোর
> সকল ভোলার ঐ ঘোর,
> খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।

এই বছরই কবির একটি গদ্যকাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে বইটি হলো 'লিপিকা'। কবি নিজেই বলেছেন যে, এই কবিতাগুলিকে কাব্যের আকারে সাজানো হয়নি, কারণ গদ্যকাব্য ব্যাপারটাকে চালাতে সাহস করেন নি তিনি। আর কাব্য সঞ্চয়নের মধ্যেও ('চয়নিকা') স্থান দেন নি লিপিকাকে। 'লিপিকা'র গদ্যকাব্যগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুষ্পাঞ্জলি'র (১২৯২, বৈশাখ) কোনো কোনো রচনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুরোনো ও নতুন রচনাগুলির মধ্যে প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধান। এই ধরনের রচনার আদর্শ তিনি বিদেশী Poems in Prose (তুর্গেনেফের Poems in Brose-এর পুরোনো সংস্করণ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে। মনে হয় এ বই তাঁরই ব্যবহৃত) জাতীয় রচনা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি-প্রধান বিদেশী personal essay জাতীয় রচনা থেকে পেয়েছিলেন নিশ্চয়। কাব্যরীতি প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

১৩২৯-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বলাকার' কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি লিখছেন[৩২] :

> এই কবিতা (বলাকা ৪) যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে

ছ'মাস বাকি আছে। তারপর বেজে উঠেছে শঙ্খ, ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক, তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনও আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী-কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সার্বজাতিক লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমঁ্যা বোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলেব লোক। এবা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আব বিলম্ব নেই। পাখিব দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

'পূরবী' কাব্যের (১৯২৫) কতকগুলি কবিতায় এই নব যুগারম্ভের উদ্দীপ্ত আভাস পাওয়া যায়:

ক। এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ মাঝে। পঁচিশে বৈশাখ।

খ। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়।
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।
উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত মাঝে
চিরনূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ। ঐ

গ। মৃত্যুভয়ের ডমরু রব শোনাই কলস্বরে
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে। ঝড়।

'পূরবী'তে কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে, যেগুলি বৃদ্ধ বয়সে কবির অমেয়জীবী-যৌবনের সাক্ষ্য দেয়নি। এসব কবিতায় প্রেমের স্মৃতি এবং বিনষ্ট

বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। কোনো কোনোটিতে কৈশোর প্রেমের স্মৃতি, কোনো কোনোটিতে বর্তমান অপর্যাপ্ত প্রেমের চরম প্রতিদানের ক্ষেত্রে রয়েছে বার্ধক্যজনিত ব্যর্থতা।

ক। যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল,
অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে,
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল
নাম ভুলে যাওয়া
প্রেয়সীর নিশ্বাসেব হাওয়া
যুগান্তর-সাগরেব দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।

অতীত কাল।

খ। হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।
দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে। আশঙ্কা।

কিন্তু সব সময়েই কবির মনে সেই রোম্যাণ্টিক নিঃসঙ্গ যাত্রার অনুভূতি। দূরের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের পরিচিতা-অপরিচিতাদের 'বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে' আহ্বানে কবি সাড়া দিতে দিতে যেন চলেছেন। 'যাত্রী'তে লিখছেন (ফেব্রুয়ারী ১৯২৫): 'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' মনে হয় স্মৃতিতে রয়েছে ফাউস্টের সেই ভালো-লাগা পংক্তিটি[৩৩]: 'Thou must do without, must do without'.

'দোসর' কবিতাটিতে কবি বলছেন:

কোন শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে,
তাইতো আমি চিরজনম একলা থাকি।

'আহ্বান' কবিতার সেই 'মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছে রমণী,

নীরব নিশীথে', সে-ই তাঁকে একলা পথের পথিক করে ছেড়েছে। বিরহকেই তিনি সম্পদ করেছেন। বাস্তব জীবনের নারী এসে কবিচিত্তে তাই বিরহেরই মীড় লাগিয়েছে। যৌবনারম্ভে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' কবি যে আদর্শ প্রেমের ওপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে প্লেটোর Symposium-এর আদর্শই গৃহীত হয়েছিল। তাই দেখি, কবি-জীবনে ক্ষণিকারা চিরকালের হয়ে দেখা দিয়েছে। 'যাত্রী'তে তিনি একথা বলেছেন (৫ই অক্টোবর ১৯২৫)। ইন্দ্রিয়-বাসনার Pandemus কবি-কল্পনায় বারবার স্বর্গের Uranian হয়ে দেখা দিয়েছে :

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমাব।
সব ছেড়ে যাব প্রিয়ে
ফিবে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী। শেষ বসন্ত।

'পূরবী'র মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ যেমন প্রেমানুভূতিব উপলক্ষ্য হয়েছিল, 'মহুয়া' (১৩৩৬, ১৯৩০) কাব্যে তেমন কোন উপলক্ষ্য নেই, এ কাব্যের প্রেমকবিতা-গুলি নৈর্ব্যক্তিক, বিশুদ্ধ প্রেমই তার বিষয়। প্রেমের মধ্যে বিরহের দিকটি কবিকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে, কারণ বিবহেই প্রেমের সহনশীলতার চরম পরীক্ষা। আর সে সহনশীলতাবই অন্য নাম বীরত্ব, পাষণ্ডের ভোগকে প্রেম বলা যায় না। এই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতেই কবি বিচ্ছেদের পটভূমিকায় মিলনের ক্ষণিক উল্লাসকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। 'দায়মোচন' ও 'বাসরঘর' কবিতা দুটিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'দায়মোচনে'র শেষ কটি পংক্তি উদ্ধার করছি :

প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাইনি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়। দায়মোচন।

'বিচ্ছেদ' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান।
তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ।

এই বিশুদ্ধ প্রেম প্রকৃতপক্ষে Uranian-এরই জয়গান। ইন্দ্রিয়-লালসায় যে Pandemus-এর অধিষ্ঠান তাকে বাদ না দিলে বিশুদ্ধ প্রেমকে পাওয়া যায় না। ডিয়োটিমা একেই বলেছিলেন spritual loveliness। ভালোবাসা হলো কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অমৃতলোকে মর্ত্যজীবনের উজ্জীবন। এই সব ধারণা কবির মনে সেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' রচনার যুগ থেকেই যে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল সেকথা আগেই বলেছি। বাস্তবের আবরণ না খসে গেলে স্বার্থও যায় না। আমিয়েলের জার্নালের কথা তাঁর নিশ্চয় মনে ছিল: Love is the forgetfulness of self। তাই কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল-স্তুতির মতোই কবি বলছেন:

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে,
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।
ওগো আমি বাঁধন ছাড়া পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণার তারে মূর্তি জাগে
রাগিণীতে মুক্তি সে দেয় ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না শোনা গান বাঁধে যে তার সুর। বন্দিনী।

'মহুয়া' কাব্যের সময় থেকেই কবি ছবি আঁকছিলেন। ছবিতে নারী প্রাধান্য পেয়েছিল। সে সব নারী-মূর্তিতে একটা অন্ধ শক্তির প্রকাশ দেখা দিয়েছিল। আকারে কেউ প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার আভাস এনেছে, কেউ রহস্যময় আধো-ঘুমন্ত স্বপ্ন-দেখা মূর্তি হয়ে এসেছে। এই ছবিগুলি যেমন

প্রাকৃতিক ও রহস্যময়, 'মহুয়া'র মধ্যেও তেমনি প্রকৃতিরই রহস্যময় সৃষ্টি নারীরত্ন-মালা। 'বনবাণী' (১৯৩১) 'মহুয়া'র পরিপোষক। কারণ এখানে প্রকৃতিরই নিহিত প্রাণোচ্ছ্বাস কবির অর্ঘ্য পেয়েছে। তাঁর ছবি, নারী আর প্রকৃতি একই রহস্যের মূর্তিতে জীবন্ত। জড় ও জীবজগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চেতনা আবার এখানে অপূর্ব কাব্য রূপলাভ করেছে। জগদীশচন্দ্রের সাহচর্য এক্ষেত্রে স্মরণীয়। প্রথম কবিতা থেকেই উদাহরণ তুলছি :

সুন্দরের প্রাণ মূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিল আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা। বৃক্ষবন্দনা।

'মানুষের ধর্মে' কবি এই বৃক্ষকেই আবার মানুষের পরিবেশস্রষ্টা, রসরূপের বিধাতা, সূর্যরশ্মি-সমৃদ্ধ তেজের উৎস বলেছেন। বৃক্ষের অন্তর্লীন যে প্রাণশক্তি তাতেই মানুষ প্রাণবান। কবির বনবাণীর দৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি দৃষ্টির সঙ্গে মিশেছে ঔপনিষদিক প্রাণ-প্রবাহ-চেতনা। কিছুটা বার্গসঁর গতি-তত্ত্বও কাজ করেছে। কবি 'বনবাণী'র ভূমিকায় বলেছেন :

> তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ, প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গি, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

৪

'পরিশেষ' কাব্যে (১৯৩২) কবির জীবন-স্মৃতিলোক উদ্ঘাটিত। এতকাল কবি যে বিরাট জীবনের প্রাণস্পন্দন শুনে এসেছেন তাকে কেবল স্পর্শ

করেছেন মাত্র, এই তাঁর ক্ষোভ। এই জীবনসঙ্গীতের শমের কাছাকাছি এসে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির অধিনেতার পদপ্রান্তে নর্মবাঁশি-রূপ কবিসত্তাকে সমর্পণ করেছেন। একদিকে বিদায়ের সুর যেমন বেজেছে ('জন্মদিন') তেমনি অবিরাম পথচলার মধ্য দিয়ে মুক্তির তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ('পান্থ') কখনো জীবনের হিসাব নিকাশের পর পূর্ণতার রূপটিকে খুঁজছেন ('অপূর্ণ'), কখনো পুরোনো প্রেমের স্মৃতি ঝলক দিয়ে উঠেছে ('আরেক দিন'), কখনো বা তার আভাস পাওয়া গেছে ('কণ্টিকারি')। কিন্তু এ সব ছাড়াও কবির মধ্যে নতুন দুটি বক্তব্যকে আমরা পাচ্ছি। প্রথমত, কবি মানুষের অতি কাছাকাছি থাকবার অভিলাষী।[৩৪] ধরণীর সমস্ত কিছুকে প্রাণ মন ভরে গ্রহণ করে বিদায় নেবার জন্য উৎসুক। দ্বিতীয়ত, নতুন কালের বুদ্ধিজীবীদেব প্রতি কবি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। প্রথম বক্তব্যটির সমর্থনে উদ্ধার করা যেতে পারে :

ক। আমি কবি আছি
ধরণীব অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়। — পান্থ।

খ। ঐ ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি। — আছি।

'জন্মদিনে' কাব্যের 'ঐকতান' কবিতায় এই অনুভূতি পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। বিরাট জীবনের স্পন্দন, সমস্ত কিছুকে আয়ত্ত কববার ইচ্ছা : 'ঐক্যবন্ধে বাঁধি এইসব/ভালো মন্দ সাদায় কালোয়/বস্তু ও ছায়ায় গডা মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়'। এই অনুভূতির পিছনে সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশ যেমন আছে, তেমনি আছে হুইটম্যানের গণতান্ত্রিক চেতনা ও জনজীবনের কবি হবার আদর্শ। উনিশ শতক থেকেই হুইটম্যানের সঙ্গে কবি পরিচিত, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'হুইটম্যানের মতো করে লেখা' ইংরিজি কবিতা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন (১৩১৯), সান্ধ্য মজলিশে তিনি হুইটম্যানের কবিতা পড়েও শোনাতেন। অ্যামেরিকাতে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত interview নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অন্ততঃ তিন চারটিতে তিনি হুইটম্যানকে অ্যামেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—[Rabındranath Tagore discovers America by Bialey Millard, Bookman. Nov. 11, 1916, কর্তিকা সংগ্রহ : Vol. 8, Page 278-281] :

Whitman is your greatest poet. To me his is the highest name. In poetry one must have orginality and spontaneity and that breadth of thought which tells you that the poet has seen deeply and knows humanity. Whitman gives me pictures—pictures. Through his work I know your country and I catch its heart-beat .... His is the great voice of your nation, the greatest it ever has had. I see nothing in the more carefully written recent verse that gives me no more than mere echoes. His was a voice—not an echo. I like those poems of the states and that one of your Lincoln : 'O Captain, my captain !' Do not tell me that your critics call him crude. Whitman speaks to me—that is enough.

দ্বিতীয় মনোভঙ্গিটি ফুটেছে 'নতুন শ্রোতা' এবং 'শূন্য ঘর' কবিতা দুটিতে। 'নতুন শ্রোতা'তে নতুনকালের বুদ্ধিবাদের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। তার স্বরূপটি বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন :

গোপনে তার মুখের পানে চাহি
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুন কালের শান দেওয়া তার ললাটখানি খর-খড়্গ সম
শীর্ণ যাহা জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে যা সাবধানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি
তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য। নতুন শ্রোতা।

'শূন্য ঘর' কবিতাটিতে কবির পুরাতন বক্তব্যই বুদ্ধি-দীপ্ত ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত হয়েছে। সে ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ ভাষায় এবং ছন্দেতেও আছে। সে কথা পরে আলোচ্য। নতুন ছন্দ-পরীক্ষার সূচনাও এই সময়ে। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ভারতী গোষ্ঠী ও সবুজপত্র গোষ্ঠীর মারফত বাঙলা দেশে

নতুন উদ্যমে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি সাদরে স্বীকৃত হলো। ক্ষুরধার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটলো। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাবে-ভাষায়-ছন্দে প্রকাশ পেল। উনিশ শতকের শেষ দশকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকে ইয়োরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে, বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ Intellectual নামে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই বুদ্ধিজীবীদের অগ্রদূত হয়ে এলেন। বিদেশী চিন্তায় উদ্দীপ্ত বাঙালী তরুণেরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাদের আদর্শ দেখতে পেলো। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভবিষ্যৎ যুগন্ধরদের ইতস্তত আভাস দিলেন গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে। নতুন শ্রোতা এই যুগেরই শ্রোতা।

এই বছরেই প্রকাশিত হলো 'পুনশ্চ' (১৯৩২)। এই কাব্যে কবি বিষয়ের দিক থেকে যেমন নির্বিচার, তেমনি বাঁধাধরা ছন্দের প্রতি কবির অপক্ষপাতের পিছনে হুইটম্যানীয় ধরনের মানবতাবোধও বিশেষ প্রবল। হুইটম্যান বিষয়ের ব্যাপারে একাধারে 'remarkable' এবং 'intentional'। কবিতার পক্ষে কিছুই অবহেলার বস্তু ছিল না তাঁর কাছে। 'Felon, slave, prostitute, diseased, healthy, beautiful' সমস্তই তাঁর কাব্যের বিষয়। দেহ এবং আত্মা সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর কাব্যে। 'পুনশ্চ' কাব্যের বিষয় গ্রহণেও কবি নির্বিচার। 'অপরাধী', 'শেষ দান', 'কোমল গান্ধার', 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী', 'বালক', 'কীটের সংসার', শালিখ', 'একজন লোক', 'অস্থানে', 'ঘরছাড়া' ইত্যাদি কবিতায় কবির এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অপরাধী তিনুকে কবি গ্রহণ করেছেন। কেবল মানুষ বলেই গরীব, ধুলোর ওপরকার কাঞ্চনগাছের দান, সামান্য বেগনি ফুলের সম্ভার কবির শ্রদ্ধা পেয়েছে। সাধারণ মেয়ে কবির মনে কোমল গান্ধারের অবুঝ বেদনা জাগিয়ে গেছে। ছোট ছেলের আপন জগতের কবি হবার ব্যর্থতা তাঁকে বেজেছে। অদ্ভুত চেহারার সহযাত্রী অভিজাতদের মনে দাগ রেখে দিয়েছে বিদায়ের ক্ষণে। বালক কাল যে সামান্যকে অসামান্য করবার কাল এই সুযোগে কবি বুঝিয়ে দিলেন 'বালক' কবিতায়। কীটের সংসারে পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা সরলো না কবির সামনের থেকে। সেই আক্ষেপে শালিখের মনের ভাবনাগুলোকে খুঁজে চললেন। কোন মানুষ যে একজন 'লোক' এইটুকুতেই অনেক রহস্যের আভাস পেলেন কবি। অবোধ চামেলির মৃত্যুতে তিনি ব্যথিত হলেন। স্বদেশছাড়া

পরিচয়হীন মানুষের চলাফেরার মধ্যে দেখতে পেলেন কবি আনাগোনার বড় রাস্তা। সব মানুষের মধ্য দিয়ে সে রাস্তা যাবে। সে রাস্তা যেন অনেকটা হুইটম্যানের ধরনে Song of the open road গাওয়ার মতো। উল্লেখযোগ্য যে আগের একটি চিঠিতে সব শ্রেণীর মানুষকে মিলিয়ে শ্রীনিকেতন গঠনের আদর্শ বর্ণনায় কবি এই কবিতার উল্লেখ করে বলেছিলেন: 'বিদ্যালয়ের চিত্তের ভিতরে এই Song of the open road জাগিয়ে তুলতে চাই'।[৩৫]

বিষয়বস্তুকে যেমন নির্বিচারে গ্রহণ করলেন তেমনি এই কাব্যের কতকগুলি কাহিনী কবিতায় কবি বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিলেন। নন্দ-গোপালের মত কবিও 'অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি' হলেন। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', 'ক্যামেলিয়া' এবং 'বাঁশি'র মধ্যে প্রেমকে বাস্তবজীবনের ছাঁচে ফেলে দেখা হলো। প্রতিবাদ, ব্যর্থশ্রম, অভিমান, পৌরুষ দেখাবার হাস্যকর প্রচেষ্টা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আক্রোশ ও দারিদ্র্যের আঘাতে প্রেম এক্ষেত্রে যেন অতি-বাস্তব ছোটগল্পের বিষয়রূপে এসেছে। 'সাধারণ মেয়ে', 'খ্যাতি' 'উন্নতি', 'রঙরেজিনি', 'প্রথম পূজা', 'শাপমোচন' ইত্যাদি কবিতায় মানুষের সহজ রূপ এবং তার অন্তরের মূল্যটিই কবির কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'শাপমোচন' কবিতায় কুশ্রী রাজা যখন গানের সুরে বাণীকে মুগ্ধ করলো—তখনই কবির মূল লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এই অন্তরের টানেই হুইটম্যান সাধারণ মানুষের cruel, beastly hoggish স্বভাবের মধ্যেও তার আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের এক শিষ্য হোরেস ট্রবেলকে হুইটম্যান লিখেছিলেন: 'Everything comes out of the dirt—everything comes out of the people.. .. not university people, not F. F. V. people, people, people, just people.'

সাধারণভাবে সমাজ-চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হুইটম্যানের এই গণমানস-সংযোগের আদর্শ রাশিয়া-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল বলেই মনে হয়। [এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আমার লেখা 'রবীন্দ্র অন্বেষা', (১৯৭২) গ্রন্থের 'হুইটম্যান ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি]।

'পুনশ্চ' কাব্যের দুটি কবিতা 'শিশুতীর্থ' ও 'তীর্থযাত্রী' সম্পর্কে দু-একটি কথা বলবার আছে। ১৯৩০-এর জুলাইতে কবি যখন মিউনিকে, তখন ওবের-আম্-মার-গাউতে যীশুখৃষ্টের দুঃখময় জীবনের অভিনব 'প্যাশান প্লে' দেখে

ইংরিজিতে তিনি The Child নামে কবিতাটি লেখেন। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর এইটিই অনূদিত হয়ে অভিনীত হয় 'শিশুতীর্থ' নামে। বাইবেলের এই গল্পটি তাঁকে যে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ এই কবিতা। এই গল্পটির প্রতি আকর্ষণের আরও প্রমাণ টি. এস. এলিয়টের Journey of the Magi-এর অনুবাদ 'তীর্থযাত্রী'। সে কবিতাটি এই 'পুনশ্চ' কাব্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নতুন করে মানবতাবোধের টানে কবি এ যুগে যে আকৃষ্ট হয়েছেন সেই সূত্রেই আর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'পুনশ্চ' কাব্যে অন্তর্ভুক্ত 'মানবপুত্র'। মানবতার সূত্রে এই তিনটি কাবতা 'পুনশ্চ' কাব্যেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষের কবি ভগবানের পুত্রকে বলেছেন 'মানবপুত্র'। 'শিশুতীর্থ' কবিতাব মধ্যে শেষ পর্যন্ত মানুষেব যাত্রীদল খৃষ্টের জন্মস্থানের নিকটবর্তী হয়ে যে বিচিত্র কর্মের ধ্বনিগুঞ্জন শুনেছে সেই বর্ণনাতে হুইটম্যানেব 'I hear America singing, the varied carols I hear'-এর ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়। পড়ার কারণ, যে সাধারণ জীবনযাত্রাব পবিবেশে খৃষ্টের জন্ম—সেই সাধারণ জীবনযাত্রার ধ্বনি, সকল শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র কর্মের কলবব হুইটম্যানের ওই কবিতাতে শোনা গিয়েছিল। সেই সূত্রেই হুইটম্যানের ওই কবিতাটি কবির স্মরণে এসেছে মনে হয়। উভয়ের কবিতা থেকে অংশত উদ্ধাব কবছি :

> পথেব দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
> পরিণত-শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ু হিল্লোলে দোলায়মান—
> আকাশেব স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
> গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
> প্রতি দিনের লোকযাত্রা শান্তগতিতে প্রবহমান।
> কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জন স্বরে,
> কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
> রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
> বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।

হুইটম্যানের কবিতাটিতে আছে :

> The carpenter singing his as he measures his plank or beam.…
>
> The wood cutter's song, the plough boy's on his way in morning, or at noon intermission or at sundown,

The delicious singing of the mother, or of the young wife at work, or of the girl sewing or washing,………

'শিশুতীর্থে'র কোনো কোনো অংশে সন্থ-দেখে-আসা 'প্যাশান প্লে'র ছাপ কোথাও কোথাও রয়ে গেছে। যেমন:

'বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি/ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করবো, / কেন না, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত। সেই মহামৃত্যুঞ্জয়। / সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে / জয় মৃত্যুঞ্জয়েব জয়।

'প্যাশান প্লে'র শেষ Tableau-র কোরাসে বলা হয়েছে—

Hallelujah !
Over come !—over come !
The hero hath conquered
The might of the foe !
Few hours only in the gloom
Of the grave hath he slept !

'শিশুতীর্থে'র শেষ চারটি পংক্তিতে রয়েছে:

জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানুপেতে বসলো, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী
জ্ঞানী এবং মূঢ়,
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে: জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের ওই চিরজীবিতের॥

'প্যাশান প্লে'র অন্তিম কোরাসেও [Finale, Ascension] এই চিরজীবিত মহামৃত্যুঞ্জয়ের বন্দনা:

Praise him, conqueror of death
Once codemned on Glogatha !
Who for us on Calvary died !
Praise to thee, who on the Altar
Gavest thy blessed life for us !

Thou hast purchased our Salvation

After death—Eternal life ! [১৯৩০-এর সংস্করণ থেকে]

'বিচিত্রিতা' কাব্যে (১৯৩৩) মৃত্যুর কাছাকাছি এসে কবি জীবনকে 'সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর' দেখেছেন। পূর্বেকার কাব্যের ধরণীর অতি ঘনিষ্ঠ থাকার সেই অনুভূতি এখানেও আছে :

ধরণীর বনগন্ধি আতপ্ত নিশ্বাস
মৃদুমন্দ লাগে গায়ে, তখন সে ক্ষণে
অস্তিত্বের যে ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরে উঠে মনে,
প্রাণের যে প্রশান্ত পূর্ণতা, লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই,···· শ্যামলা।

এই ধরনের অনুভবের পিছনে যে সম্ভাব্য সাহিত্যিক ও সামাজিক চিন্তাসূত্র রয়েছে সে কথা আগেই বলেছি।

'শেষসপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যে প্রকৃতি ও কৈশোর-প্রেমের স্মৃতি কতকগুলি কবিতার বিষয় জুগিয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্রেই কবি তাঁর পুরোনো ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। যৌবনের যে 'বিচিত্ররূপিণী' প্রকৃতির মধ্যে নানা রঙের আভাস দিয়ে গেছে, সেই 'বিচিত্ররূপিণী' এখন পরিপূর্ণরূপে প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রেমানুভূতির মধ্যে বিরহকেই তিনি সম্পদ করেছেন। এও সেই পুরোনো ভাবনারই জের। এই সম্পদকে রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান কবিদের ভাবনা এবং বিশেষ করে মেঘদূতের ভাবনা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন কবি। কতকগুলি কবিতায় কবির জীবন-সংস্কার মোচনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, নিত্যকালের সঙ্গে যুক্ত কবির 'আমি'-কে বলতে শোনা গেছে 'তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও, / জীবলীলার মানুষকে।' সাহিত্যেরও নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন, 'একে নাম দিতে পারি সাহিত্য, সব কিছুর সঙ্গে থাকা।' প্রিয়াও এসেছে সার্বজনীন পথে সাধারণ সংস্কারমুক্ত সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে : 'এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে, / মুক্ত পথের 'পরে'। কবির রোমান্টিক অভিসারের উচ্ছ্বাস কেটেছে, এখনও কবিচিত্ত চলেছে, তবু যাত্রাপথের আকর্ষণের চেয়ে লক্ষ্যের দিকেই তাঁর ঝোঁক। সেই লক্ষ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধ। জীবনের অন্তিম ডাক শুনেছেন, কাজেই প্রাপ্তির জন্যে মনে মনে হয়তো খানিকটা অধীর। তাই প্রশ্ন :

অন্ধকারে সে দেখেছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তাঁর শেষ? । ৩৫ ।

তাই কারিগরের হাতে কবি দেখেছেন নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা। 'বীথিকা' (১৯৩৫) কাব্যেও একই ভাবনার অনুরণন। সেই প্রেমের বিরহ, সেই মহানৈঃশব্দের জন্য শান্ত প্রতীক্ষা। 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যে সংসারের প্রতি শেষ বিদায়ের মাধুর্যপূর্ণ দৃষ্টি:

বিরাট প্রাণে, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহ মনে । ৩ ।

এই বিরাট প্রাণের সঙ্গে যোগের কথা কবি বলেছেন, অনেকটা যেন হুইটম্যানের ভঙ্গিতে:

বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে। । ১৩ ।

আগেই বলেছি, হুইটম্যানের কবিতা কবির বার্ধক্যের চিন্তাকে যে বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই বিশ্বযোগে বিহারের কথাই হুইটম্যান ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর Salut au Monde-তে:

My spirit has pass'd in compassion and determination
around the whole earth.
I have look'd for equals and lovers and found
them ready for me in all lands.
I think some divine rapport has equalized me with them.
You vapors, I think I have risen with you, moved away
to distant continents, and fallen down there, for reasons,
I think I have blown with you, you winds;
You waters I have finger'd every shore with you,
I have run through what any river or strait of the
globe has run through,
I have taken my stand on the bases of peninsulas
and on the high embedded rocks, to cry thence:

Salut au Monde !

What cities the light or warmth penetrates I penetrate
those cities myself,

All islands to which birds wing their way I wing
my way myself·· *Leaves of Grass.*

'শ্যামলী' কাব্যে (১৯৩৬) রয়েছে প্রেমস্মৃতি, মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা এবং সেই সূত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা এবং 'পলাতকা'র কাহিনী-কবিতার মতো কবিতা যাতে আছে জীবনেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলিব অতি পবিমিত প্রকাশ। জড ও জীববিজ্ঞানের তথ্যগুলি কবি কী ভাবে জারিয়ে নিয়ে রসেব কোঠায় তোলেন তার প্রমাণ আগে দিয়েছি, এখানে আর একটি দিচ্ছি। 'শ্যামলী' কাব্য প্রকাশের মাস ছয়েক বাদেই কবি 'বিশ্বপরিচয়ে'র উপসংহাবে লেখেন :

আমরা জড-বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, আপাত দৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতিহীন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতিব ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিবই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতম বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আব কিছুই যখন পাওয়া যায় না তখন বলা যেতে পাবে, চৈতন্যে তাবই প্রকাশ। জড থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের চৈতন্যের আববণ ঘোচাবাব সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টিব শেষ পরিণাম।

এই সিদ্ধান্তই 'শ্যামলী'র 'কালরাত্রে' কবিতার শেষ স্তবকে প্রকাশ করেছেন :

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাত সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলাম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ ;
ডিঙিয়ে গেলাম দেহের বেড়া
পেরিয়ে গেলাম কালের সীমা,
গান গাইলেম 'চাইনে কিছু চাইনে',
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,

যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা। কালরাত্রে।

কম্যুনিজমের আদর্শ আমাদের জীবনে যে আহ্বান জানিয়েছে, যে আহ্বানের প্রেরণায় আমরা উপকরণের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে এসেছি তারই প্রকাশ শ্যামলী'র 'অমৃত' নামক কবিতায়। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা (চিঠিপত্র ১১) ঠিক এই সময়কার (২৮ জুলাই ১৯৩৬) একটি চিঠি থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার ধনসাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ইংরেজ শাসনের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হবে বলে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করছি :

সোভিয়েট রাশিয়াব নাম করা এদেশে অপবাধ-বিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে না করেও থাকতে পাবিনে। ধনস্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থনীতি এতই অশ্রদ্ধেয় যে তাব সম্বন্ধে চিন্তা বা আলোচনা বা গ্রন্থপাঠের স্বাধীনতা পুলিশের দণ্ডাভিঘাতে দণ্ডনীয়, কর্তাদের এই মনোভাব ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তর্ক থাক। .... আমি কেবলমাত্র তুলনা করছি সেখানকার সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র ও আরোগ্য বিধানের। উভয় বাজ্যের এই বিপুল প্রভেদের মূল কারণ, এম্পায়ার নামধাবী বাহ্যিক জীবের মধ্যে সেই দ্বিখণ্ডতা স্তম্ভিত যাব ভিতর দিয়ে সজীব দেহের স্নায়ুর যোগ নেই, যোগ আছে শাসন-বন্ধনের। এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধেব ভিতব দিয়ে ইংরেজ কর্তারা আপন মহত্ত্বকে খর্ব না করে থাকতে পারে না।

'অমৃত' কবিতায় তাই দেখি, অমিয়ার বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন লক্ষপতির ঘরের দুর্লভ ছেলেকে চায়ের টেবিলে আনতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহীভূষণ—যার সম্পর্কে লোকে বললে 'ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষী-খেদানো বাতুড়টা', সে-ই অমিয়াকে কর্ম ও জীবনের সঙ্গী করে নিলে অনায়াসে। মহীভূষণের সম্পর্কে লোকের ধারনার মধ্যে ব্রিটিশ শাসক-শক্তি ও সেই শাসকশক্তিপুষ্ট ধনবৈষম্যের সমর্থক ভারতীয়দের রুশভীতিই প্রকাশ পেয়েছে।

এর পর কিছুদিন ছেলেভুলোনো ছড়ায় বৈচিত্র্য খুঁজলেন কবি। 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭)-তে সে-সব কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই সময়ে সিটি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা হুইটম্যানের স্মৃতি-সভার উদ্যোগ

করলেন। সেই স্মৃতি সভার জন্য কবি যা লিখে পাঠালেন (রবীন্দ্রজীবনী: চতুর্থ খণ্ড: পৃ. ৯২) তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

প্রকাণ্ড একটা খনি ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে, এরকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা-তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই. সংঘটন আছে, এ সেই রকম, ছন্দোবদ্ধ মন লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। সেখানে কোনো যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য-অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়ার দরকার।

এই মন্তব্য উদ্ধারের কারণ, হুইটম্যানের এই আদিম বন্য মনটিকে কবি মুগ্ধ চিত্তে মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন। বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে টবের কবিতাকে মাটিতে রোপণ করবার পিছনে হুইটম্যানের বিচারহীন, অপক্ষপাত, উদার মন কাজ করেছে নিশ্চয়। এই জন্যই হুইটম্যানের এই মানসিকতাকে তিনি উল্লেখ করেছেন। আমাদের মনে হয়, এই মানসিকতার প্রেরণায় বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে তিনিও এক দৌড়ে অভ্যস্ত সীমা অতিক্রম করেছেন। অবশ্য শুধু এই প্রেরণাই নয়, এর সঙ্গে দেশের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার এবং রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থাও অন্যতম প্রেরণাসূত্র ছিল, সেকথা আগেই বলেছি। বিষয় ও প্রকাশভঙ্গিতে পুনশ্চের কবির ব্রাত্যতা, 'পূরবী', 'মহুয়া', 'পরিশেষে'র পরে চমকপ্রদ আঘাতের মতো লাগে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে:

আমেরিকান যে কয়জন সাহিত্যিক কবির প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে থরো, এমার্সন ও হুইটম্যানের শিষ্য এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের কবিতা কবির খুব ভালো লাগিত। হুইটম্যানের কবিতা কবি আমাদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন। [রবীন্দ্রজীবনী: চতুর্থ খণ্ড: পৃ. ৯২]।

'প্রান্তিক' কাব্যে (১৯৩৮) দেখি ধীর বিলীয়মান চেতনার কথা:

অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোতবাহি
নিয়ে অনুভূতি পুঞ্জ······ । ৯ ।

পিছু নিয়েছে অতীতের বাসনা, বর্তমানের কামনা। 'সেঁজুতি' কাব্যে (১৯৩৮) রোগমুক্তির পরে রূপের জগৎ নূতন হয়ে দেখা দিয়েছে। 'প্রহাসিনী' কাব্যে (১৯৩৯) বিচিত্র বিষয়ের লঘু ছন্দে আলাপ। আধুনিকা থেকে মাছিতত্ত্ব ও মশক-মঙ্গল-গীতি পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তার-বৈচিত্র্য। 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি'র মতো এখানেও অবসর-বিনোদনের অভিলাষী কবি। 'আকাশ-প্রদীপে' (১৯৩৯) কৈশোর স্মৃতির গুঞ্জন। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে জীবনের স্বপ্নের নেশায় বিভোর হয়েছেন কবি :

চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই। । শ্যামা ।

কিন্তু এ-কাব্যের অনেক কবিতাতেই সমকালীন ইয়োরোপ ও অ্যামেরিকান কবিদের নৈর্ব্যক্তিকতা ফুটেছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই নৈর্ব্যক্তিকতাকে আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন [দ্রষ্টব্য. সুধীন্দ্রনাথের চিঠি 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০, পৃ ১৬১]। এই আত্মবিলোপের চেষ্টা, জীবনকে বাইরে থেকে দেখার চেষ্টা—যা সুধীন্দ্রনাথ নিজেও চেষ্টা করছিলেন আয়ত্ত করতে—তা তিনি দেখতে পেলেন 'আকাশ প্রদীপে'র যাত্রাপথ, ধ্বনি, বেজি, যাত্রা, ঢাকিরা ঢাক বাজায় ইত্যাদি কবিতায়। যে নৈর্ব্যক্তিকতা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর এলিয়ট, পাউণ্ড বা ফ্রস্টের কাব্যে লক্ষণীয় তা আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখতে পান। উল্লিখিত কবিতাগুলিতে তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে অমৃতত্ত্ব আরোপের লোভ সংবরণ করছেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্যই সে সংবরণ কঠিন ও নির্মম সংবরণ।

রবীন্দ্রজীবনী থেকে [চতুর্থ খণ্ড : পৃ. ১৩৬] জানা যাচ্ছে যে, এই সময়ে ইয়োরোপের সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতিবিধি সম্পর্কে কবির মন আগের মতোই উৎসুক। কবি অমিয় চক্রবর্তী বিদেশী বই পাঠান বিদেশ থেকে। কবি সে সব পড়েন গদ্য কাব্য লেখার সময় থেকেই ইয়োরোপীয় কাব্য-পরীক্ষা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন তিনি। শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা চিঠিই তার প্রমাণ

(১৮শে আশ্বিন)। আর একটি চিঠিতে একটি বই-এর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে (২রা আষাঢ়, ১৩৪৫)। তাতে তিনি আধুনিক সাহিত্যের দুর্বোধ্য প্রকাশ-ভঙ্গি ও চিন্তার অসংলগ্নতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এবং সাহিত্যকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ থেকে মুক্ত রাখতে বলেছেন। নবযুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৬, 'সাহিত্যের স্বরূপ') কবি বলেছেন :

> এখনকার কবিতা অবচেতন তত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে।··· অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে, যদি ঠিক মতো তাব ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুট ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে। কাব্যের এই বিশেষত্বকে উপেক্ষা কবা চলবে না।

রবীন্দ্র-কাব্যে সেই জন্যই বিদেশী কবিদের প্রেরণায় বিশেষ বৈচিত্র্য এসেছে, ছন্দেব বন্ধন গেছে, ভাষাব মধ্যে নতুন সঙ্গীত এসেছে, প্রকাশেব মধ্যে অন্তবঙ্গতা বেড়েছে, সাহস বেড়েছে, কিন্তু অবচেতন মনেব অসংলগ্নতা কোথাও প্রকাশ পায় নি।

'নবজাতক' (১৩৪০) কাব্যের কতকগুলি কবিতায় ইয়োরোপীয় সভ্যতার ক্রূরতাব উদ্দেশে কবির ভর্ৎসনা ও ধিক্কাব দেখতে পাই। জার্মানীব রাজ্য-লোলুপতা, ইংরেজ ও ফ্রান্সেব জার্মানী-তোষণ-নীতি কবিকে আহত করেছে। মিউনিক চুক্তির চারদিন বাদে কবি 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায় লিখেছেন :

> উপব আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো—
> নিম্নে নিবিড় অতি বর্বব কালো
> ভূমিগর্ভের রাতে
> ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
> নিদারুণ সংঘাতে
> ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
> সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
> জমেছে লুঠের ধন।

ভক্তির ছলনায় শক্তির বাণ মারছে যে জাপান, তাকে ধিক্কার দিয়েছেন 'বুদ্ধ ভক্তি' কবিতায়। 'পক্ষী-মানব' যন্ত্রদানবের নতুন কীর্তি। শক্তির

অভিমানের প্রতীক। কবি বলেছেন : 'যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে।' 'ভূমিকম্প' কবিতাতেও কবি এই বিধ্বংসী রূপকে আবিষ্কার করলেন। বিশ্ব-ইতিহাসের উত্তপ্ত ধারাপ্রবাহ বাঙলা কাব্যের ধারাকেও উত্তপ্ত করলো।

'সানাই'-এর (১৯৪০) মধ্যে কবি সভ্যতার এই বৈনাশিক রূপ এঁকেছেন 'অপঘাত' কবিতায়। এ কাব্যের বেশীরভাগ কবিতাতেই প্রৌঢ়ত্ব কিংবা যৌবনের রোম্যান্টিক কল্পনা নতুন করে পাখা মেলেছে। কবি যেন বুঝতে পারছেন নিজের স্বভাবকে, শত পবিবর্তনেও, এমনকি মৃত্যুর সংস্পর্শে এসেও, যা বদলায় নি : 'এ গলিতে বাস মোর তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক।' [অনসূয়া]। নবজাতকে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য 'পুনশ্চ' কাব্যের সেই বিষয়মুক্তির (যাব পিছনে পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা রয়েছে) অনুসরণে নাগরিক জীবনেব ছবি আঁকায়।

'রোগশয্যায়' (১৯৪০) কাব্যে মৃত্যুর অন্ধকারের রূপ দেখলেন কবি। 'আবোগ্যে' (১৯৪১) কবি আপন সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান করছেন। জীবনের হিসাব নিকাশ করে নিয়েছেন 'জন্মদিনে' কাব্যে (১৯৪১)। এখানেই কবির অচরিতার্থতার খেদ ফুটেছে :

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী। ঐকতান।

শেষ পর্যন্ত কবির কর্ণধার তাঁকে মহা অজানার দিকে নিয়ে চললেন। কবি কল্পনা করেছিলেন আগে থেকেই সেই কর্ণধারের 'জ্যোতিঃ'-সম্ভব রূপ। ক্রমে তা স্পষ্ট হলো :

ক। তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে? সাবিত্রী, পূরবী।

খ। হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।
প্রান্তিক। ৯।

গ। যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি ·
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতন্য-সাগর তীর্থ পথে। রোগশয্যায়। ২০।

ঘ। এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তাবা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে। ঐ। ২৮।

ঙ। এ আমির আববণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যেব অমৃতরূপ করুক প্রকাশ। আরোগ্য। ৩২।

চ। তুমি হবে চিরসাথী
লও লও হে ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকাব। শেষ লেখা। ১।

এই আদি জ্যোতিব সঙ্গে চৈতন্যেব পরিণয়েব মূলসূত্র পাই, পূর্বে উদ্ধৃত 'বিশ্বপবিচয়ে'র বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেব বিবৃতিতে: 'চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পবিণাম।'

কবি আশ্চয দক্ষতায় উপনিষদের হিরণ্ময় পুরুষ আর বিজ্ঞান-প্রমাণিত পদার্থেব আদি জ্যোতি-রূপকে মিলিয়ে দিতে পেবেছিলেন। মৃত্যু-চিন্তার ক্ষেত্রে এই 'জ্যোতির্ময় মৃত্যু'র অনুভব একেবারেই নতুন।

৫.

রবীন্দ্রনাথ তাঁর Religion of an Artist বইতে এক জায়গায় বলেছেন:

> No poet should borrow his medium ready made from some shop of orthodox respectability. He should not only have his own seeds but prepare his own soil. Each poet

has his distinct medium of language not because the whole language is of his own make, but because his individual use of it, having life's magic touch, transforms it into a special vehicle of his own creation.

কবিকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ঔচিত্যবোধ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনে যে কতখানি সফলতা এনেছিল তা প্রাক্ রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ফল-এর তুলনা করলেই স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের লিরিক প্রতিভা উনিশ শতকের সপ্তম দশকেই স্থূল কবিকর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিল, মধুসূদনের মহাকাব্যের ফাঁকে ফাঁকে (বিশেষ করে চতুর্থ সর্গ) 'গীতিকাব্যের উতলাবায়ু' আমাদের মন ভুলিয়েছে। কিন্তু শুধু মাধুর্যের স্বাদ দেবার জন্য সে কাব্য লেখা নয়, কাজেই পূর্ণ তৃপ্তি সে ক্ষেত্রে আশা করতে পারি না। নবীনচন্দ্রের মধ্যে গীতিকবির প্রতিভা ছিল, কিন্তু সে প্রতিভা গভীর অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ভাবালুতায় অপচয়িত হয়েছে। অক্ষয় চৌধুরীর উন্মাদনাকে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে যে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তার প্রমাণ 'জীবনস্মৃতি'তেই রয়েছে। বিহারীলাল এদিক থেকে অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন, লিরিক্যাল অন্তর্দৃষ্টি তো ছিলই তাঁর, প্রকাশ-ভঙ্গির ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে তিনি ছিলেন বিস্ময়কর ভাবে নতুন। কিন্তু নবলব্ধ অনুভূতির আবেগে অধীর বলেই তিনি প্রকাশের ভাষা সৃষ্টিতে সংযমের অপেক্ষা রাখেন নি। তাই তাঁর কাব্য-প্রকাশে এত বন্ধুরতা, সূক্ষ্ম ও স্থূলের এত ঘনিষ্ঠতা। এই প্রসঙ্গে, বিহারীলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন :

সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদা-মঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপে আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না।

বিহারীলালের আভাসটুকুই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রাক্-রবীন্দ্র পরিবেশের অনুরূপ পরিবেশে উগোকেও আত্মস্থ হতে হয়েছিল। তাঁর অভ্যুদয় সম্পর্কে পল ভালেরি মন্তব্য করেছিলেন :

In the first half of the nineteenth century, the matter of form whose importance I have tried to show was widely neglected. Purity, richness and propiety of language, and the musical quality of verse were little sought after.

Facility won the day. But facility, when it is not divine, is disastrous. The Romantics generally were concerned with acting almost exclusively on the first impulse of their soul, whose emotions they tried to communicate without considering the reader's resistance, without bothering about the formal conditions . They put their trust in vehemence intensity, singularity, the naked force of their feeling: they did not wait to organise its expression. Their verses are astonishingly unequal, their vacabulary vague, their images often imprecise or traditional. The immense resources of language and poetics were unknown to them, or else they thought them hindrances, bars to the possession of genius.. One of them observes that although these poets have given rise to innumerable imitators, they have found no one to continue their work ; that is, none could develop the ideas and technical qualities that they did not possess They gave us something to imitate but nothing to learn

But Hugo was among them. He noted their verbal insufficiency and the decadent state of the art of verse that all the triumphs of his rivals did not hide from so profound a conneiseur. For that is what Hugo is. (The Art of Poetry: Paul Valéry: Hugo the Artist প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

এই উক্তির মধ্যে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের অবস্থার একটা আশ্চর্য প্রতিরূপ পাই এবং উগোর সাধনলব্ধ আত্মপ্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের অব্যর্থ স্মারক। পূর্ববর্তী কবিদের 'vehemence', 'intensity', 'singularity', 'naked force of feeling' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অতি সচেতন হয়ে পড়েছিলেন বলেই 'immense resources of language and poetics'-এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং তাই উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে যে বাঙলা কবিতা একক কণ্ঠের উচ্ছ্বাসে বেগবান হয়েছিল তা শেষ দশকে সোনার তরী-চিত্রা-

চৈতালির মধ্যে নিপুণ শিল্পরূপে পরিণতি পেল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

> তাঁর কর্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই বোঝেন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ঐশ্বর্য কি অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল।

কীভাবে বিভিন্ন কাব্যাদর্শের পরীক্ষায় কবি এগিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাষাসৃষ্টির ধাতু ছিল সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাঙলা। সেই ধাতু দিয়ে তিনি যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের শব্দ সৃষ্টি করছিলেন তার পিছনে রোম্যান্টিক কবিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি বিশেষভাবে অন্তর্লীন হয়েছিল। যে সমস্ত পুরোনো শব্দকে তিনি আশ্চর্য ভাবে নবদ্যোতনায় প্রয়োগ করলেন তার মূলেও রোম্যান্টিকদের নিখুঁত শব্দলোভাতুর মন কাজ করেছে। আর যে সব শব্দকে তিনি প্রতীক করলেন সেগুলি হয় দেশী ঐতিহ্যে সৃষ্ট, না হয় সার্বজনীন। যেমন, বাঁশি, বীণা, আগুন, প্রদীপ, হাট, ঘাট, বধূ ইত্যাদি দেশীয় ঐতিহ্যে সৃষ্ট শব্দ-প্রতীক। আর পথ, স্রোত, তারা, ফুল, ধুলো, ঘাস, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি সার্বজনীন শব্দ-প্রতীকগুলি বিশেষভাবেই রোম্যান্টিক কাব্য-সাহিত্যের সাধারণ সম্পদ। দেশী ঐতিহ্যের শব্দই হোক আর সার্বজনীন শব্দই হোক, রোম্যান্টিকদের ইমেজ সৃষ্টিই রবীন্দ্রনাথের মূল প্রেরণা ছিল। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বৈষ্ণব কবির বাঁশি আর যক্ষনারীর বীণা রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় প্রতীক। কতকগুলি ব্যবহার দেখানো যেতে পারে :

ক। কে জানে কাননে ফুল ফোটে কিনা
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা।

খ। তোমার বীণা আমার মনো মাঝে
কখনো শুনি কখনো ভুলি কখনো শুনি না যে।

গ। কত তীব্র তারে তোমার
বীণা সাজাও যে,
শতছিদ্র করে জীবন
বাঁশি বাজাও হে।

ঘ। আমারে করো তোমার বীণা।

এই সব পংক্তিগুলি পড়লে একদিকে যেমন বৈষ্ণব বাঁশি ছাড়াও অজ্ঞাতনামা বাউল কবির জীবন-বাঁশির রূপকের কথা মনে পড়ে যায় :

ধন্য আমি—বাঁশিতে তোর অনেক মনের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাইরে কোনো দুখ।

তেমনি অন্যদিকে রোম্যান্টিক কবির উক্তি বারবার মনে পড়ে, 'make me thy lyre'। কবি রজনীকান্ত সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'সচ্ছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।' (১৬ আষাঢ, ১৩১৭) এই উক্তি থেকে জীবন-বাঁশির রূপক-ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট হয়। শেলী তাঁর Defence of Poetry-তে Acolian lyre-এ বাতাসেব আঘাতে যে ঝংকাব হয় তার সঙ্গে সুখ দুঃখের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ আঘাতে জীবনযন্ত্র-ধ্বনির অনুরণনের তুলনা করেছেন।

ভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ফোটাতে গেলে রোম্যান্টিক যুগেব কবিদের মধ্যে বায়রনের চেয়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোলরিজ শেলি কীট্‌স্‌ যে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় সে কথা রবীন্দ্রনাথের বুঝতে কষ্ট হয় নি। অন্য সব দেশে যেমন বায়রনের প্রভাবকে অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল, আমাদের দেশেও তাই। প্রথম উচ্ছ্বাসের উন্মাদনা সৃষ্টিতে বায়রন মদের মতো কাজ কবেছিল এবং একবার সেই বস গ্রহণের পর 'উচ্ছ্বসিত ফেনাব মদিবাতে' কেউ আত্মস্থ হতে পারেন নি। অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিতে অন্যতম প্রেরণা-দাতা। তাঁব মাধ্যমেই বোম্যান্টিকদের আতিশয্য দোষ রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমণ করেছিল। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'শৈশব সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত' ও 'ছবি ও গানে' কবির আনন্দের অত্যধিক প্রাচুর্য লক্ষ্য করবার বিষয়। 'কড়ি ও কোমলে' কবি সনেটের বন্ধনে নিজের আতিশয্যকে বর্জন কবলেন। বোম্যান্টিক গীতি কবিতার ভাষা তো প্রায় তৈরিই ছিল, সনেটের বন্ধনে এসে আতিশয্যবর্জিত হয়ে কবির সৌন্দর্য-তন্ময়তাব ভাষা স্পষ্ট রূপ নিল। বিহাবীলাল ও অক্ষয় চৌধুবীর প্রভাব তাঁর শৈশব রচনায় থাকলেও তাঁদের মতো স্থূল, হাস্যকর ও শ্রুতিকটু প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে প্রথম থেকেই কবি ছিলেন মুক্ত। কিছু কথ্য শব্দের মালিন্য ছিল ('ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সব ভূঁয়ে পডে রয়েছে।'—শ্মশানের বজনীগন্ধা। 'তুমি চেয়ে দেখ মুখ বাগে'।—অসহ্য ভালবাসা) কিন্তু সব চেয়ে বেশী ছিল উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে অতিকথন। তার কিছু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে :

ক। যাও মোরে যাও ছেড়ে নিওনা নিওনা কেড়ে
নিওনা, নিওনা মন মোর
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিওনা মোরে ;
ছিঁড়ো না এ সখ্যতার ডোর। 'আবার'। সন্ধ্যা সঙ্গীত।

খ। জগতের আদি অন্ত থর থর থরথর
উঠিল কাঁপিয়া। 'সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়'। প্রভাত সঙ্গীত।

আবেগকে খোলাখুলি প্রকাশ করতেই কবি সক্ষম তখন, ইঙ্গিতময় বাক্যে এবং সংকেতময় শব্দে প্রকাশক্ষমতা অর্জন করেন নি তখন। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে ব্রজবুলি ভাষার প্রতি কবির মোহ দেখা যায়, কিন্তু সে ভাষাকে আয়ত্ত করতে তখনও দেরি ছিল। এই সময় কবি 'ভারতীতে' 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' (১২৮৭, আষাঢ) প্রবন্ধে ব্যঞ্জনাময় ভাষার স্বপক্ষে রায় দিলেন :

আমাদের গণ্ডারচর্মমন অতিমৃদু স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এই জন্য আমরা বাইরনের ভক্ত। শেলীর জ্যোৎস্নার মতো অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙ্গালীর ভাল লাগে।

সংযত কবি-কর্মের প্রমাণ দিয়ে বললেন :

একপ্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর, তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না।

'ভারতী'র এই বছরের ভাদ্র সংখ্যায় 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধে কবি বললেন :

কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত এবং উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে।

এই রুচি ও বুদ্ধি কবির নিজের সহজাত ছিল, ইংরিজি কবিতা পড়ে ও অনুবাদ করে নিরন্তর সেই রুচি ও বুদ্ধিকে শান দিচ্ছিলেন কবি। আগেই বলেছি, এই সময় (১২৯১ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ শেলি, অব্রে দ্য ভের, মিসেস ব্রাউনিঙ, হুগো, মায়ার্স, মার্স টন ইত্যাদি কবিদের কবিতা অনুবাদ করছিলেন। এর আগে দান্তের 'ভিটা নুভা'র প্রথম কবিতাটির অনুবাদ দেখেছি। এই সব অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাঙলা কাব্যের ভাষা তৈরি হচ্ছিল। 'কড়ি ও কোমলে' এসেও

কবি যে ভাষাকে বিচিত্র রসগ্রহণের উপযোগী করে তুলছিলেন সে প্রমাণও দিয়েছি তরু দত্তের ফরাসী কবিতার অনুসরণের ইঙ্গিত দিয়ে। এই সাধনারই ফল ফলতে দেখা গেল, 'কড়ি ও কোমলে'র প্রকাশভঙ্গিতে :

ক। যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।
যৌবন স্বপ্ন।

খ। আকুল আঙুলিগুলি করে কোলাকুলি
গাঁথিয়ে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ। বন্দী॥

গ। দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন।
চুম্বন এসেছে তার কোথা সে অধব! গীতোচ্ছ্বাস।

ঘ। আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশেব পাখি
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ!·
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি তারকার দেশে করিবারে বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন
বিমল নীলিমা তাব শান্ত স্বকুমাব,
যদি নিয়ে যায় ওই শূন্য হয়ে পার
আমরা দুখানি পাখা কনকবরণ। হৃদয় আকাশ।

ঙ। কেন গো এমন স্ববে বাজে তব বাঁশি
মধুর স্থন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া। কেন।

চ। যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ
অনন্তকালের মোর স্থখ-দুঃখ-শোক,
কত নব জগতেব কুস্থম কানন
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক। স্মৃতি।

এখানে কল্পনা শুধু অশবীবী নয়, কল্পনাকে নিয়োগ করবার বুদ্ধি এবং রুচিও সমান তীক্ষ্ণ। ভাবনার মধ্যেও প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাব—রোম্যাণ্টিকরা যাকে বলেন calm despair। কবির অভিপ্রেত 'বাঙ্গালী কবি' নিজের মধ্যেই স্থপ্ত ছিল, অচিরেই তার প্রকাশ দেখা গেল।

'মানসী'তে এসে কবি-কল্পনা মুক্তি পেল, ভাষাও আশ্চর্য রকমের

সর্বেন্দ্রিয়চেতনা-বহ হয়ে উঠলো। দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্পর্শ, স্বাদ সবকিছুর আশ্চর্য তৃপ্তি নিয়ে এল ভাষা।

ক। নীলসিন্ধু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে ওঠে। সিন্ধুতরঙ্গ।

খ। গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মত রাখি। অপেক্ষা।

গ। শূন্যব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান··· দুরন্ত আশা।

ঘ। শৈশব কুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবন মধু। পরিত্যক্ত।

ঙ। আকাশের ধারে যায় ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়।
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না আবরণ— পুরুষের উক্তি।

চ। সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন-পাখির পালকে। ভৈরবী গান।

রোম্যান্টিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি কবির সহজাত ছিল, এখন তা স্পষ্ট হলো। কবির ভাষাতেই বলা যেতে পারে, তাঁর 'সর্বাঙ্গের দৃষ্টি খুলে গেছে'। এর পর থেকে কবি প্রয়োজনীয়তা বোধে স্বচ্ছন্দে ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। 'মানসী'র ভাষাচাতুর্য 'সোনার তরী'তে অনেক সরল ও কমনীয় হয়েছে। 'চিত্রা'তে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের কিছু প্রাধান্য বেড়েছে। সব মিলিয়ে মানসী-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-পর্বে পদাবলী-সাহিত্যের কোমল লাবণ্যময় ভাষার ছায়া পড়েছে। প্রাক্-রবীন্দ্র বাঙলা কাব্যে একমাত্র মধুসূদন ছাড়া আর কেউই বৈষ্ণব কাব্যের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক চর্চা করেন নি। কাজেই বাঙলা কাব্যের ধাতুপরিচয় তাঁদের হয়নি। রোম্যান্টিক আকুলতা দীপ্তি, উচ্ছ্বাস ও মাধুর্য বৈষ্ণব ভাষাতেই সম্ভব ছিল। তাতেই কবির জাদুস্পর্শ লাগলো।

ক। নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে
তাই আমি পারিনা বুঝাতে। 'দুর্বোধ'। সোনার তরী।

খ। নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা। 'উর্বশী'। চিত্রা।

কল্পনা-কথা-কাহিনী-ক্ষণিকা-নৈবেদ্য পর্যায়ে সংস্কৃত শব্দের ওপর কবির মমত্ব বেড়েছে, অতি কোমলতা ও বাহ্য শ্রুতি-সুখকরতা ছেড়ে শব্দগুলিকে আন্তরিক যত্নে, অন্তহীন মমতায় সাজিয়ে তাদের ব্যঞ্জনা-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছেন তিনি, বৈষ্ণব-ভাষার ললিত-মাধুর্য ক্রমশঃ কঠিন-দীপ্তির পথ করে দিয়েছে। 'কাব্

শিল্পের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে।' ১৮৯৫ সালে কীট্স্ সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্য আগে উদ্ধার করেছি তাতে আছে :

> কীটসের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটা আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে, যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটা নাড়ির যোগ আছে।·· কীটসের লেখায় কবি-হৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে ভারি আকর্ষণ করে।

কীট্সের চিঠিতে তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথাই পাই। এক বন্ধুকে (Taylor) তিনি লিখছেন :

> ·· the rise, the progress, the setting of imagery should like the Sun come natural to him—shine over him and set soberly all through in magnificence, leaving him in the luxury of twilight. (Letters p. 108)

উদাহরণ হিসাবে তাঁর Endymion থেকে কয়েক পংক্তি তুলে দিচ্ছি :

> Four maned lions pale
> The sluggish wheels ; solemn their toothed maws
> The surly eyes brow-hidden, heavy paws
> Uplifted drowsily, and nervy tails
> Cowering their tawny brushes... .

কিছুটা ভারি ও ধীর-গম্ভীর স্বর-ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে maned-pale, surly-nervy, brow-drowsily-cowering এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির অনুরূপ পুনরাবৃত্তিতে, যেমন, drowsily, nervy, cowering এবং brushes ইত্যাদিতে নিদ্রালস পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে স্বর-ব্যঞ্জনের মিশ্রণে কোমল-কঠিন ঐশ্বর্য-সৃষ্টিতে সমান্তরালভাবে সংস্কৃত সাহিত্যকেই গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সোনার তরী-চিত্রা পর্বেই এর সূচনা হয়েছিল :

ক। পরিতৃপ্তি ভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি নিম্নতট- 'পরে
অপর্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল
আলস্য মন্থরতনু লভি তরুতল

রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা............ বিদায় অভিশাপ।

খ। তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণালক্ষশত
করি অবনত। উর্বশী।

তারপর 'কল্পনা' কাব্য রচনার সময় সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যকে নতুন করে ফুটিয়ে তুললেন কবি। আশ্চর্য শব্দের ভাণ্ডার এই সংস্কৃত সাহিত্য। কবি তাঁর সহজাত কানকে নিরন্তর চর্চায় 'industrious ear' (কীট্‌স্) করে তুলেছেন। সেই শ্রুতি-ক্ষমতার বলে প্রাচীন ও বহুকালের অব্যবহৃত ভাষাকে শ্রাব্য সৌন্দর্যে ও অর্থ-গৌরবে ভরিয়ে স্থাপত্য শিল্পের মতো সাজিয়ে তুললেন :

ক। তোরণের শ্বেতস্তম্ভ পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে। স্বপ্ন।

খ। উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্র-চ্যুত তপনের
জ্বলদর্চ্চি রেখা। বর্ষশেষ।

গ। সিংহ দুয়ারে বাজিল বিষাণ
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান
মন্ত্রণাসভা হল সমাধান দ্বারী ফুকারিয়া বলে। পূজারিণী।

ঘ। দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে। বন্দীবীর।

ঙ। অলক সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিতে কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে। সেকাল।

চ। নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে
পুলকিত নীপ নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে। নববর্ষা।

ছ। ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁখি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত। নৈবেদ্য। ৪০।

জ। আমি ভালোবাসি দেব এই বাঙলার
দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিংকিণী
তরল কল্লোল রোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধ পল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে। ঐ। ৭৩।

এই উদাহরণগুলি ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যকেই সপ্রমাণ কববে, : 'রচনার দিক দিয়া বিচার করিলে কথা-কাহিনী-কল্পনা উজ্জ্বলরীতি, ক্ষণিকা সহজরীতি, নৈবেদ্য রক্ষণবীতি।' 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [৩. খণ্ড] 'ভাবনা' অধ্যায়।

'খেয়া' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত পর্বে সংস্কৃতের ঐশ্বর্য কমে গেছে। উৎসর্গ থেকেই নিরাভরণ হতে শুরু করেছিল ভাষা, 'খেয়া'তে এসে বাউল সংগীতের 'মর্মানুভবময়' ভাষা দেখতে পাওয়া গেল। বাউল সংগীতের সহজ আবেদন সরল ভাষাতেই প্রকাশিত। কবিমনের নিরাসক্তি ও বিনয় এই ভাষাতেই তৎকালীন মর্জি প্রকাশ করলো। ভাষার স্রোত ধীরে কুলুকুলুধ্বনিতে বইছে, মাঝে মাঝে এক-আধটি ধ্বনিময় সংস্কৃত শব্দ উপলখণ্ডের মতো বাধা সৃষ্টি করে মিষ্টি সুর তুলেছে।

ক। সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে
বাজল দূরে শাঁখ,
বক্স-বিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক। দিঘি, খেয়া।

খ। জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।
বেলা শেষে। গীতাঞ্জলি।

গ। নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণ কমল। সুরের আগুন। ঐ।

'বলাকা' পর্বে এসে কবি এই ত্রিবিধ রীতিতে-পদাবলী, সংস্কৃত কাব্য এবং বাউল সংগীতের রীতির বিচিত্র মিশ্রণে কাব্য রচনা করতে লাগলেন। এই তিন সাহিত্যের ভাণ্ডার তাঁর হাতের মুঠোয়, আবেগের গতিবিধি বুঝে কবি নানা ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করলেন। পরিব্যাপ্ত মহাজীবনের ধ্যান প্রকাশে সব রকম ভাষাই প্রয়োজন। তবে এখন থেকে সংস্কৃত রীতিই অন্য দুই রীতিকে ছাড়িয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষ করে খেয়া-গীতালি পর্বের ভাষা একেবারেই চাপা পড়েছে। কোথাও কোথাও পদাবলীর রীতি চমক দিয়ে ওঠে:

মনে আছে সেকি সব কাজ সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে
বন্ধ দুয়ার খুলেছে আমার কঙ্কণ ঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে,
কভু নবমেঘভারে
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে ভুলায়েছ বারেবারে।
'লীলাসঙ্গিনী'। পূরবী।

কিন্তু প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃত শব্দগুলির কোমল-কঠিন লাবণ্য দীপ্তিতে আশ্চর্যরকমের বিচিত্র। 'মহুয়া' পর্যন্ত এই প্রাধান্য তো বজায় আছেই, গদ্যকাব্য পর্যায়ের ফাঁকে ফাঁকে এবং একেবারে শেষ পর্যায়ের কাব্যেও এই ধ্বনি-ঐশ্বর্যময় বর্ণাঢ্য ভাষারই প্রাধান্য:

ক। দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল। বলাকা। ৭।

খ। হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্ত সুধীর মধুর। বলাকা। ২৩।
গ। অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে। সাগরিকা। মহুয়া
ঘ। বনের মন্দির মাঝে তরুর তম্বুরা বাজে
অনন্তের উঠে স্তবগান। অসমাপ্ত। মহুয়া

'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' পর্যন্ত কবির নতুন পরীক্ষার যুগ। সেখানেও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শব্দের ঐশ্বর্য 'মৃদঙ্গ-ধ্বনি-মন্দ্র-মন্থর' পরিবেশ সৃষ্টি করেছে :

ক। দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জন-শূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখর-শ্রেণীতে
রুষ্ট রুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনের মতো। খোয়াই। পুনশ্চ।
খ। দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা,
ঘোষণা করলে মেঘ-গর্জনে
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণবাশি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে। শেষ সপ্তক। ৩৭।
গ। অন্তহীন ইটকাঠের মূক জড়তার মধ্যে
ঐ ছিল একা মহারণ্যের প্রতিনিধি
সেদিন দেখেছি তার বিক্ষুব্ধ মহিমা বৃষ্টিপাণ্ডুর দিগন্তে।
তেঁতুলের ফুল। শ্যামলী।

'পুনশ্চ' কাব্যেই প্রথম কবি বিষয় ও ভাষার অভিজাত্য সচেতনভাবে কাটিয়ে উঠলেন। অজস্র চল্‌তি শব্দকে কবি প্রকাশের 'প্রত্যক্ষতা'র জন্য প্রয়োগ করলেন। এর পিছনে ইয়োরোপীয় কাব্য আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাব তো আছেই, হুইটম্যানের 'সর্বগ্রাসী কাব্যভাষা'ও [হুইটম্যান সম্পর্কে কবির

কবির পূর্বে উদ্ধৃত উক্তি স্মরণীয়] যথেষ্ট ছাপ ফেলেছে। এছাড়া ইংরিজি কাব্যরীতির ছাপও এই পর্বে পড়েছে:

ক। তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়
মানুষের পায়ে দলা গরিব ধুলোর 'পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা। শেষ দান।

খ। কোথা তারা গেল আজি,—
গোধূলি ছায়াতে হল লীন
যারা এসেছিল একদিন
কলরবে কান্না ও হাসিতে
দিতে আর নিতে। ঋতু অবসান, বীথিকা।

গ। যদি কোন শুভদিনে ভর্তা না ভর্ৎসে,
বেশী ব্যয় হয়ে পড়ে পাকা রুই মৎস্যে,
কালিয়ার সৌরভে প্রাণ যবে উতলায়
ভোজনে দুজনে শুধু বসিবে কি দুতলায়।
লোভী এ কবির নাম মনে রেখো, বৎসে। 'পরিণয় মঙ্গল'। প্রহাসিনী।

কিন্তু লক্ষ্য করা যেতে পারে, বিদেশী ভাবনার কোথাও অনুসরণ নেই। বাক্যরীতি কিছুটা ইংরিজি হলেও তাতেই মাতৃভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত।

যে-সময় থেকে কবি কঠিন রোগের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হলেন, সেই সময় থেকেই ভাষার মধ্যে গাম্ভীর্য এসেছে, বিরাট অনুভবের ব্যাপ্তি এসেছে, অভিজ্ঞতার গভীরতায় প্রকাশের মধ্যে পরিমিতি এসেছে। এখানেও একমাত্র অবলম্বন হয়েছে সংস্কৃত শব্দ আর তাদের সমাসবদ্ধ ধীর মন্দাক্রান্তা চাল। উৎসবের কলধ্বনিময় নদী যেন গাঢ় ব্যাপ্ত-সুগম্ভীর হয়ে সমুদ্র-মুখাপেক্ষায়। কবি বলেছেন, ভাষা তাঁর ফুরিয়েছে, যা বলা যায় তা মন্ত্রেই প্রকাশিত হতে পারে:

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে
ভাষা নাই, ভাষা নাই,
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন আকাশে। আরোগ্য। ৩।

কিন্তু আক্ষেপ থাকলেও কবির জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, মন্ত্রোচ্চারণ হয়েছে, অনেক সময়েই তাঁর কথা উপনিষদের সঙ্গে মিশে গেছে: 'আজ এসে দাঁড়ালেম প্রথমজাত অমৃতের সমুখে।'

সেই দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করেই আরও পরে বললেন:

দেখি যেন মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান। জন্মদিনে। ২৬।

ঘনীভূত অনুভবের অপরিহার্য পরিণাম এই ভাষা। কাজেই দেখা গেল, রোম্যাণ্টিক কবিদের কাব্যভাষা তাঁর প্রেরণাস্থল। বিশেষ করে কীট্সের melodic beauty-তে তো তিনি ছিলেন মুগ্ধ: 'তার চেয়ে অনেক বড় কবি থাকতে পারে, অমন মনের মত কবি আর নেই।' তারপর ভিক্টোরিয়ান যুগে টেনিসন ব্রাউনিঙ সুইনবার্ণের আশ্চর্য ধ্বনি-বর্ণসুষমাও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। এই শিক্ষাতেই কবি বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল-সঙ্গীত ও সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দ চয়ন করেছেন, ক্রমশঃ অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধিতে উচ্ছ্বাস ও বর্ণৈশ্বর্য কেটেছে, ভাষা হয়ে উঠেছে ঋজু ও মহিমান্বিত, শব্দের যথোপযুক্ত চয়নে ও গ্রন্থনে তার মধ্যে মন্ত্রের সংহত কঠিন ঝঙ্কার উঠেছে।

৬.

ছন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ওপর বিদেশী কাব্যরীতি ও তার পরীক্ষার বিভিন্ন ছায়াপাতের কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। উনিশ শতকের অন্যান্য কবিদের মতোই বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দকেই প্রথম যৌবন পর্যন্ত ব্যবহার করে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। যতিপ্রান্তিক সমিল পয়ার, ত্রিপদী চৌপদী ছাড়াও যতিপ্রান্তিক মিলহীন হেমচন্দ্রের ধরনের পয়ার, মিলহীন ত্রিপদী[৩৭] (কবি-কাহিনী) প্রবহমান পয়ার, ষোলো, আঠারো এবং বিশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদী, হ্রস্ব এবং দীর্ঘ পংক্তি মাপের মুক্তকাভাসিত ছন্দবন্ধ (সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'সন্ধ্যা', 'তারকার আত্মহত্যা') এবং বিচিত্র পদ-পংক্তি প্রয়োগে স্তবক-বৈচিত্র্য এনে রবীন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা করেছিলেন।

মাইকেলের পর তাঁর আদর্শে রাজকৃষ্ণ রায়, রামদাস সেন ইত্যাদি কবিরা সনেট রচনায় উদ্যোগী হন এবং তারপরে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথই সমনোযোগে

বাঙলা সনেট রচনায় হাত দেন। নবীনচন্দ্র তাঁর যে কবিতাটিকে সনেট বলে দাবি করেছিলেন সেটিতে চতুর্দশ পংক্তি ছাড়া সনেটের কোন লক্ষণই নেই। সে কবিতাটি তাঁর কাব্যরীতির প্রসঙ্গে উদ্ধার করেছি। সতেরো বছর বয়সে দান্তে ও পেত্রার্ক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের সনেটের অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ। পেত্রার্কের অনুবাদে কবি শেক্‌স্‌পিরীয়রীতি অবলম্বন করেছিলেন। দান্তের অনুবাদে চতুর্দশ পংক্তির বন্ধন অবশ্য মানা হয় নি। 'কড়ি ও কোমলে' কবি আটান্নটি সনেট লিখেছেন। তার মধ্যে interlace rhyme-এর নানা রকমফের দেখতে পাই। আটান্নটির মধ্যে চল্লিশটিতে শেষ দুটি পংক্তিতে এক মিল দিয়েছেন। এ রীতি পেত্রার্কার বিরোধী। চৌদ্দটি সনেটে তিনি শেক্‌স্‌পিরীয় আদর্শের অনুসরণ করেছেন। ফরাসী সনেটের রীতিরও কিছু অনুসরণ আছে। এই রীতিতে 'কড়ি ও কোমলে'র তিনটি সনেট (চরণ, হাসি, চিরদিন ৩) কবি রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'চরণ' কবিতাটির স্তবক বিভাগে ক খ ক খ, গ খ গ খ, ঘ ঘ, খ, ঙ খ ঙ-বিশুদ্ধ ফরাসী রীতি প্রকাশ পেয়েছে। এই রীতিরই উত্তর সাধক হলেন প্রথম চৌধুরী। মাইকেল চতুর্দশপদী কবিতার পংক্তি বিন্যাসে প্রবহমানতা রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পংক্তিবিন্যাসে যতিপ্রান্তিক রীতি অবলম্বন করেছেন।

'মানসী' কাব্যের সময় থেকে মিলবিন্যাসে পদপর্ব গঠনের বৈচিত্র্যে এবং রুদ্ধদলের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে বিশিষ্টকলামাত্রিক ছন্দ ঐশ্বর্য-পুষ্ট হয়েছে কবির হাতে। এই সময় রচিত অনেকগুলি কবিতায়—মানসীর 'মেঘদূত', সোনার তরীর 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী' ইত্যাদি কবিতায় সমিল প্রবহমান পয়ার ব্যবহার করেছেন। এই রীতিটিকে কবি কীট্‌সের ব্যবহৃত run-on, enjambed rhymed couplet-রীতি থেকে গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক তারকনাথ সেন তাঁর Western Influence on the Poetry of Tagore [Cent. Vol. pp 260—3] প্রবন্ধে এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন (যদিও প্রবন্ধের প্রথমাংশ তা স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েছেন):

> Apart from the urge for self-expression, a good art of the impetus behind his metrical experients and innovations must have come from his knowledge of nineteenth century English poetry.

সপ্তদশ শতকে ইংরেজ-কবি-চর্চিত এই ছন্দ অষ্টাদশ শতকে যতিপ্রান্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ পংক্তির ছন্দকে পথ করে দিয়েছিল। তারপর উনিশ শতকের প্রথমে লে-হাণ্ট তাঁর The Story of Rimini-তে এই ছন্দের ব্যবহার করেন। তাঁর কাছ থেকেই কীটস্ এই ছন্দ গ্রহণ করেন। এই 'মুক্ত' ছন্দ রোম্যান্টিকদের কল্পনাপ্রবণ স্বাধীন মনের বাহন হিসাবে উপযুক্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে এই ছন্দ চমৎকার খাপ খেয়েছিল। এই ছন্দে লেখা তাঁর কোনো কবিতাই পাঠককে বিমুখ করেনি, উপরন্তু অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা এই ছন্দে লিখেছিলেন তিনি। কীট্‌সের এই ছন্দের কিছু প্রমাণ দিচ্ছি এবং তার সঙ্গে 'অহল্যার প্রতি'র শেষ স্তবক উদ্ধার করছি :

Above his head,
Four lily stalks did their white honours wed
To make a coronal , and round him grew
All tendrils green, of every bloom and hue,
Together intertwin'd and trammel'd fresh ,
The vine of glossy sprout : the ivy mesh,
Shading its Ethiop berries , and woodbine
Of velvet leaves and bugle —blooms divine . *Endymin II*

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্তৃত সাগরনীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছে ধীরে।
তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা পানে চেয়ে কথা নাহি কয়,
দোঁহে মুখোমুখি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষরে ধ্বনিগত বিক্ষোভ ও তরঙ্গিত উত্থানপতন আনতে চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ারে এত বিক্ষোভ আনবার চেষ্টা নেই, বিশেষ করে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কীট্‌সের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান পয়ার ছন্দেও

সঞ্চারিত হয়েছিল। কাজেই পংক্তিপ্রান্তে মিল রেখে তাঁর প্রবহমান ছন্দ রচনার প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি সার্থক মুক্তক ছন্দের রচনা প্রকাশিত হয়েছে: 'নিষ্ফল কামনা'। এই মুক্তক রচনার পিছনে গৈরিক মুক্তকের আদর্শ যে একেবারে কাজ করেনি এমন কথা বলা কঠিন এবং গৈরিশ মুক্তকের পিছনে যে শেক্স্‌পিয়ারের নাট্যছন্দের প্রেরণা ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' এবং 'কথা ও কাহিনী' পর্যন্ত পর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিয়াশিটি সনেট লিখেছেন। 'সোনার তবী'তে 'খেলা' এবং এর আগেকাব 'কড়ি ও কোমলে'ব অন্তর্গত 'রাত্রি' কবিতা দুটি তেরো পংক্তির। ফরাসী রঁদেল (Rondel) বা রঁদো (Rondeau) প্রকারভেদে তেরো পংক্তির হতে পারে। তারই প্রভাবে হয়তো এই দুটি কবিতা লেখা। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'কড়ি ও কোমলে'ব 'অস্তমান রবি' কবিতাটিকে তেরো পংক্তিব রঁদেলজাতীয় বলেছেন[৩৮]। কিন্তু 'অস্তমান রবি' চতুর্দশপদী, খাঁটি শেক্‌সপিরীয় রীতির সনেট: ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ চ ঙ চ ছ ছ। যাই হোক, এই যুগের সনেটগুলি 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটেব তুলনায় রীতি-আদর্শমুক্ত। সনেট যে moment's monument, শুধু এই কথাটুকু স্মরণ রেখেই চৌদ্দ পংক্তির পরিমাপে ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তবে বন্ধন-জনিত কাঠিন্য বা দীপ্তি এ সনেটগুলিতে অক্ষুণ্ণ আছে। একটি সনেট উদ্ধার করছি 'চৈতালি' থেকে:

শুধু বিধাতাব সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তব হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমা সূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পবে নতুন মহিমা
অমর কবিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা।
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।

পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা ॥ 'মানসী'।

এখানে বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ কোন প্রচলিত আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে কবি কেবল চতুর্দশ পংক্তির বন্ধনে একটি ভাবকে সংহত রূপ দিয়েছেন।

এই পর্বে স্তবক গঠনে কবি আশ্চর্য কুশলতা দেখিয়েছেন। সম্ভবতঃ দেখাবার কারণ, এই সময় কবি ইংরেজ কবি-শিল্পীদের রচনা আত্মস্থ করেছিলেন। বিশেষ করে কীট্‌স্, টেনিসন এবং সুইনবার্ন—এই তিন দক্ষ শিল্পীর রচনার সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

ক। যত অস্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি।
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস
তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি
তত ভালোবাসি। প্রকৃতির প্রতি। মানসী।

খ। তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার,
কত রূপ ধরে পরেছে গলায়
নিয়েছে সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। অনন্ত প্রেম। ঐ।

গ। সারাটি রজনী বসি দুয়ার দেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে
সুখহীন ধনহীন
চলে গেনু উদাসীন
প্রভাতে পরের দিন
পথিকে এসে
সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে। অনাদৃত। সোনার তরী।

ঘ। যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল
তোমারি মদির গন্ধে অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্তভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল অঞ্চলা
বিদ্যুৎ চঞ্চলা। উর্বশী, চিত্রা।

ঙ। আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভারে
মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নামিবে ভূতল
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল। উৎসর্গ, চৈতালি।

চ। যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিগ্‌দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা। দুঃসময়, কল্পনা।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি উদাহরণে শব্দধ্বনিসংগমে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

'ক্ষণিকা'তে এসে রবীন্দ্রনাথ দশমাত্রিক ছন্দে কতখানি বৈচিত্র্য দেখানো যেতে পারে, তা প্রমাণ করলেন। এরপরে 'নৈবেদ্য' কাব্যে আমরা কবির আটাত্তরটি সনেটের পরিচয় পাচ্ছি। আগেই বলেছি, সনেট রচনার ব্যাপারে

রীতিগত আদর্শের শাসন তিনি অমান্য করেছেন। 'নৈবেদ্য'র সনেটগুলিতে তিনি সরল দ্বিপংক্তির মিল দিয়েছেন। এই সনেটগুলিতে মধ্যে মধ্যে পংক্তিকে ছোট করে যতি দেওয়া হয়েছে। পংক্তির বাকি অংশ নিয়ে পরবর্তী স্তবক আরম্ভ করা হয়েছে। মাইকেলের মতো কিছু sonnet-sequence রচনা করেছেন কবি 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে। চৌষট্টি থেকে সাতষট্টি এবং তিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই—এই দুটি পরম্পরা দেখা গেছে।

'বলাকা' কাব্যে কবি মুক্তক ছন্দকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতের' 'তারকার আত্মহত্যা' এবং 'মানসী' কাব্যে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় এর সূচনা হয়েছিল। মিল অনুপ্রাসের প্রতি লক্ষ রেখে লঘুতম উপপর্বিক যতিতে পংক্তি বিন্যাস করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই ছন্দই হলো ইংরিজি Free verse বা ফরাসী vers libre। গদ্য কবিতা প্রসঙ্গে এই কথা আলোচনা করা যাবে। 'পলাতকা' কাব্যেও মুক্তক আছে, তবে তা দলমাত্রিক মুক্তক। 'পূরবী' কাব্যের কতকগুলি কবিতায় ('দোসর', 'অবসান' ইত্যাদি) Troilus stanza ধরনের স্তবক-নির্মাণ-কৌশল দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরণেব স্তবকে এক একটি ক্ষুদ্রতর এবং দীর্ঘতব পংক্তি পুচ্ছের মতো মিলের দ্বারা অন্যান্য পংক্তিব সঙ্গে গ্রথিত হয়ে থাকে।[৩৯] যেমন :

ক। আমরা তারাব মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্য হারার দলে।
বাসায় এলো পথের হাওয়া কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলনঘন বাতে
বাঁধন হারা শ্রাবণ ধারাপাতে। তারা।

খ। সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই
নিভৃতক্ষণে আপন-মনে গাই।
অভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে
অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে
আজিকে তারা পড়ুক ধরা মিলুক পূরবীতে
একটি সংগীতে। অবসান।

গ। কাঁকন জোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।

তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটি দেখি নাইতো হাতে
হয়তো এলে ভুলে। দান।

'পুনশ্চ' কাব্যে কবি গদ্য-কাব্যের সূচনা করলেন। ভূমিকায় লিখলেন:

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে—গদ্যে ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজীরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা, মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার কবেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পবীক্ষা করেছি, লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপাবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধকরি ভীরুতাই তার কাবণ।

অবশ্য 'পুনশ্চ' কাব্যের সব কবিতাই গদ্যকাব্য নয়। 'গানের বাসা', 'ছুটি', 'পয়লা আশ্বিন' ইত্যাদি কবিতা দলমাত্রিক রীতির অমিল মুক্তক। এগুলিতে 'পলাতকা'র সুরের বেশ রয়ে গেছে। যাই হোক, গদ্যকাব্য প্রবর্তনের পিছনে রবীন্দ্রনাথেব মনে গদ্যকাব্যের বিদেশী প্রবক্তাদের কৈফিয়তগুলির প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। গুস্তাভ্ কাহ্ন্ এই গদ্য কাব্যরীতির মধ্যে নতুন সঙ্গীত ও জটিল ভাবনার অনুসরণ (une music plus complexe) শুনেছিলেন। লাফোর্গ এই রীতিতে পেয়েছিলেন মনোগত অভিপ্রায়ের নিকটতম প্রকাশের উপায়। মালার্মে কবিতার পোষাকি গাম্ভীর্য ছেড়ে কবিতাকে অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত করবার পথ দেখতে পেয়েছিলেন। এর কিছু আগেই ভ্যের্লেন একেবারে নিরেট গদ্যকবিতাকে পছন্দ করতে না পারলেও [Vers Libre] প্রচলিত ছন্দ ভিত্তিক মুক্তকের (vers libéré) মধ্য দিয়ে, ছন্দধ্বনিকে যথাসম্ভব ক্ষীণ, সংকুচিত ও দূরান্তরিত করবার চেষ্টায় ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ইয়েট্সের কতকগুলি প্রবন্ধে ভ্যের্লেনের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল; শোনা গিয়েছিল faint, fluid and tenuous kind of verse rhythm-এর

সমর্থনের কথা। ১৯০৮ সালে লেখা টি ই. হিউমের আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত এক আলোচনায় পাওয়া যায় কাহ্নের কথারই অনুসরণ। হিউমের বক্তব্য ব্যাখ্যায় নতুন ভঙ্গিকে গভীরতর মনোবিশ্লেষণের দর্পণ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ও অধিকতর সুযোগরূপে দেখানো হয়। অনেকটা মালার্মের কথারই প্রতিধ্বনি করে হিউম বলেন যে, প্রচলিত রীতির কবিতায় স্থায়িত্ব, চিরকালীন সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি কবিদের আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু ফ্রি ভার্সে চলতি জীবনের চাঞ্চল্য দেখতে পাওয়া যায়, উপরন্তু ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত ও অন্তরঙ্গতম অনুভূতি প্রকাশ করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকে। এই ধরনের অন্তরঙ্গ ও ক্ষুদ্রায়তনিক ভাবনাকে প্যাটার্নে বাঁধার ব্যাপারটা ছোট শিশুকে লোহার ফ্রেমে আঁটার মতো। এজরা পাউণ্ডের সমর্থনের মধ্যেও লাফোর্গ ও মালার্মের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ডি. এইচ লরেন্স্ অন্যভাবে বললেও গদ্য কবিতা যে অন্তরঙ্গ অনুভূতির প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন। এই বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধার করে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে :

ক। সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীব পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদ্জনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন কি বামদিক থেকে রুনু-ঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটেব উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসার যাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগল।

[এই উক্তির মধ্যে প্রাত্যহিকতা, ছন্দের ক্ষীণ দূরশ্রুত আভাস ('বামদিকে রুনুঝুনু…'), প্রকাশের ভাষায় আটপৌরে ভাব, সহজ রূপ (spontaneity) ও ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশের নানা বৈচিত্র্য ('স্থূল ও সূক্ষ্ম নানাভাবে') গদ্যকাব্যের সমর্থকদের উক্তির মধ্যেকার সব কটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে।]

খ। পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজীরই মতো বাংলায় গদ্য কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা…

[এই উক্তির মধ্যে 'a slighter and more hesitant rhythm'—ভ্যের্লেনের অম্বিষ্ট সত্যের সঙ্গে মিল পাচ্ছি।]

গ। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, যেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনও ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

[এই সঙ্গীত বৈচিত্র্যের কথা গুস্তাভ্ কাহ্নেরও বক্তব্য।]

এই সব কবিদের কৈফিয়ত ছাড়াও বাইবেলের ভাষা, তার মধ্যেকার সলোমন ও ডেভিডের গাথার গদ্য কাব্য-রস, হুইটম্যানের কবিতা, এলিয়টের কবিতা, চীনা-জাপানী কবিতা এই সব যে ববীন্দ্রনাথকে অনুপ্রেরিত করেছে তার প্রমাণ তাঁর 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধ ও বিভিন্ন চিঠিপত্রের আলোচনা।[৪০] সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্যে কাব্যগুণের তিনি উল্লেখ করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে গদ্য কবিতার বিচিত্র সঙ্গীত ফোটাতে গিয়ে সংস্কৃত-প্রধান বাঙলা গদ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশী। গদ্যকাব্যে ছন্দ-কাব্যের বন্ধন না থাকলেও তার ভিতবকাব শিল্পকলা যে শ্রমসাধ্য সে কথা স্বীকার করেছেন: 'এর মধ্যে বাক্যসংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দ ব্যবহারের একটা তেরছা চাহনি রাখতে হয়েচে।··· —আপিস ঘবের ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জিত অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।' এই কথা মনে রাখলে এলিয়টের কথাবই সমর্থন পাই: No verse is libre for the man who wants to do a good job'. [এজরা পাউণ্ডের 'Poems'-এর ভূমিকা]।

এখন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা Vers libre কিনা বিচার করা যেতে পারে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইটির পাঠ-পবিচয়ের একস্থানে পাদটিকায় [পৃ. ৩৭৭] বলা হয়েছে:

> পলাতকার ছন্দকে অবশ্যই দলমাত্রিক মুক্তক বলা যায়। Vers libre বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই জাতীয় ছন্দোবন্ধকে vers libre বা free vers বলেই মনে করতেন বলে বোধ হয়।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটির পরিশিষ্টে একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া গেছে। একজন ফরাসী অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি বাঙলায় ফ্রি ভার্স রচনা করেছিলেন কি? কবি উত্তরে বললেন: 'আমি অনেক ফ্রি ভার্স রচনা করেছি।' আসলে ইংরিজি সাহিত্যে ফ্রি ভার্স বলতে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্নভিত্তিক মুক্তিকেই বোঝায় এবং বড় বড় ইংরেজ কবি এই ধরনের কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত বলে ফ্রি ভার্সের

নতুন কোন নামকরণের দিকে তাঁদের কোন ঝোঁক পড়েনি। ফলে একেবারেই 'প্যাটার্ন হীন' ছন্দের সঙ্গে 'মুক্তি-লিপ্সু' প্যাটার্ণের ছন্দকে এক করে ইংরেজীতে 'ফ্রি ভার্স' এই নামকরণ করা হয়েছে। ফরাসীরা এ ব্যাপারে ইংরেজদের তুলনায় একটু বেশি যত্নশীল হওয়ায় 'ফ্রি ভার্সের' দুটি বিভাগের পার্থক্যকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। ফরাসিতে Vers libéré এবং Vers libre এই দুয়ের পার্থক্য করা হয়েছে। Vers libéré-এর অর্থ 'Verse which has been liberated from some pre-existing chains'। Vers libre-এর অর্থ 'Verse which is born free'।[৪১] এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী যে পার্থক্য সূচিত হচ্ছে তাকে ইংরিজিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। কারণ ইংরিজিতে libéré ও libre এই দুয়ের পার্থক্য অনুযায়ী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। যাই হোক, এই পার্থক্য অনুযায়ী ফ্রি ভার্সের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী Vers libéré বলতে 'বলাকা'র ছন্দ—'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' ও 'মানসী'তে যার সূচনা, 'পলাতকা'ব ছন্দ এবং এই ছন্দে রচিত পরবর্তী কালের অনেক কবিতাকে বোঝায়। 'বলাকা'র ছন্দের ভিত্তি পয়ার ছন্দ ; কিছু কবিতা অবশ্য ছড়ার ছন্দের ভিত্তিতে মুক্তি পেয়েছে এবং এই ছড়ার ছন্দের ভিত্তিতেই 'পলাতকা'র কবিতাগুলি রচিত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রবহমান পয়ারে লিখে গেছেন কবি। 'বলাকা'র ছন্দে অন্ত্য মিল আছে, কিন্তু একেবারে শেষ দিকে প্রবহমান ছন্দে অন্ত্য মিল ছিল না। এই মিলের অনুপস্থিতিতে কাব্য-পংক্তিগুলি মিলেব সূত্রে আবদ্ধ না হয়ে পৃথক পৃথক ধীরলয়ের মন্ত্রের মতো গন্তমুখী হয়েছে।

Vers libre বলতে ফরাসীবা বোঝেন কাব্য-রসাক্রান্ত গদ্য বা poetical prose যা কোনভাবেই ছন্দের প্যাটার্নে বাঁধা পড়ে না। এই পর্যায়ে আমরা 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শেষ সপ্তক' ও 'শ্যামলী' এই চারটি বই-এর অধিকাংশ কবিতাকে ফেলতে পারি। এই সঙ্গে দশ বছর আগেকার রচনা 'লিপিকা'কে কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাব্যস্তবের অন্তর্ভুক্ত করলে লিপিকার রচনাগুলিকেও Vers libre বলতে পাবি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, গদ্য কবিতার চারটি বইতে বহু কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে ছন্দ-লক্ষণাক্রান্ত পংক্তি এসেছে কিন্তু এলিয়টের লক্ষণা অনুযায়ী ('There are only two ways of coming at free verse—by starting with a conventional one and continually receding from it and by starting without any

pattern at all and continually approaching some conventional one'.) সেই ছন্দলক্ষণাক্রান্ত পংক্তিগুলি থেকে এ সিদ্ধান্ত করতে পারি না যে কবিতাগুলি 'continually approaching some conventional one'। যে কোনো ভালো গদ্য কবিতার ছন্দোলিপি করলে পর্বগুলির মধ্যে মাত্রাসাম্য সম্পূর্ণভাবে দেখা না গেলেও প্রায় কাছাকাছি থাকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় নিয়মিত পর্ববিভাগ পাওয়া যায়, দু-এক স্থানে আকস্মিক পর্বসাম্য দেখা দিতেও পারে। এইজন্যই একেবারে সাদা-মাঠা গদ্যের পাশাপাশি রাখলে গদ্য কবিতার মধ্যে একপ্রকার ছন্দের আভাস বা ধ্বনি-ব্যঞ্জনার আস্বাদ পাওয়া যায়। যাই হোক, এই চারটি বই-এর গদ্য কবিতাগুলিকে সামগ্রিক ভাবে দেখলে poetical prose-ই মনে হয়। দু-একটি ছন্দ-পংক্তি দেখে তাদের মধ্যে 'সর্বক্ষণই' ছন্দবন্ধনে বন্দী হবার প্রবণতা আছে, এমন মনে করলে ভুল হবে।

কাজেই, ববীন্দ্রনাথেব 'বলাকা' ও 'পলাতকা'ব ছন্দ-কবিতা এবং গদ্যকবিতা প্রকৃতপক্ষে ফ্রি ভার্স-ই। তার কতকগুলি কবিতা প্রচলিত ছন্দকে ভিত্তি কবেই মুক্তি পেয়েছে অর্থাৎ সেগুলি Vors lib́eré। আব কিছু কবিতা কাব্যময় গদ্য বা Vers libre এবং সে কাব্যময় গদ্যের ছন্দবন্ধনে বাঁধা পড়বার সার্বক্ষণিক প্রবণতাও নেই। অতএব এই প্রসঙ্গে কোন 'সংশয়ের অবকাশ' নেই।

কবিতায় মিল দেওয়ার ব্যাপাবে ববীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই। ঈশ্বর গুপ্ত 'যমকেব শ্রাদ্ধ' করেছিলেন বাঙলা কাব্যে। বঙ্গলাল ও বিহারীলাল বিশুদ্ধ মিল সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, নবীনচন্দ্র এ ব্যাপাবে বিশেষ সচেতন ছিলেন না, হেমচন্দ্রের হাতে অন্ত্যমিলের দুর্গতি ঘটেছিল, দেবেন্দ্রনাথও এই দুর্গতিতেই গা ভাসিয়েছিলেন। বিহারীলালের বিশুদ্ধ মিল ঘোষণার কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। কাজেই অনুমান করতে পাবি, বাল্যকাল থেকেই তিনি এ বিষয়ে সচেতন। এছাড়া ইংরেজ কবিশিল্পীদেব রচনাও নিরন্তর লক্ষ্য করে গেছেন তিনি, এবং শেষ পর্যন্ত, বাঙলা কাব্যরীতির ক্ষেত্রে মিলের আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে গেছেন। মিল তাঁর ধাতে ছিল বলেই তিনি কীট্সের run-on and enjambed rhymed couplet-কে বাহন করে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করে গেছেন। আরও একটি ব্যাপাব লক্ষ্য করার মতো। যখন তিনি গদ্য কবিতার সপক্ষে নানা কৈফিয়ত দিয়ে ছন্দ-মিল ইত্যাদি বর্জন করে কাব্যের মধ্যে নতুন

সঙ্গীত নিয়ে এলেন, গদ্য কবিতার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল বললেন, ঠিক সেই সময়েই 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' ও 'প্রহাসিনী'র মতো বই লিখে মিলের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখালেন। এখানে কিছু মিলের উদাহরণ দিয়ে আমরা আলোচনা শেষ করছি :

ক। খণ্ডিত মিল :

শ্রাবণে ডেপুটি পনা,
এ ত কভু নহে সনা—
তন প্রথা এ যে অনা—
সৃষ্টি অনাচাব !

খ। মধ্য মিল :

১। কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ অগাধ আকাশে।
২। কম্পিত সুরে আধো ভাষা পুরে কেন এসে গান গাও।
৩। এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা।
৪। বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।

গ। Inverse rhyme :

১। একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ নদীকূলে।
২। ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী।
৩। যে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে।

ঘ। একাক্ষর মিল :

কানের কাছে তার বাখিয়া মুখ
কহিল ওস্তাদ জি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও
এরে কি গান বলে, ছি !

এছাড়া সরল কলামাত্রিক ছন্দের স্তবকের শেষ শব্দটিতে অনেক সময় এমন দোলা এসেছে যে তার মিল পূর্ণাঙ্গ না হলে ছন্দই যেন ক্ষুণ্ণ হয়। মোহিতলাল এ মিলেব প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামতো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

এখানে 'খঞ্জনা' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন 'অঞ্জনা' ও 'রঞ্জনা' শব্দ দুটির আবির্ভাব অপেক্ষিত মনে হয়। অনুরূপ মিল পরের উদাহরণে:

মন দেওয়া নেওয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে
নূপুরেব মতো বেজেছি চবণে চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে
সাধিয়া মরেছি ইঁহারে তাঁহারে উঁহারে
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত বরণে।

'সাবিত্রী' কবিতার শেষ স্তবকের শেষ পাঁচটি পংক্তি যখন পড়ি:

সীমন্তে গোধূলি লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সংগীত-ধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে।

তখন মনে হয় ক্যাথারিন উইলসনের কথা:

Many poets so think in rhyme that we can say neither that the rhyme came first nor that the thought came first, but that their thought came in rhymed form. *Sound and Meaning in English Poetry.* 1930.

রবীন্দ্রনাথ এই জাতেরই কবি।

১। রবীন্দ্রায়ণ, প্রথম খণ্ড। আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব। পৃ. ২০৩।

২। বেতার জগৎ, শতবার্ষিক সংখ্যা। পরে 'সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ' বই-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরিবর্তিত আকারে। পৃ. ১৫৫-১৫৬ দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ) ও মাসিক ব্রাহ্ম-সমাজের উপদেশ একত্রে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ১৯৪৫। পৃ. ১৩।

৪। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ৩য় সং ১৮৬৯: পৃ. ৯৪।

৫। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬৯]: পৃ ৭৯-৮০।

৬। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান। পৃ. ১৫।

৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ সংস্করণ পৃ. ১৮৮-১৮৯।

৮। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব [১২৮৩ : কার্ত্তিক]।

৯। ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব [১২৮৩ : কার্ত্তিক]।

১০। জীবনস্মৃতি : 'ভগ্নহৃদয়' শীর্ষক অধ্যায়। পৃ. ১০১ [১৩৬২ সং]।

১১। জীবনস্মৃতি : 'ভগ্নহৃদয়' শীর্ষক অধ্যায়। পৃ. ১০০-১ [১৩৬২ সং]।

১২। জীবনস্মৃতি : 'ভগ্নহৃদয়' শীর্ষক অধ্যায়। পৃ. ১০২ [১৩৬২ সং]।

১৩। From Blake to Byron. Ed. by Boris Ford, 1946; 'Shelley's Poetry' by D. W. Harding, Page 208।

১৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [প্রথম সংস্করণ : ১৯৫২] পৃ. ৩৬-৩৭।

১৫। সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভূমিকা। রবীন্দ্রবচনাবলী। শতবার্ষিক সং, ১ম খণ্ড।

১৬। আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব, রবীন্দ্রায়ণ, ১ম খণ্ড। পৃ. ২০২-০৩।

১৭। জীবনস্মৃতি : 'প্রিয়বাবু' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৮। জীবনস্মৃতি : 'প্রভাত সংগীত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯। The Romantic Assertion · R. A Foakes p. 46।

২০। প্রভাত সঙ্গীতেব সূচনা। ববীন্দ্রবচনাবলী। শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

২১। ছবি ও গানের সূচনা। রবীন্দ্ররচনাবলী। শতবার্ষিক সংস্করণ, প্রথম খণ্ড।

২২। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'। দেশ, শতবর্ষ পূর্তিসংখ্যা, ১৩৬২।

২৩। কড়ি ও কোমলের ভূমিকা। কবির মন্তব্য। পৌষ ১৩৪৬।

২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ৩য় খণ্ড। [১ম সং, ১৯৫২] পৃ. ৫৫।

২৫। অনূদিত অংশটি এই :

বল রে যুবতী বালা কোথা যাবি তুই ?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, বল কোথা যাবি তুই।

সোনার ডিঙায় সোনার হাল, পরীর পাখায় উড়িছে পাল—
হাতির দাঁতের দাঁড়টি লয়ে, দেবতার ছেলে যাইবে বেয়ে
বালা কোথা যাবি তুই? 'কাব্যজগৎ' [১২৯৩, শ্রাবণ, ভারতী]।

২৬। এই বইটির ১৮৯১ সনে প্রকাশিত একটি সংস্করণ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে রয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের নিজের পড়া বই বলে মনে হয়। উদ্ধৃত লাইনগুলির পাশে দাগ দেওয়া আছে। সে দাগও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বলে অনুমান করি।

২৭। রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য [বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪]: বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য।

২৮। ছিন্নপত্রাবলী। ৮৬ সংখ্যক পত্র। পৃ. ১৮৭।

২৯। ছিন্নপত্রাবলী: ১১৭ সংখ্যক পত্র। পৃ. ২৫১-২।

৩০। 'সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা: রবীন্দ্রনাথ' বুদ্ধদেব বসু: 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী'। শারদীয় বেতার জগতের প্রবন্ধ [পরিবর্তিত] পৃ. ১৫৯।

৩১। হাইনের কবিতাগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধনা' পত্রিকাতে [বৈশাখ ১২৯৯: প্রথমার্ধ] ষষ্ঠ সংস্করণ।

৩২। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ১৩২৯ এর জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত এবং প্রয়াত প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত। এই সময়ে সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজকে লিখিত চিঠিগুলি Letters to a Friend বইটিতে সংকলিত হয়েছে। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা যে গভীর বিশ্ব-চেতনারই রূপান্তর তার প্রমাণ হিসাবে অ্যাণ্ড্রুজের লেখা ওই বইয়ের ভূমিকা থেকে তুলে দিচ্ছি: 'এর পরের কয়েকটি মাস কবির মানসিক উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, অবশেষে অতি ধীরে ধীরে সেই কষ্টের হাত থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন।

'য়ুরোপের মহাযুদ্ধের আরম্ভভাগে এই বেদনা তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তার একটি কারণ, যুদ্ধহেতু পৃথিবীর বিপর্যয়, অন্য কারণ বেলজিয়ামের জন্য তাঁর আন্তরিক সমবেদনা। এই সময়ে এই সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজিতে তাঁর তিনটি কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সেইগুলি পড়ে আমরা বুঝতে পারি সেই সময়ে তাঁর মধ্যে কী দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল। এর প্রথম কবিতাটির নাম The Boat Man—নেয়ে (মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ঐ যে আমার নেয়ে)। এটি লেখার সময়ে

তিনি আমাকে বলেছিলেন—সেই নির্জন প্রাঙ্গণে যে মেয়েটি ধূলায় বসে অপেক্ষা করছে সেটি বেলজিয়ামেরই প্রতীক। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবিতাটি হল The Trumpet—শঙ্খ (তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইব)। তৃতীয় কবিতার নাম The Oarsmen—কাণ্ডারী (দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন)। এর দৃষ্টি যুদ্ধের পরবর্তী কালের দিকে। কারণ, বিশ্বাসের যে প্রচণ্ড শক্তির প্রকাশ এতে হয়েছে তার প্রয়োজন হবে তখনই যখন পুরাতন পৃথিবীর আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে ফেলে নতুন পৃথিবীতে পৌঁছুবার জন্য তরঙ্গক্ষুব্ধ অসীম সমুদ্র অতিক্রম করে যেতে হবে। চতুর্থ কবিতাটি [বিচার] তখনও প্রকাশিত হয় নি। পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কবি সেটি আমায় দেন, সেবার খৃষ্টজন্মোৎসবে তিনি আশ্রমের শিক্ষক ছাত্র সকলের সামনে একটি চমৎকার ভাষণ দেন। তাতে খৃষ্টকে তিনি 'শান্তির রাজা' বলে অভিহিত করে দেখিয়েছেন য়ুরোপে কি ভাবে তাঁর নামকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে।' শ্রীমলিনা রায়ের অনুবাদ [বিশ্বভারতী পত্রিকা: শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০]।

৩৩। গ্যেটের Faust-এর এই পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। 'সোনার তরী'র পাণ্ডুলিপির (রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে দেখেছি) প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকে মূল জার্মানসহ ইংরিজি অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথ লিখে রেখেছিলেন। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে (১৮৯৫, ৫ই অক্টোবর) এই পংক্তিটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'এই পংক্তিটিই আমি খুব ভালো করে মনে করে রেখেছি।'

৩৪। 'পরিশেষ' কাব্য প্রকাশের প্রায় দু-বছর আগেকার একটি চিঠিতে এই অনুভূতির ক্রমোদ্বোধনের পরিচয় পাই। ১৯৩০-এর ৩১শে অক্টোবর ফিলাডেলফিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে কবি লিখছেন: 'যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারীর উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। সে সব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে

আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি'।

৩৫। অজিত চক্রবর্তীকে ১১ই চৈত্র, ১৩১৪ তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।

৩৬। 'আধুনিক সাহিত্য' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৩৭। এই মিলহীন ত্রিপদী বা পয়ারের পিছনে শেলির Queen Mab, Alastor ইত্যাদির মিলহীন মুক্তক ছন্দের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।

৩৮। সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ : পৃ. ২৩৭।

৩৯। বার্নসের কবিতা থেকে একটি Troilus Stanza উদ্ধার করছি :

Give me a spark o' Nature's fire,
Thats' a' the learning I desire,
Then tho' I drudge thro' dub an mire
At pleugh or cart,
My music though homely in attire
May touch the heart.

৪১। ছন্দের আলোচনায় [জে. ডি. এণ্ডারসনকে লিখিত] ইংরিজি ঝোঁকের সঙ্গে বাঙলা ঝোঁকের তুলনা করেছেন কবি। চিঠিপত্রে বহুক্ষেত্রে বোঝাবার জন্য ইংরিজি ছন্দ ধর্মের যে উল্লেখ করেছেন তাতে ভাষার ছন্দবোধ তাঁর প্রখর বলেই মনে হয়। সমসাময়িক ইংরিজি কাব্যসাহিত্যে ছন্দপরীক্ষা বা ছন্দে স্বাধীনতা গ্রহণ করবার যে চেষ্টা চলছে সর্বক্ষণ, তার সম্বন্ধে কবি যে ওয়াকিবহাল তার প্রমাণ হিসাবে তাঁর একটি চিঠি থেকে অংশত উদ্ধার করা যেতে পারে : 'ইদানীং দেখছি, গদ্য আর রাস মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন ছাড়ার 'বিধান' আপনি গড়ে উঠবে—

এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাইনে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।' শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা চিঠি, ২৮ আশ্বিন, ১৩৪৩। এছাড়া বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'র' চিহ্নিত বইগুলির মধ্যে গদ্যকবিতা সম্পর্কে এই বইগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বলে মনে হয়: ১. Selected Poems by Ezra Pound। Edited with an introduction by T. S. Eliot. ২. Polite Essays by Ezra Pound. প্রথম বইটিতে এলিয়টের ভূমিকায় গদ্য কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আছে। দ্বিতীয় বইটিতে পাউণ্ডের The Prose Tradition in Verse নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে গদ্যকবিতার রীতি সম্পর্কে সচেতন করেছে।

৪২. Image and Experience : Graham Hough। 'Free Verse প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

চোদ্দ
পরবর্তী কবিগোষ্ঠী

যে সময় থেকে আলোচনার সূত্রপাত করছি সেই সময়ের পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলির সূত্র টানলে দেখা যাবে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে যুক্ত না হলেও আমাদের বেশ কিছু অর্থনৈতিক ও মানবিক রসদ মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সবকাবের মর্লি-মিণ্টো রিফর্মের সান্ত্বনা স্বাধীনতাকালীন ভারতবাসীর মনে দাগ কাটলো না। গান্ধীজীর অসহযোগের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমরা প্রমাণ করলুম। জনশক্তি ক্ষণিকের জন্যে হলেও গণতান্ত্রিক চেতনায় সংহত হয়েছিল, ছাত্র-ছাত্রীদেব মধ্যে আইন-অমান্যতার বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল। রুশ বিপ্লবের সাফল্যও বেশ কিছুটা বাস্তব দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। শ্রমচেতনা, অবহেলিতের প্রতি দরদ, সমাজ-গঠনেব স্বপ্ন ধীবে ধীরে ফুটে উঠতে লাগলো এবং সেই সূত্রে শুরু হলো কিছু বিদেশী সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে অন্যান্য দেশ ও সমাজকে বুঝবার চেষ্টা। শহরাঞ্চলে কলকারখানাব প্রসাবে শিল্পবিপ্লবেব অব্যর্থ ফলাফল দেখা দিয়েছে—গ্রামের মানুষ শহরে বস্তিবাসী হয়েছে। গ্রামে জমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আগের মতোই দুর্বিষহ। তাদেরই কেউ কেউ ভিটে-মাটি ছেড়ে শহরে এসেছে কলকারখানাব কাজে। নানা দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা ও বিদেশী বিপ্লবের সাফল্যের স্বপ্ন চোখে নিয়েই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এদের যন্ত্রণাকে বুঝতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ তো অনেক আগেই মাটি-কাটা পাথর-ভাঙা বারো মাসের শ্রমিক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন। কিছু পরেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছেন (মরীচিকা, ১৯২৩) 'মানুষ' কবিতায়: 'শোভন করিয়া ঢাকিতে আপন লজ্জাটুকু/জুটে নাই হেন বাস, তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ/তুলিছে মাটির রাশ,/যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে/ঘর্মের নির্ঝর,/সহ্য-অগ্নি সমান যে সহে বক্ষপরে/লক্ষ দুঃখ মত'……কবিতার পরে আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের' ইত্যাদি পংক্তিগুলিকে নতুন বলে মনে হবে না। এই মানবিকতাবাদের সূত্রেই আমরা বিদেশী মানবিকতাবাদী রচনা পড়তে শুরু করেছি, হুইটম্যান যাঁদের অন্যতম।

মানুষের প্রতি এই সামগ্রিক দৃষ্টিলাভের সূত্রেই তার জৈবকামনা, তার বিকার ও আত্মবিক্রয়, তার দুঃখ-যন্ত্রণা ও স্বপ্নবিলাস, তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ও রাজনীতি এবং তার নিঃসঙ্গ আপন ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণভাবে অবহেলিত ও শোষিত মানুষের প্রতি ঝোঁক এই যুগের সাহিত্যে পড়েছে। মানবিকতা-বাদের সূত্রে পরিচয় হয়েছে রুশ সাহিত্যের টলস্টয়, গোর্কি, দস্তয়েভ্‌স্কি, বুনিন ইত্যাদির সঙ্গে, ফরাসী সাহিত্যের রলাঁ ফ্রাস ইত্যাদির সঙ্গে, অ্যামেরিকার সাহিত্যের এমার্সন, থোরো, হুইটম্যান ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষ করে জৈবকামনা, বিকার, আত্মক্রিয়, দুঃখ যন্ত্রণা, স্বপ্নবিলাসের সূত্রে এসেছে ফ্রয়েড-য়ুং-এর মনোবিকারপন্থা, রোম্যান্টিক, ভিকটোরিয়ান, ইয়োরোপীয় সিম্বলিস্ট কাব্য এবং ইমেজিস্ট ও সমাজবাদী কাব্য-সাহিত্য।

কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে কবিরা তাঁদের রচনা শুরু করেছিলেন তাঁরা এই আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যেরই অংশীদার হয়ে রবীন্দ্র-বিরোধিতার বড়াই করে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনেক অস্ত্রই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হাতে শাণিত দেখে তাঁরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই পর্বে ষাট বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ কীভাবে পাল্টাচ্ছিলেন, তা আগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবা হলেও এই প্রসঙ্গে একটুখানি লক্ষ্য করা যাক।

মানুষের প্রতি গভীর মমতা বশে যে ম্যান ইন দি স্ট্রিটকে এই তৃতীয় দশকের যুবক কবিরা কবিতার আসরে নামালেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ আগেই দিয়েছেন 'পলাতকা' কাব্যেব মধ্যে (১৯১৭), অত্যন্ত সাধারণ সংসারের ঘানি-টানা মৃত্যুমুখী অখ্যাত মানুষগুলির ব্যর্থ স্বপ্নের প্রকাশে। ইয়োরোপীয় কবিতায় যেমন, এখানেও তেমনি, মানুষ ও প্রকৃতির স্থান নিয়েছিল শহরের মানুষ, কবি ও শহরের রাস্তা। তারপর পশ্চিমী জড় সভ্যতার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ 'শিশু ভোলানাথে'র (১৯২২) রূপ ধরলেন জডত্বের স্তূপ থেকে আত্ম-মুক্তির জন্যে। পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাব এখানে প্রতিক্রিয়া। 'পূরবী' কাব্যে মূলতঃ রোম্যান্টিক প্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে, ব্যতিক্রম শুধু—বার্ধক্যে সেই প্রেমকে তার উদ্দীপ্ত যৌবনস্বরূপে দেখে অক্ষমতায় একটু পেছিয়ে আসা। 'মহুয়া'তেও ওই রোম্যান্টিকতার সূত্রেই নারীর বিকাশ ও বৈচিত্র্যকে উপভোগ করার চেষ্টা। 'বনবাণী'তেও প্রকৃতিকে জীবন ও ইন্দ্রিয়োপভোগের আদি-প্রেরণা হিসাবে দেখার মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এমার্সনের সত্যানুভূতি ও

কীটসীয় ইন্দ্রিয়মগ্নতার শিক্ষা মিশে আছে এবং তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক সূক্ষ্ম নৈপুণ্য মিশে গিয়ে বইটি প্রায় তুলনাহীন। কিন্তু 'পরিশেষ' কাব্যে কবি খুব বেশী পরিমাণে জীবনস্মৃতি-নির্ভর, যদিও কিছু কিছু কবিতায় ভাষাভঙ্গিতে ও মেজাজে বলাকার প্রাণশক্তি এবং ক্ষণিকার মুগ্ধ কৌতুকের মিশ্রণে এক নতুন বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার ঝোঁক দেখা গেছে। এ ঝোঁকটা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপীয় মানসিকতায় খুব বেশি করে ধরা দিয়েছিল। বিজ্ঞানচিন্তা যুক্তি-তর্কের পথ ধরে এসে আধ্যাত্মিক চিন্তাকে চাপ দিয়েছে, চিন্তার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের চেয়ে সভ্যতার স্রষ্টা বিজ্ঞানী এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের জগৎস্রষ্টা মনীষী বা কবির প্রাধান্য হয়েছে বেশী। 'মানুষে'র চেয়ে 'সাধারণ মানুষ' কথাটার দাম এখন বেশী। বিশ্বপ্রকৃতিকে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছে বিশেষ করে শহরের রাস্তা। অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও স্রষ্টা মানুষের সৃষ্টিচিন্তা এই ত্রয়ী-বিশ্বে পরিসীমিত—স্বয়ং স্রষ্টা, সাধারণ মানুষ এবং শহরের জনাকীর্ণ গলি ও রাজপথ। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন চিন্তা জগতের পাঠকের কথা ভেবেই কবিতায় যুক্তি ও বুদ্ধির শাণিত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এসেছেন, যদিও বার্ধক্য হেতু অবধারিত-ভাবে কবি মৃত্যুর পর তাঁর প্রাকৃতিক একাত্মতার কথা ভাবছেন। বিশের দশকে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে প্রথমে উত্তাল এবং পরে হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে, বিদেশী রাষ্ট্রের সমাজবাদী আদর্শ যেভাবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষকে নাড়া দিয়েছে, যুদ্ধ-পরবর্তী মন্দার ফলে গ্রাম থেকে শহরের টানে চলে-আসা চাকুরীজীবী ও চাকুরী-প্রার্থী শিক্ষিত মানুষের যে বিপন্নতা এসেছে, গ্রামের দরিদ্র কৃষিজীবী মানুষ নিরন্নতায় যেভাবে ভুগেছে—তাতে এই পরিপ্রেক্ষিতকে কেবল পূরবী-মহুয়া-পরিশেষ কিংবা শিশু ভোলানাথ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যায় না বলেই বোধহয় তরুণ কবিরা নতুন বাস্তবতার বিদ্রোহী পতাকা উড়িয়ে ছিলেন কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতির মাধ্যমে। ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত এবং সচ্ছল মধ্যবিত্ত যে আত্মকেন্দ্রিক অবদমিত কামনার আশ্রয় নিয়েছিলেন, ফ্রয়েড বা পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিকদের মনোবিকলন-পন্থা ঠিক সেই সময়েই চর্চিত হয়ে প্রচলিত নৈতিক আদর্শে অনাস্থার ভাব এনে দিয়েছিল সাহিত্য-স্রষ্টাদের মনে। তাঁদের পক্ষে এই অবদমিত জৈব কামনাকে বিশ্লেষণ করা বা রক্তের মধ্যে তার গূঢ় অনুভবকে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করাও সম্ভব হয়েছিল পশ্চিমী কাব্য প্রকাশ পদ্ধতির তাড়নায়। তরুণ কবিদের প্রসঙ্গে

এই চিন্তা-ভাবনার কাব্যিক প্রকাশের পরিচয় দেওয়া যাবে। আপাততঃ এইটুকুই বক্তব্য যে, এই দশ বছরের পবিপ্রেক্ষিত ও প্রতিক্রিয়ার পরিবেশে বিদেশবাসী রবীন্দ্রনাথ কিংবা চরকা-বীতশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কিংবা, দারিদ্র্য সচেতন হয়েও[১] আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় উদ্দীপ্ত রবীন্দ্রনাথ দেশীয় বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঠিক স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করতে পারছিলেন না।[২] কিন্তু ক্রমশঃ বিশ্বব্যাপী মন্দা চবমে পৌছোলো এই বিশের দশকেব শেষে। ১৯২৯ সাল বিশ্বমন্দাব শীর্ষবছর। 'উটপাখী' কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ পরে সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন: 'বর্গীব ধান খায় যে উন্‌তিবিশে।' রবীন্দ্রনাথ জার্মানি হয়ে (জার্মানিতে 'প্যাশান প্লে' দেখে লেখা বাইবেলীয় প্রেবণা ও হিন্দু কল্পনার মিশ্রফল 'দি চাইলড', যা পরে 'শিশুতীর্থ' রূপে বাঙলায় রূপান্তরিত) যখন রাশিয়ায় গেলেন তখন সেখানকার সমাজ ব্যবস্থাব নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমাজবাদী বলিষ্ঠ আদর্শের রূপায়নে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।[৩] সংস্কাবেব ঐতিহ্যে লালিত ধনতান্ত্রিক দেশে স্বল্প-সংখ্যক মানুষ যে আতঙ্কে নিজেদেব স্বার্থ ও সম্পদকে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুবেরের মতো বক্ষা কবে, এখানে সেই আতঙ্ক থেকে মুক্তি ঘটেছে মানুষেব, জাতীয় স্বার্থবক্ষায় সমস্ত মানুষের মুখে এই বিশ্বাসেব ছবি দেখে ঔপনিষদিক মা গৃধঃ এই বাণীকে মিলিয়ে নিলেন কবি মনে মনে। দেশে ফিবেই দেখেন কঠিন সময়। হিজলীর ক্যাম্পে প্রহবীর হাতে নিহত হয়েছে দুই নিবীহ তরুণ। আগেই বকসা বন্দীদেব অভিনন্দন জানিয়ে কবিতা পাঠিয়েছেন তিনি। এবাব প্রকাশ্য সভায় তাব প্রতিবাদ করলেন। এই ভাবে পাবিপার্শ্বিক তাডনায় বাস্তব সংসারে ফিবে এলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁব প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বেব স্বরূপ-সন্ধান নতুন চোখে শুরু করলেন তিনি। পুনশ্চ, পত্রপুট, শেষ সপ্তক, শ্যামলী—এই চাবটি কাব্যগ্রন্থে তাঁবই ভাষায় 'নিত্যকালেব শাশ্বতিকের সঙ্গে চলতিকালেব চাঞ্চল্য'কে মিশিয়ে দিলেন তিনি। গদ্যের দৈনন্দিন বাস্তব রুক্ষতাব বিচিত্র ধ্বনি মেশালেন ছন্দের নূপুর নিক্কণে ও ও চাকচিক্যে। গদ্যও যে কাব্যবস ফোটায় তাঁব সমর্থনে টেনে আনলেন, উপনিষদ, কাদম্ববী, প্রাকৃত সাহিত্য, প্রাচীন চীনে-জাপানী কবিতা ও ওয়াল্ট হুইটম্যানেব কবিতা।[৪] মনে রাখতে হবে, ১৯৩০-৩২-এ বাঙলা কাব্যে এই গদ্যকাব্য নতুন নয়। কল্লোলের কবিরা, বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, এই গদ্যকাব্যকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংযোগ ঘটাবার মাধ্যম হিসেবেই নিয়ে

এসেছেন। যাই হোক, 'পুনশ্চে'র মধ্যেই দার্শনিক সমানুভূতিতে কবি মহৎ ও ক্ষুদ্রকে একাসনে বসালেন, উদ্ধত সম্রাজ্ঞী পদ্মার বদলে এলো ছোট্ট গ্রামের নদী কোপাই—চারধারে জীবনযাত্রার কলগুঞ্জনের সঙ্গে যার সুর মিলিয়ে বাঁধা, এলো বিদেশী মানুষ—শুধু মানুষ বলেই যার পরিচয়, এলো ছোট্ট শিশুর প্রিয় পোকা-মাকড়ের প্রাণীজগৎ আর রাস্তার কুকুর, এলো এঁদো গলিব বাদশাহী মেজাজের কেরাণী, তুচ্ছ প্রাণীব মূকবেদনা ও বিস্ময়ভবা প্রাণ, তুচ্ছ মানুষের প্রাণ ভরা জীবনী-শক্তি ও ব্যর্থতার জ্বালা। আবার পাশাপাশি রইলো আকাশ ভরা সূর্যতারার অসীমকাল-দ্যোতনা। এক চোখে তিনি হলেন দৈনন্দিন তুচ্ছেব শিল্পী, অন্য চোখে রইলেন অনন্তকালের দার্শনিক সাক্ষী—অনন্তের পথিক মানুষেব চিরসঙ্গী। নইলে টি. এস. এলিয়টের বিদ্রূপ-বাণবিদ্ধ অবিশ্বাসী বিষণ্ণ আংশিক সত্তাটিকে ছেড়ে তাঁর বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশ 'জার্নি অব দি ম্যাজ'রই কবিতার সরল-স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কবে নিজের কাব্য সংকলনে স্থান দেবেন কেন? 'শেষ সপ্তক' শুধু চলতি বাস্তবকে ধবাব কাব্য নয়, ওই গদ্য ভাষাতেই অতীত বর্তমান ও চিরকালকে ধরার চেষ্টা। বোধহয়, সহানুভূতিতে তিনি এখানে জীবনেব অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবকিছুকেই স্নিগ্ধ ক্ষমাসুন্দর ভঙ্গিতে মূল্য দিতে প্রস্তুত। এই মূল্যদানের প্রস্তুতি 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'তেও সমান সক্রিয়। নিজের সত্তাকে গভীব করুণায় মাটিব সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত, যে মাটিব স্বভাব চিবনবীন। এই মাটির টানে 'শ্যামলী'তে ঘর বাঁধাব চেষ্টা। শ্রমিক-কৃষক-ভিত্তিক সমাজবাদী সভ্যতা তাঁকে সর্বহারাদের মাঝে টেনেছে, আর সেই টানে তিনি পৌঁছেছিলেন জীবনের আদি উৎসে: 'দি পিওর স্পিরিট স্যাল ফ্লো / ব্যাক টু দি বার্নিং ফাউণ্টেন হোয়েন্স ইট কেম'। এই সর্বহারাদের প্রতি অসীম করুণা আহত হলো মুসোলিনীর ইথিয়োপিয়া আক্রমণে, সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত আফ্রিকার কালো মানুষদেব প্রতি বর্বর সভ্যতার আক্রমণের নিন্দা কবলেন তিনি 'আফ্রিকা' কবিতায়। স্পন্দমান গদ্যে লেখা এই সময়কার কবিতাগুলি অনেকটা ফরাসী ভাস্ লিব্র্-এর মতো। প্রচলিত ছন্দরীতির কোনো দূর স্মৃতিও নেই এই শেষ সপ্তক-পুত্রপুট-শ্যামলীর মধ্যে। ইতিমধ্যে পঁচাত্তর বছরের কবি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন, রুগ্ণ অস্পষ্ট চেতনায় যেন মৃত্যুকে দেখলেন। যুদ্ধ বাধলো। চীনের ওপর জাপানের আক্রমণে ক্ষুব্ধ কবি মনে করিয়ে দিলেন, বুদ্ধের কাছে কালী-ভক্ত

শক্তি উপাসকদের মতো জাপানীরা আশীর্বাদ চাইছে হত্যার লীলায় মাতবে বলে। ভক্তের এই স্বরূপ বুঝে ফেলে কবি বলছেন, মানব ইতিহাসের নায়ককে এই ভাবে বারবার ভক্তরূপী হত্যাকারীর শিকার হতে হয়েছে। খৃষ্টের জন্মদিনে (১৯৩১) তাই কবি বলছেন, মানব পুত্রের সেই হত্যাকারীরাই ভক্ত সেজে এ যুগের বিবেকবান মানবপুত্রকে হত্যা করতে এসেছে ; ভক্তদের পূজার অর্ঘ আসলে বিষের পাত্র। এ যুগের বিবেককে নষ্ট হতে দেখে খৃষ্টের জীবনেরই পুনরাবৃত্তি দেখছেন তিনি: 'মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কাঁদেন, হে ঈশ্বর !' হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের কিছু পরেই এই গান খৃষ্টোৎসব উপলক্ষে লেখা। এই চরম আত্মনাশে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে ধাক্কা লেগেছে। তবু টলেননি তিনি। শুধু বলেছেন, 'এ প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বের করেছ চিহ্নিত।' এই চিহ্নিত মহত্ত্ব নিয়েই শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর রূপ দেখলেন। বিজ্ঞান-প্রমাণিত পদার্থের আদিরূপ যে এনার্জি তাকেই জ্যোতি বা চৈতন্য বলে কবি উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর অর্থ সেই মূল এনার্জিতে ফিবে যাওয়া, যার থেকে নতুন চৈতন্যরূপ প্রকাশ পাবে। প্রকৃতিব মধ্যে বিজ্ঞান-প্রমাণিত এই জ্যোতির সঙ্গে কবি উপনিষদেব হিবণ্ময় পাত্র ঢাকা শুভ্র সত্যকে মিলিয়ে দিয়ে বললেন: 'অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার।'

মহাযুদ্ধেব বিভীষিকায় ত্রস্ত হয়েও রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অসীম ধৈর্যে জ্যোতিঃসমুদ্রে পাড়ি দিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাথমিক ধাক্কায় অবিশ্বাসের কঠিন জমিতে যাঁদেব সৃষ্টির প্রথম ফুল ফুটলো, তাঁদের সকলেব বক্ষে বিশ্বাসের বীজ দৃঢ়মূল হয় নি। প্রথম চৌধুরী অমিয় চক্রবর্তীকে জানিয়েছিলেন: 'সনেট লেখার অন্য কারণও ছিল—রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো-নকল পড়ে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম।' এই খেলো নকল বলতে যাঁদের কবিতা তিনি বোঝাতেন তাঁরা নিশ্চয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় ও তাঁদের অনুসারী কবিগোষ্ঠী। অবশ্য খেলো নকল বললে এই কবিদের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না, কিন্তু এঁদের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ দৃঢ়মূল ছিল। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ-ব্যাপ্ত রোম্যান্টিকতার এক-একটা দিক এঁদের কাব্যে প্রকাশিত, কিন্তু স্বাধীনভাবে আন্তর্জাতিক কোনো ধারা-চেতনাকে এই সব কবিরা বিষয়ে ও রীতিতে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের মধ্যে রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ নতুন ভাবনা ও রীতির প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ সমকালের যুগ-চেতনাকে প্রকাশ করেছে ঠিকই, সেই সূত্রে এও ঠিক যে তাঁর কবিতা রবীন্দ্র-বিরোধিতাও করেছে একটা বিশেষ পর্ব পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর কবিতায় আধুনিক মানুষের বিপন্নতার ছবি নেই, দেশ-বিদেশের বিচিত্র সমাজ-রাজনীতির ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চেহারাও তেমন স্পষ্ট নয়। ব্যতিক্রম হয়তো 'দেশোদ্ধার'-জাতীয় কবিতা। তবু দার্শনিক ভাবে তিনি জীবন-বিধাতার উদাসীন নিষ্ঠুর বন্ধুত্বের স্বরূপ দেখে মৌখিক রীতিতে যে চাপা বিদ্রূপ করেছিলেন, তাতেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মরুধূসর কাব্য-মানসিকতার সগোত্র হয়ে কল্লোল কালি-কলম প্রগতি-বিজলীর কবিদের কাছে বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী হয়ে পড়েন। মানুষের ধর্ম ও মানুষেব প্রেম দুই-ই ক্ষণধর্মী, স্থায়িত্বহীন এবং মূঢ় মানুষের অসহায় অক্ষমতাব আবরণ, এ কথা তো পাকে-চক্রে বিষণ্ণ জীবনানন্দ, পাপ-সচেতন প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা প্রত্যয় সন্ধানে ব্যর্থ সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-চিন্তারই বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত! তবু এই যতীন্দ্রনাথ শেষে রবীন্দ্র-পন্থায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁর কাব্যসৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ না করলেও অনেকখানি বিশিষ্টতা হারিয়েছিলেন। পুরোপুরি হারান নি, কারণ রবীন্দ্র-স্বীকৃতির মধ্যে এক ধরনেব কারুণ্য, আক্ষেপ ও ক্লান্তি মিশেছিল। মোহিতলালের দুঃখবাদে দেশী নাস্তিক ও ভোগবাদী দর্শন যেমন আছে, তেমনি আছে সোপেনহাওয়ারের মতো দুঃখবন্দীর প্রবর্তনা, আছে প্রি-র‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর ক্লাসিক্যাল কাব্য চেতনা ও রোম্যান্টিকতা। তাঁর তীব্র দেহবাদই দুঃখবাদের বলিষ্ঠতা এনেছিল, কিন্তু প্রাচীন রীতি-সংযম তাঁর কাব্যকে বৈচিত্র্যহীন করে তুলেছে। দার্শনিক প্রত্যয়ে যতখানি তিনি বলিষ্ঠ, আধুনিক সমাজ-চেতনার বিপন্নতার ছবি তার মধ্যে ততখানি নেই। নজরুলের ফারসী-জ্ঞান হাফেজের অনুসরণে কিছুটা চটুল ভঙ্গিতে মিলন-বিরহের তীব্র মৌতাত নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এমন এক উদ্দাম ঝঙ্কার নিয়ে এলেন কাব্যের মধ্যে, যা অরসিকের মনেও দমকা হাওয়ার মতো ঝাপটা দেয়। মেসোপটেমিয়া থেকে নজরুল নবজাগ্রত মুসলিম রাষ্ট্র তুর্কীর উত্থম কিছুটা দেখেছেন। তাঁর উদ্দাম প্রাণশক্তিতে এই উত্থম বিদ্রোহ-উল্লাসের সুর এনেছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ধ্বনিগম্ভীর উদ্দীপ্ত কবিতা ও গান তাঁকে সাহস জুগিয়েছিল।[৬] কিন্তু বিশের দশকের নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক

চেতনা ও সাম্যবাদই নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার ভিত্তি তৈরি করেছিল। আন্দোলন-ক্ষুব্ধ বিশের দশকে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নজরুলের কবিতাই মুখ্য স্থান নিয়েছিল। সাহিত্য চিরকালের না হয়েও সমকালের দায়িত্ব যে কী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে—নজরুলের তীব্র গণচেতনা তাই প্রমাণ করেছে। এই দশকের অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং শিবরাম চক্রবর্তী এই মানবচেতনা এবং রোম্যান্টিকভাবকে বিশিষ্ট ভঙ্গিতে রূপ দিয়েছিলেন। প্রমথনাথ বিশী ইংরেজ রোম্যান্টিক ও ভিকটোরিয়ান কবিদের ভাবনা-ভঙ্গিকে দেশীয় ভাষাভঙ্গিতে দক্ষতার সঙ্গে আত্মসাৎ করেছিলেন ('ভাঙা পেয়ালা', উত্তবমেঘ দ্রষ্টব্য)। অন্নদাশঙ্কর রোম্যান্টিক কবিতার মনোভঙ্গি প্রকাশে ও লিমেরিকেব ভঙ্গিতে তেমনি দক্ষতা এনেছিলেন। শিবরাম তাঁব সতীর্থ কল্লোলীযদেব মতোই তাঁব একই সঙ্গে প্রকাশিত দুটি কবিতার বই 'মানুষ' ও 'চুম্বনে' (১৯২৯) একদিকে দবিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশে, অন্যদিকে জৈববৃত্তিব উল্লাসে বলিষ্ঠ স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিলেন। দুটি প্রবণতাই বিদেশী চিন্তা-জগৎ থেকে এসে সদ্যজাগ্রত সমধর্মী পরিবেশে পরাধীনতার বেদনা ও যুদ্ধোত্তর হতাশ আত্মবতিব আবহাওয়ায় আমাদের আকর্ষণ করেছিল। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়েব 'সর্বহারাদের গান' নজরুলের আবির্ভাবের ঠিক পরে পবেই অনুকূল পরিবেশে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও হুইটম্যানের গণতান্ত্রিকভাব অবলম্বন কবেছিল।

কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতি গোষ্ঠীর মধ্যে 'আধুনিক ত্রয়ী' বলে যাঁবা বিখ্যাত তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অন্যতম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যেও ওই গণতান্ত্রিক চেতনা, সাম্যবাদ, শ্রমিক সভ্যতার জয়গান লক্ষ্য করি। নজরুলের মতোই তাঁর দারিদ্র্যকে বড়াই করার ভঙ্গি এবং তার সঙ্গে তারুণ্যের আবেগে জীবনে সর্বত্রগ্রামী ও সর্বভোগী হবার আকাঙ্ক্ষা। তাছাড়া মানব-সমাজের দীনতা-বেদনার পাঁকটুকু যে আমরা আদি-পুরুষ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ থেকে বয়ে আনছি—জেনেটিক্‌স্‌-ঘেঁষা এই রোম্যান্টিকতত্ত্বটিও তাঁর কাব্যকে একটু নতুন মাত্রা দিয়েছে: 'লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ/বহি মোরা চিরদিন/আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু ভাই/আদিপঙ্কের ঋণ'॥ 'প্রথমা' থেকে 'ফেরারী ফৌজ' পর্যন্ত তিনটি কাব্যে প্রেমেন্দ্র হুইটম্যানীয় ভঙ্গিতে এই বলিষ্ঠ মানবিকতা, রোম্যান্টিক স্বপ্ন এবং পাপের বেদনা বুকে নিয়ে এই বিপন্ন হতাশার যুগে, এই নতুন প্রতীকী ও চিত্রময় কাব্যের

যুগেও বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে ('পাঁওদল') তিনি গদ্যের অন্বয় এনেছেন ঠিকই, তবে মৌখিক বাক্‌স্পন্দকে আনতে পারেন নি। কিছু পরে গদ্য কবিতার চর্চায় রবীন্দ্রনাথের চেষ্টাতেও এই ত্রুটি থেকে গিয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসু কাব্যকর্মে খুবই নিষ্ঠাবান এবং মনোযোগী। সাধারণ ভাবে রবীন্দ্র-ভাবিত হলেও এবং রাবীন্দ্রিক ভাষাশিল্পকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করলেও স্বতন্ত্রভাবে ইংরেজ রোমান্টিকদের যন্ত্রণা আর এ্যাগনির প্রকাশ তাঁর কাব্যে প্রথম থেকেই আছে। শেলীব আত্মরতি, কীট্‌সীয় ইন্দ্রিয়চেতনা ও উজ্জ্বল লাবণ্যময় ভাষা-শিল্প, প্রিব্যাফেলাইট ধ্বনিচেতনা, ইয়েট্‌সীয় স্বপ্নালুতা, ডি এইচ লরেন্সের ইন্দ্রিয়-সাধনা ইত্যাদি ইংরিজি ও ইয়োবোপীয় কাব্য-বৈশিষ্ট্যেব নানা স্তরেব মিশ্রণ মর্মবাণী, বন্দীব বন্দনা (১৯৩০) থেকে শুরু করে দ্রৌপদীব শাড়ী (১৯৪৮) পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ইংরিজি কাব্যের সমকালীন কথ্য আত্মগত ভঙ্গিব আদলে 'দময়ন্তী'র আমল থেকে বুদ্ধদেব কথ্যবীতি আনতে চেযেছিলেন। পবে শব্দেব সাধু ও চলিত সবরকমের বিশিষ্ট অনুষঙ্গের কথা ভেবে বোধহয় বিশেষ কোনো গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রেম, কাম, শ্রান্তি, তিক্ততাব জ্বালা ইত্যাদির প্রকাশ সূত্রে হপকিন্‌সের মতো বুদ্ধদেব এক নিজস্ব অন্তর্লীন ভাষা-ভঙ্গিমা তৈরি কবে সমকালে খুবই প্রভাবশালী হযেছিলেন। এবং পঞ্চাশের দশক থেকেই কন্টিনেন্টাল কবিদের মধ্যে বিশেষ করে বোদল্যের, বিল্‌কে হ্যেল্ডার্লিন ইত্যাদির চর্চায় এবং বিদেশী পুরাণের উল্লেখ এবং আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের ব্যবহাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে গভীব ও প্রসাবিত কবতে পেরেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের সতীর্থ এবং সহযোগী অজিত দত্ত অনেকখানি মনে-মেজাজে ট্র্যাডিশানাল—যদিও তাঁর নায়িকা কল্পনায় (মালতী) আধুনিক ভোগবাদী অশান্ত কামনা প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য পর্বের একটু পবে প্রকাশিত তাঁর 'ছায়ার আল্পনা'-তেও (১৯৫১) মুহূর্ত-বসের প্রতি আকাঙ্ক্ষাতেও সেই অশান্তি প্রমাণিত। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বুদ্ধদেবের মতো প্রেমকে মূল লক্ষ্য করলেও আত্মরতির স্তর থেকে উঠে জীবনমুখী নানা আকর্ষণে বলিষ্ঠ স্বরভঙ্গি এনেছিলেন। কিন্তু কাব্যরীতিতে কোনো বিদেশী রীতি পদ্ধতি আত্মসাৎ করে তেমন বৈচিত্র্যময় কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখাতে পারেন নি। কিন্তু 'কল্লোলের মশালচি' মনীশ ঘটক তাঁর অল্প সংখ্যক কবিতায়, শিলালিপি (১৯৩৯), যদিও সন্ধ্যা-তে,

কল্লোল-কালীন জৈবকামনার জ্বালাকে তীব্রতার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নাগরিক জীবনের সমস্ত জ্বালা, হতাশা ও অন্ধকারকে কিছুটা এলিয়টীয় ভঙ্গিতে ক্ষণপুলক সঙ্গীতের রূপকল্পে প্রকাশ করেছেন। এলিয়টের দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড (১৯২২) যে ঐতিহাসিক অনুভূতি ও স্মৃতি, প্রাচীন ও আধুনিকের প্রতি সমকালীন দৃষ্টি, নতুন ইমোশনের সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার নতুন তত্ত্ব নিয়ে এলো, সুধীন্দ্রনাথ অনেকটা সেই নৈর্ব্যক্তিকতার পথেই রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কাব্যের বিচার করলেন এবং কঠিন ক্লাসিক গঠনে এবং শব্দ গাম্ভীর্যে স্বকীয় লিবিক-বেদনাকে প্রকাশ করলেন। মালার্মের শিষ্য বলে ঘোষণা করে সুধীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন, গুরুর প্রতি তিনি আকৃষ্ট শুধু গুরুর আভিজাত্যবোধ, উন্নাসিকতা, নেতিময় বিষণ্ন জীবনদর্শনের জন্যে, সংহত ব্যঞ্জনাময় প্রকাশের জন্যে। কিন্তু মালার্মের বিশুদ্ধ কবিতায় তিনি বিশ্বাসী নন, যুক্তি ও বুদ্ধিকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মালার্মে শাশ্বতে বিশ্বাসী, সুধীন্দ্রনাথ ক্ষণবাদী। মালার্মের মিস্টিক অনুভূতিও সুধীন্দ্রনাথে নেই। তিনি নিজেই বলেছেন যে, বৌদ্ধদের মতো তিনি বৈনাশিক বলেই কর্মে আস্থাবান এবং তাঁর বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার: 'অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক/অনুত্তীর্থ নাস্তির কিনারা/বৈকল্যের ষড়যন্ত্রের তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা/ও মগ্ন চুম্বক/অথচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক/তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে/পাবে সে নিজের দেখা, তারপরে মিলে আদিভূতে/হবে স্বাভাবিক।' ['নৌকাডুবি', সংবর্ত]। এ-যেন অনেকটা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের মতোই বিশ্বাসের শেকড় খুঁজে হয়রান হয়ে নিজের ওপরে সার্ত্রে-র মতোই টোটাল্ রেসপনসিবিলিটি ইন্ টোটাল্ সলিচ্যুড-এর ভার নিয়ে এলিয়টের শেষ শান্তি ও স্বস্তির বচন থেকে সরে দাঁড়ানো। তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তরফাল্গুনী, সংবর্ত পর্যন্ত এই নিঃসঙ্গ আত্মার তীব্র হাহাকারেরই ইতিহাস। লরেন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট, ইয়েট্স্ ও হপ্‌কিনস্ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ('স্বগত') প্রমাণ করে, কী গভীর নিষ্ঠায় আধুনিক বিদেশী কাব্যকলাকে বোধ ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝে এই কালজ্ঞানী কবি শেষ জীবনে খুব ক্ষীণভাবে বহির্জগতের আতিথ্যে মুগ্ধ হচ্ছিলেন।[৭] কিন্তু এই বোধ তাঁর কাব্যে বিকশিত হয় নি।

এ যুগের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি জীবনানন্দ দাশ যে 'ডিসগাস্ট অবসেশান'

নিয়ে তাঁর কাব্য শুরু করেন 'ঝরপালকে', তাতে ইমেজিস্ট কবিদের নিঃসংশয় প্রভাব ছিল, কেবল সংযমটুকু ছিল না। কিন্তু চরম বিষণ্ণতার মুডকে অত্যন্ত মৌলিক কতকগুলি চিত্রকল্পে (হেমন্তের হিম ঘাস, প্রেতচাঁদ, বুনো হাঁস, নষ্ট নীড়, মরা নদী, শীতের কুয়াশা) যে সরল প্রবহমান প্রত্যক্ষতায় তিনি ফুটিয়ে তুলছিলেন তাতেই ইমেজিস্ট বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছিল। পাউণ্ড ও এলিয়টের ভঙ্গিতে কতকগুলি বিভিন্ন ভাবরূপকে পর্যায়বদ্ধ করে সিম্ফনির মতো এক অখণ্ডরস সৃষ্টি তিনি করতে পেরেছিলেন তাঁর শিথিল দীর্ঘ-পর্বের কবিতায়। এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যঞ্জনার শব্দকে আর এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করে কবি নিগূঢ় অনুভবকে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন ('পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ', 'বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ', 'নরম জলের গন্ধ', 'ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা', 'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা')। বিশেষতঃ ধূসরতার রঙেই অচরিতার্থতা ও বিপন্নতার বিস্ময়কর ক্লান্তিকে সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তিনি। জীবনানন্দের ধূসর স্মৃতি ও ম্লান বিদ্রূপ তাঁর স্বপ্নচারী বিশেষ ধরনের প্রকৃতি ও জীবজন্তুর জগৎ বিশেষভাবে ইয়েটসের জগতের প্রতিরূপ না হলেও অনুরূপ। এ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে, কাজেই বিশ্লেষণের অপেক্ষা না রেখে শুধু এইটুকু বলা চলে যে, এই সাদৃশ্যের মূলে রয়েছে উভয় কবির স্বভাব ও অভিজ্ঞতাজাত মিল—বিশেষতঃ সমকালীন নষ্ট সভ্যতার অভিজ্ঞতা। তাই স্বপ্নের বিহ্বল জগতের মতো জীবনানন্দের ও ইয়েটসের কাব্যলোকে মুখোশপরা ভাঁড় আর ক্লাউনের মেলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বে মানুষে[৮] বিশ্বাসী, তাই কোটি শূকরের আর্তনাদ ছাড়িয়ে বেজে উঠেছে জীবনের শতজল-ঝর্ণার উৎসধারার শব্দ। অন্যদিকে ইয়েটস বার্ধক্যের বিকারে দুঃস্বপ্নের মতো জীবনকে দেখেছেন। দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি চেয়েছেন: Cast a cold eye/on Life and death,/Horsemen, par by'।

অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের লিরিকের হালকা লাবণ্যটুকু গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার প্রসারে তিনি হয়ে উঠলেন কসমোপলিটান। ইমেজিস্টেদের মতো কবিতার অন্তঃসংহতিতে তিনি বিশ্বাসী, ছন্দমুক্তির জন্য হপ্‌কিনসের Sprung Rhythm-কেও অক্লেশে নিয়েছেন, এলিয়টের ভক্ত হয়েও এলিয়টের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি তাঁর ঝোঁক বেশি, তবে বিশেষ কোনো ধর্ম নয়, মানবতায় বিশ্বাস নিরাসক্ত সৃষ্টিতে জীবনের ভালোবাসা কুড়োবার চেষ্টা, কসমোপলিটান হবার জন্যেই হঠাৎ কোনো ছেড়ে-আসা

স্মৃতির অনুভব, বিচ্ছেদের হাওয়া—তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বিদেশে গিয়েও বিদেশের পটভূমি প্রায়ই ব্যবহারই করেন না, অমিয় চক্রবর্তী তেমনি বিদেশের প্রাকৃতিক পট, মানুষের সাজ-পোষাকের এক ঝলক ইঙ্গিতও জুড়ে দেন। ইংরিজি বা অ্যামেরিকান কবিতার সমাসবদ্ধতা তিনি বাঙলা কবিতায় ভাষার ধাত মেনেই করেছেন: 'ভরা সকাল/ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, ঝিঁ ঝিঁ সন্ধ্যে, ঘুঁটে পোড়ানো।' কিংবা অর্ধসমাপ্ত বা বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যবহারেও ইমেজিস্ট সংহতি: 'দামী রাজ্যে স্বনির্বাসী গরিব বাঙালি/ছেঁড়া চটি পরে চলে যাই।'

বিষ্ণু দে প্রথমে কিছু ভঙ্গি নিয়ে কবিতার আসরে নেমেছিলেন, আবেগ ও অনুভবের চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধির পথেই বেশি এগিয়েছিলেন। তাই দেশীবিদেশী ঐতিহ্যের ব্যবহারে ও তুলনায় তিনি কিছুটা বাড়াবাড়িই করেছিলেন। এই অবস্থাটা প্রভাব নয়, অনুকরণ। এলিয়েটের স্পষ্ট অনুকরণ 'ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকিছে ববাভয় / আশ্লেষে তব অন্তবিহীন ক্রতো-ক্তমের শেষ।' উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩২) এই পুরাণ-মিশ্রণেরই প্রমাণ। এছাড়া পূর্বলেখ, সন্দীপের চর, অন্বিষ্ট (১৯৫০) কবিতার বইতে কবি চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তরকালে এলিয়েটের মতোই বিদ্রূপময় তিনি, এবং মার্কসবাদে বিশ্বাসী। এরপরে তিনি এলিয়েটের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন সমাজবাদী দৃষ্টিতে, 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার'-এ: 'পোড়ো জমি চষে শেষে স্বত্ব জমে লাট—কি বেলাট, / সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ? / পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিঅট / ওয়েস্টল্যাণ্ডে হর্ষে যেন আপন স্বদেশ?' আলোচ্য পর্বের এই বিদ্রূপপ্রবণতা কমে গিয়ে গণমুখী হবার চেষ্টাই দেখা গেছে।

এই বিদ্রূপ-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত তরুণ কবি সমর সেনের মধ্যেও দেখি। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবি এই বিত্তধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঝাঁঝালো বিদ্রূপবর্ষণ করেছেন। ছন্দ মিল এড়াবার চেষ্টাতেও তার প্রমাণ। কিন্তু মুক্তি চেয়েছেন রোমান্টিকদের মতো। বিষ্ণু দের মতো রবীন্দ্রনাথের মূল্যবোধে বিশ্বাসী পংক্তিগুলিকে তিনিও তিক্ততার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, 'এখানে সন্ধ্যা নামলো শীতের শকুনের মতো।' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার রূপটিও চমৎকার উদ্ঘাটিত (সাফাই)। ঠিক যুদ্ধের সময়েই বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবির্ভাব। সমাজবাদী দৃষ্টিতে ধনতান্ত্রিক

সভ্যতার তীব্র সমালোচনা ও শোষিত মানুষের অন্তহীন সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রকাশে সুকান্ত দারুণ প্রভাবশালী। নাজিম হিকমতকে চমৎকার ভাবে অনুবাদ করে সুভাষ এই শোষণ ও সংগ্রামকে ফুটিয়েছেন। 'মধুবংশীর গলি'র লেখক জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র দীর্ঘকবিতায় কম্যুনিজ্‌মের সফল কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য[৯] অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, দিনেশ দাস যেমন কিছুটা সমাজবাদী চিন্তার প্রতি ঝুঁকেছিলেন হুইটম্যান, এলিয়ট, মায়াকভ্‌স্কি, ও পাবলো নেরুদার প্রেরণায়; তেমনি হরপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, রাম বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী[১০] ও অরুণ ভট্টাচার্য[১১] বোদল্যের, ইয়েটস, এলিয়ট, প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত কবি উইলফ্রেড ওয়েন, [যিনি তাঁর স্ট্রেঞ্জ মিটিং কবিতায় যুদ্ধকালীন অবসেশন-কে দারুণ দক্ষতায় কাব্যরূপ দিয়েছিলেন] অডেন, ডেলুই, স্পেণ্ডার, লুইস ম্যাকনিস ও ডিলান টমাস,—কন্টিনেণ্টাল কবিদের মধ্যে র‍্যাঁবো বিল্‌কে ইত্যাদি কবিদের নিজস্ব জগৎ এবং লিখিত আবেগ প্রকাশের নানা উপকরণ বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে মোটামুটি পরিবেশ ও মনোভঙ্গি বুঝে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। লিরিকের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যে পুরোনো ইংরেজ রোম্যাণ্টিক কবিরা তখনও সক্রিয়, এবং পরেকার ব্রাউনিঙ ও অ্যামেরিকান কবি হুইটম্যান চল্লিশ দশকের কবিদের কাছেও মূল্য হারান নি। তিরিশের দশকে নির্বিচার অনুকরণজনিত দুর্বোধ্যতা যে অনেকাংশে কমেছিল চল্লিশের দশকে এবং তারও পরে, তার জন্যে মার্কসিস্ট চিন্তাধারা অনেকটাই দায়ী, কারণ সৎ অভিজ্ঞতাকে সরল প্রত্যক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করা সমাজবাদীর দায়িত্ব—কবিতার সূক্ষ্ম-স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে এ দায়িত্ব তাঁদের কাছে কিছু কম নয়।

১। চরকা নিয়ে রবীন্দ্র-গান্ধী-বিতর্ক স্মরণীয়। এ-প্রসঙ্গে 'Tagore and Gandhi Argue' বইটি দ্রষ্টব্য।

২। 'It was painful to watch a struggle in which he could not actively participate'. : *Rabindranath Tagore—A Biography* [1962] : K. Kripalani. page 344.

৩। রাশিয়ার চিঠি।

৪। দ্রষ্টব্য 'গন্ত কবিতা প্রবন্ধ' [১৯৩২] ছন্দ। কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ে পঠিত।

৫। পুনশ্চ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬। দুরন্ত আশা (মানসী), বিজয়া (পূরবী)। তাছাড়া অগ্নিবীণা বাজাও গানটি।

৭। স্বগত (নতুন সংস্করণ) পুনশ্চ-প্রবন্ধ।

৮। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।'

৯। সাগর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৫)।

১০। 'নগর-সন্ধা' (১৯৪৬), 'কারার প্রার্থনা' (১৯৫০)। 'নগর-সন্ধা' বইটি তিনটি অংশে সম্পূর্ণ : ময়ূর-পংখি আকাশ, নগর-সন্ধা, নবজন্ম।

১১। ময়ূরাক্ষী (১৯৪৪)

পনের

উপসংহার

রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-সমকালীন ও পরবর্তী কবিগোষ্ঠী পর্যন্ত প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের উপর পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবের যে আলোচনা করা হলো, তাকে সংক্ষিপ্ত করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

১

ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ যখন ইংরিজি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম তখন তার শক্তি ও গুণ সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ রইল না। প্রথম প্রথম আমরা ইংরেজ বনতে আরম্ভ করেছিলাম। ইংরেজী সংস্কৃতির সমস্ত কিছুকে আয়ত্ত করে দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ভাব দেখিয়েছিলাম। উচ্চতর সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর এ অবস্থা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ভাবও যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি আবার বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি অবহেলার ভাবও কিছুটা এসেছিল। ক্রমশঃ শক্তিমান কবির আবির্ভাবে এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির টানাপোড়েন কমে এসেছিল এবং তার ফলেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব একটা সদর্থক শক্তি হিসাবে বাঙলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

কিন্তু প্রথমেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি যে অবহেলা দেখা গিয়েছিল তার ফলেই আমাদের দেশপ্রেম-ভাবনার সূচনা। এই ভাবনার প্রতিনিধি হয়ে এলেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু দেশপ্রেম ব্যাপারটির যে একটি সদর্থক দিক আছে, সব কিছুরই—সে স্বদেশেরই হোক বা বিদেশেরই হোক—ভালোটুকু নিয়েই দেশের মাটিতে সোনা ফলাতে হয় এবং তাতেই যে দেশপ্রেমের সত্যকার রূপ ফুটে ওঠে সে বোধ এলো রঙ্গলালের মধ্যে। রোম্যান্টিক কবিদের দেশপ্রেম-প্রকাশের কাব্যভাষাকে তিনি অনুবাদ করলেন বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, তিনি শুধু বিদেশীর সাহিত্যের প্রতিই আসক্ত। তিনি বিদেশী সাহিত্যের রস-বৈচিত্র্য, প্রকাশ-ভঙ্গির

অভিনবত্ব ও উন্নত রুচিকে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করলেন। কারণ ওই তিনটি গুণেরই অভাব ছিল বাঙলা কাব্যে। পদ্মিনী কাব্য এবং ভেক-মূষিকের যুদ্ধ—এই দুটি কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল সমসাময়িক বাঙলা কাব্যের অবস্থার কিছুটা পরিচয় দিয়ে নিজের লক্ষ্যটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেম ছাড়া আর একটি যে নতুন বৈশিষ্ট্য এসেছিল বাংলা কাব্যে তা হলো মানবিক গুণের প্রকাশ—মানবিক শক্তির সম্ভাবনা, ব্যর্থতা, ও ঐশ্বর্য সব কিছুর প্রতিই একটা অসীম ও আন্তরিক দরদ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাঁরা কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন তাঁরা প্রথমার্ধেব তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। যে সব অধ্যাপকের কাছে তাঁরা পড়েছিলেন বা তাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই মানবিক গুণাবলীব চর্চায় উৎসাহ দিতেন, স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ দিতেন। বামায়ণ কাহিনীকে ঢেলে সাজিয়ে রাম-বাবণেব নতুন পরিচয় দান মাইকেলের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হতো, যদি না তিনি ডিবোজিওব শিক্ষাব আবহাওয়ায় মুক্ত চিন্তাব পরিবেশ পেতেন। প্রথম অধ্যাযেব পাদটীকায় ইয়ং-এব 'নাইট থট্‌স্' থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিযে দেখিয়েছি, মানুষের সম্ভাবনা সম্পর্কে বহস্যময় ইঙ্গিত এবং শ্রদ্ধা ও সুরুচি কীভাবে সে কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

যাই হোক, এই মানবিকতাব টানেই পৌবাণিক অলৌকিকতা ছেড়ে রঙ্গলাল ইতিহাস থেকে স্বদেশ-প্রেমেব পবিচায়ক বিষযবস্তু গ্রহণ করলেন। নিরপেক্ষভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ কবাব চেষ্টায তাঁব ব্যক্তি-চেতনা প্রকাশ পেল। এ ছাড়া বিচার্ডসনেব অনুসরণে বঙ্গলাল কাব্যকে সূক্ষ্ম রুচি এবং অ-লৌকিক অর্থাৎ 'কাব্যসত্য' নামক পৃথক সত্যের ['পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য] বাহন বলে ঘোষণা কবলেন। অবশ্যই তাঁর কাব্যেব মধ্যে সে যুগেব তুলনায় রুচিব সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যোপভোগেব আকর্ষণ বিশেষভাবেই নতুন ব্যাপার মনে হলো। ছন্দের ক্ষেত্রে কোনো বৈচিত্র্য প্রকাশ কবতে না পারলেও পয়ারের আট-ছযেব মাত্রা ভাগেব নির্দিষ্ট যতি তুলে দিয়ে ভাবমুক্তির চেষ্টা করলেন, বাক্‌ধর্মী দৃঢ়তা আনলেন. ললিত মিল প্রয়োগ বর্জন করলেন, মুক্তক রচনার আভাস দিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে স্তবক রচনার যে চেষ্টা দেখা গেল রঙ্গলাল তাকে আরও স্পষ্ট করলেন দ্বিপদী ও ত্রিপদী পংক্তির সমন্বয় সাধন করে।

২

কিন্তু মাইকেলের হাতে বাঙলা কাব্য যেন হঠাৎ যৌবনশক্তি পেলো। তার অপূর্ব শোভন রূপ দেখে মনেই হলো না বাঙলা কবিতার মুকুলিকা বালিকাবয়সীর যুগ কখনো ছিল। গ্রীকমানবিকতা, ক্লাসিক্যাল সংযম, রোম্যান্টিক সৌন্দর্য তৃষ্ণা, নবজাগ্রত নারীসম্ভ্রমবোধ ও সর্বোপরি দেশপ্রেম—সমস্ত কিছু মিলে বাঙলা কাব্য নবদেহ ধারণ করলো।

দেশী বিদেশী আদর্শের সুসমঞ্জস মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মাইকেল বাঙলা কাব্যচর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন এবং বিশ্ব-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তিনিই প্রথম বাঙলা কাব্যকে স্থাপন করলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পাঠের রুচি নিয়ে মধুসূদন বাঙলা কাব্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' যখন লিখলেন তখনও তিনি রোম্যান্টিক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তারপর লিখলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। এ কাব্য রচনার পূর্বেকার অবস্থার কথা ভাবলে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে first poem in the language' ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। হিরোইক এপিসিল্‌সের আদর্শে নাট্যকাব্য লিখলেন: 'বীরাঙ্গনা'। বৈষ্ণব দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে মানবিক পরিবেশে রাধার মনোবেদনা ব্যক্ত করলেন Ode-এর ছাঁচে। সনেটের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সাহিত্যিকদের বন্দনা গাহিলেন, প্রেমানুভূতিও প্রকাশ পেলো, এবং সর্বোপরি প্রকাশিত হলো 'মন কেমনের বেদনা'। জীবনব্যাপী সাধনার ব্যর্থতা ও অপূর্ণ আদর্শের হতাশা এই প্রচণ্ড আত্মচেতন কবি মানুষটির মধ্যে থেকে 'আত্মবিলোপে'র লিরিক উচ্ছ্বাস তুললো। বাঙলা কাব্যরীতিও মধুসূদনের হাতে নতুন রূপ নিল। প্রয়োজন মতো সংস্কৃত ও লৌকিক শব্দকে গ্রহণ করে, বিদেশী আদর্শে শব্দ তৈরি করে কাব্যকে নতুন রূপে মণ্ডিত করলেন। বাক্যরীতিতে ইংরিজিরই মতো দুরান্বয় ও বন্ধনী প্রয়োগে ভাষা প্রকাশের নতুন মাধ্যম নিলেন। ইটালীয় ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে আয়ত্ত করলেন মিল্টনের মাধ্যমে। দেশী অলঙ্কারকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করে তাসসোর কাব্যের মতো অনুপ্রাস, ধ্বন্যর্থ, যমক ও শব্দসজ্জার বিপর্যয় এনে মহাকাব্যের স্টাইলের একঘেয়েমি দূর করবার চেষ্টা করলেন। এছাড়া ভার্জিলের শব্দ চয়নের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং তাঁর শ্রম-সাধিত শব্দশিল্পকেও অনুসরণ করলেন মাইকেল। পদ্যছন্দ তার মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে গদ্যছন্দের মতো কথ্য ভাষার নিকটবর্তী না হলে বৃহৎ কাব্য-রচনার বাহন হতে পারে না। ইংরিজি ব্ল্যাঙ্ক

ভার্সকেই মাইকেল অনুসরণ করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দসৃষ্টির ক্ষেত্রে। বাঙলা কাব্য-ভাষা যেন জনগনের ভাষায় 'মাইটি লাইন'-এ চলতে শিখলো। এ ব্যাপারে মিল্‌টনকেই গুরু করেছিলেন মাইকেল। পেত্রার্কের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে মাইকেল সনেট লিখলেন, যদিও পেত্রার্কের আদর্শ আক্ষরিকভাবে বিশেষ পালন করলেন না। বিচিত্র রকমের পংক্তি-বিন্যাসে ও মিলের কৌশলে স্তবকের বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন। 'ব্রজাঙ্গনা'য় তার প্রমাণ মিলবে।

৩

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের প্রতিভা মাইকেলের সাহিত্যকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছিল। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ সংস্কারের উৎকণ্ঠা, দেশপ্রেম, নারীমুক্তি, নতুন মানব সমাজ গড়বার স্বপ্ন, হেমচন্দ্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'বৃত্রসংহারে' মহাকাব্যের বিষয়বস্তু থাকলেও চরিত্রগুলিকে মাইকেলের মতো নতুন মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। কিন্তু 'বৃত্রসংহারে' একটা নতুন ব্যাপার দেখা গেল—সে হলো বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাব্যরূপ দান।

লাপ্লাস-হার্বার্ট স্পেন্সারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাকে হেমচন্দ্র ব্রহ্মলোকের বর্ণনায় আশ্চর্যভাবে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। এছাড়া শেক্‌সপিয়ারের 'টেম্পেস্ট' এবং 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র অনুবাদ করেছিলেন হেমচন্দ্র। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র অনুসরণে লিখেছিলেন 'ছায়াময়ী'। 'দশমহাবিদ্যা'য় বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পৌরাণিক তত্ত্বের সম্মিলন ঘটালেন তিনি। এছাড়া রোম্যান্টিক সাহিত্য ও নীতি-পদ্ধতির প্রতি তাঁর যথেষ্ট নজর ছিল। সেই দেশপ্রেমের বান ডাকালেন অজস্র খণ্ডকবিতা লিখে। পৃথিবীর বিভিন্ন উদীয়মান সভ্যতাকে (বিশেষ করে ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি) তিনি পরাধীন ভারতের সামনে আদর্শ হিসাবে ধরলেন।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে অবশ্য মাইকেলের মতো সচেতন শিল্পী ছিলেন না তিনি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে হেমচন্দ্র নতুন কোন ঐশ্বর্য আনতে তো পারলেনই না, উপরন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আয়ত্ত করতে না পেরে মিলহীন যতিপ্রান্তিক পয়ার লিখলেন অমিত্রাক্ষরের নামে; স্তবক ও মিলের বৈচিত্র্য কিছু আনলেন রোম্যান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান কবিদের আদর্শে। কিন্তু ভাল মিল দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবে লিরিক ওডের অনুসরণে তিনি তিনটি

কবিতা লিখেছিলেন স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি ও ইপোডকে রক্ষা করে। আর একটি কবিতায় অর্ধ-কোরাস ও পূর্ণ কোরাস পর্যায়ে স্তবক সাজানোর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তিনি।

দেশপ্রেমই ছিল নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণার উৎস। তাঁর খণ্ডকবিতাগুলি তারই ফল। রোম্যান্টিক কবিদের লিরিক কল্পনা নবীনচন্দ্রের ধাতে মিলে গিয়েছিল বলেই বায়রনকে তিনি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অনুসরণ করলেন। শেক্‌স্‌পিয়ার, মিল্টন, স্কট ও বায়রন—প্রধানতঃ এঁদের কাব্যসাহিত্যের উত্তেজক অংশগুলি নবীনচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়েছিল। নারীর প্রতি সহানুভূতিবশেই ক্লিওপেট্রা-কে নববীরাঙ্গনারূপে সাজালেন তিনি। ইতিহাসচেতনায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে নবমূল্যায়নের প্রেরণায় তিনি লিখলেন 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস'। হেমচন্দ্র যে সাম্রাজ্য গঠনেব স্বপ্ন দেখেছিলেন, নবীনচন্দ্রের 'কৃষ্ণ' সেই স্বপ্ন-সাম্রাজ্যের national hero-রূপে দেখা দিলেন। অবতারবাদ ও মানবিকতা-বাদকে সমন্বিত কববার চেষ্টা কবলেন নবীনচন্দ্র। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যকে তিনি সেই চেষ্টাতেই নবরূপ দিলেন। শেক্‌সপিয়ারেব 'মিড্‌সামার নাইট'স্‌ ড্রিম' অনুবাদও করলেন।

কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব হলো এই, যতই অসংযম থাক—বাঙলা কাব্যে আবেগপ্রবণ রোম্যান্টিক মনের কাব্যভাষা তিনি তৈরি কবলেন। পববর্তী গীতিকবিদের পথ তিনি সুগম করে দিলেন। অবশ্য এর আগে 'সঙ্গীত শতকে' বিহারীলাল রোম্যান্টিক প্রকাশ রীতির ভাষাপথ খনন করে রেখেছিলেন। মাইকেলের ক্লাসিক ভাষার পরে রোম্যান্টিক কাব্যভাষার উপযোগী তারল্য আনলেন নবীনচন্দ্র। সপ্তম দশকে Metrical Romance-এর ভাষা সৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রের দান এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছন্দের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা আনলেন তিনি বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে কথোপকথনের ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে। প্রবহমান পয়ারে আটপৌরে সংলাপ ফোটালেন স্বচ্ছন্দে। কাব্য ও নাটকের মধ্যে মিলনসূত্র আরও দৃঢ় হলো।

৪.

ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের আত্মগত মনকে প্রথম বিহারীলালের মধ্যেই দেখতে পাওয়া গেল। মহাকাব্যের মোহে পড়ে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র তাঁদের কবিস্বভাবের বিরুদ্ধ পথ ধরেছিলেন। বিহারীলাল তাঁর প্রবণতা অনুযায়ী

নিজের পথটিকে নির্ভুলভাবে চিনে নিলেন। রোম্যান্টিকদের অচরিতার্থতার বেদনা, প্রকৃতিচেতনা, বিষাদিনী প্রেমিকার রূপ, প্রেম ও সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিক কারণ অনুসন্ধান, 'a sense of sublime of something far more deeply interfused'-এর বোধ—সমস্তই বিহারীলালে দেখা গেল। কিন্তু সব কিছুকেই ভারতীয় আদর্শে ধ্যানে ধারণ করেছেন তিনি—intellectual beauty-কে পরিণতি দিয়েছেন 'কান্তিরূপে সংস্থিত' দেবীতে।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে অনেক সময়েই রোম্যান্টিকদের speech rhythm-এর ব্যবহার বিহারীলালের কাব্যে দেখা যায়। রুদ্ধদলের ধ্বনিস্পন্দনের মাধুর্য বুঝতে না পারায় তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছিল যুক্তাক্ষরহীন নিস্তরঙ্গ কোমলতা। 'সাধের আসনে' মুক্তকের কিছু ব্যবহার দেখা যায়। স্তবকের ক্ষেত্রে মাইকেলের ঐশ্বর্য ও মিলের কৌশল না থাকলেও মিত্রাক্ষরের স্তবক রচনা করেছেন তিনি, চতুষ্পংক্তিক স্তবকে ইংরিজি কবিতার পরিচিত মিল কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ নারীচেতনার কবি হিসাবেই বাঙলা কাব্যে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছেন তাঁর 'মহিলা' কাব্য রচনার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ছেড়ে দিলে 'সবিতা সুদর্শন' ও 'ফুলরা'র কবি সুরেন্দ্রনাথকেই আমরা বাঙলা Metrical Romance-এর সূচনাকার বলে ধরে নিতে পারি। অনুবাদের মধ্যে পোপ ও গোল্ডস্মিথের অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম করতে হয়। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র এমনকি বিহারীলালেরও অসংযত কাব্যরীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুরেন্দ্রনাথের সংযত ধ্বনিস্পন্দিতভাষা ব্যবহার ও স্তবকসজ্জা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

বিহারীলালের ধারাতেই দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের কবিধাতু তৈরি হয়েছিল। নারীচেতনা এই দুই কবিরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাঙলা কাব্যে কীট্‌সের ইন্দ্রিয়-উল্লাসকে বৈষ্ণবদৃষ্টির মিশ্রণে গার্হস্থ্যজীবনের ঘরোয়া পরিবেশে প্রয়োগ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখালেন দেবেন্দ্রনাথ। কিছু বিদেশী কবিতার অনুবাদও তিনি করেছিলেন—কীট্‌স্, শেলি, মূর এবং পো'র কবিতার অনুবাদ।

পো'র কবিতা তিনিই প্রথম অনুবাদ করেন। বিদেশী রীতিতে প্যারেন্থিসিসের ব্যবহার, প্রবহমান পয়ার ও যতিপ্রান্তিক দ্বিপদী-ত্রিপদীতে কবিতা রচনা, বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির কিছু সনেট ও মিত্রাক্ষর পদবন্ধ রচনা—এই হলো দেবেন্দ্রনাথের কাব্যরীতির মোটামুটি বৈশিষ্ট্য।

কিছুটা রবীন্দ্র-প্রভাবে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক ভাষাব্যবহারও তাঁর মধ্যে দেখা গেল। স্তবক ও মিল প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন নি।

দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক অক্ষয়কুমার বড়াল নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এঁর কাব্যেরও প্রেরণা যে মূলতঃ নারী তা আগেই বলেছি। অক্ষয়কুমারের রোম্যান্টিক পিপাসা নিজস্ব ভঙ্গিতে এই নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। রোম্যান্টিক অতৃপ্তিকে অক্ষয়কুমার বিহারীলালের মতোই ভারতীয় আদর্শে নিষ্কাম উদার প্রেমে পরিণতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া টেনিসন-ব্রাউনিং-এর প্রভাব অক্ষয়কুমারের মত উনিশ শতকের আর কোনো কবির মধ্যে এত বেশি ছিল না। ভাষায় ইন্দ্রজাল সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকলেও অক্ষয়কুমারের রোম্যান্টিক ভাষা সংযত ও নিয়ম-নিষ্ঠ। দেবেন্দ্রনাথের মতোই অক্ষয়কুমার ছিলেন গার্হস্থ্যরসের কবি। রোম্যান্টিক কল্পনাকে এঁরা গার্হস্থ্যজীবনের মধ্য দিয়েই ব্যক্ত করেছিলেন। ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার বৈচিত্র্যহীন কিন্তু শব্দসম্পদে, ধ্বনিস্পন্দনে, স্তবক-রচনায় ও মিলের কৌশলে তিনি নিজস্ব দান রেখে গেছেন। সনেট রচনায় পেত্রার্কাকে কোথাও অনুসরণ করেছেন, কোথাও করেন নি, কোথাও-বা শেক্স্‌পিরীয় রীতি মেনেছেন।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্য রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত রোম্যান্টিক কবিদের ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল 'আর্যগাথা'য় বিশুদ্ধ প্রকৃতি-কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। যে বিশুদ্ধ প্রকৃতিচেতনা রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের কবি-কল্পনার আশ্রয়ী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তাকেই মুখ্য বিষয় করে 'আর্যগাথা'র প্রথম ভাগে কিছু কবিতা লিখেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। অন্যান্য কবিদের মতো দেশপ্রেম দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের একটা বড় প্রেরণা। স্কচ ও আইরিশ দেশপ্রেমের আদর্শও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে এবং এ দিক থেকে তিনি হেমচন্দ্রের উত্তরসূরি। রোম্যান্টিকদের মতো মানসী প্রিয়ার সন্ধান 'আর্যগাথা'র দ্বিতীয় ভাগের কিছু কবিতায় রয়েছে। এই ধরনের কোমল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক কবিতা রচনায় কীট্‌সই ছিল তাঁর আদর্শ। বিদেশী আদর্শে কিছু হাসির কবিতা লিখেছিলেন তিনি নতুন নতুন মিলের কৌশল দেখিয়ে। হাসির গানেও এই বিদেশী প্রভাব স্মরণীয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে দ্বিজেন্দ্রলালের রোম্যান্টিক চেতনা ক্ষীণ হয়ে গেছে যুক্তিবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানচিন্তার আঘাতে—বুদ্ধিমার্জিত মননশীলতায়;

নতুন গণতান্ত্রিক সমাজচেতনাও হয়তো উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশান্তরে শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিক চেতনা ও গণজাগরণের (Mass democracy) ক্রমিক প্রসারের জন্যই তাঁর কাব্যে অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছিল।

কাব্যরীতির ক্ষেত্রে ভাষার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরুষ এনেছিলেন যা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল। সরল কলামাত্রিক যুক্তাক্ষরের চমৎকার ব্যবহার, দূরান্বিত মিলের মুক্তক, বিশিষ্ট কলামাত্রিকের সঙ্গে দলমাত্রিকের মিশ্রণ এবং, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, বাঙলা পদভাগের ছন্দে সঙ্কোচক দল-উচ্চারণের নতুন রীতির প্রবর্তন—এই হলো দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতির বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে শেষেরটি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন, এর জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রচলিত সনেটের পরিবর্তে দ্বিজেন্দ্রলাল দশপদী প্রবহমান, সঙ্কোচক দলমাত্রিক আঠারো-মাত্রা-পংক্তির নতুন রীতির কতকগুলি সার্থক কবিতা লিখলেন যা বাঙলা কাব্যে অভিনব আস্বাদ নিয়ে এলো। মিলের বিচিত্র ও কৌশলী প্রযোগের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বিদেশী মিলের আদর্শ থেকেই।

উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি কামিনী রায়ের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার গভীর ছাপ পড়েছে, কিন্তু সে প্রভাব কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করেনি। রোম্যান্টিক পিপাসা নিবারণের ইচ্ছা তাঁর ছিল, তবে রবীন্দ্রনাথেব সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ তাঁর ভাষায় ছিল না, নিতান্ত সহজ ভাষায় তাঁর রোম্যাণ্টিক বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে ক্লাসিকাল চরিত্রকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে কাব্যরচনার চেষ্টা কামিনী রায়ের মধ্যে দেখা যায় এবং এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রদূত। কিন্তু পবেকার 'পৌরাণিকী' ও 'অম্বা'র নাট্যকাব্যের আদর্শ রবীন্দ্র নাট্যকাব্যের আদর্শ থেকেই নেওয়া। কারণ, এর আগেই 'বিদায়ের অভিশাপ' প্রকাশিত হয়েছে এবং তারও আগে রবীন্দ্রনাথের টেনিসন-ব্রাউনিং পড়ার সংবাদ পেয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না—নাট্যকাব্যের আদর্শ বা 'নবপুরাণ সৃষ্টি'র প্রেরণা এই বিদেশী কবিরাই। যাই হোক, এছাড়াও এলিজির রীতিতে কামিনী রায় লিখেছিলেন 'অশোকসঙ্গীত'। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেই তিনি লিখেছিলেন সমিল প্রবহমান পয়ারে—যে আদর্শ মূলতঃ কীট্‌স্‌ থেকে এসেছে বলে মনে হয়। স্তবক নির্মাণে ও মিল প্রয়োগে কামিনী রায় রবীন্দ্রনাথেরই অব্যর্থ স্মারক, যদিও হেমচন্দ্রের শিষ্য তিনি। সনেটের ক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ পেত্রার্কপন্থী।

৫.

এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলা হলো তাঁরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে দীক্ষিত হয়েই বাঙলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু প্রভাবকে কতদূর স্বীকার করে নিজের মাতৃভাষার কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা যায় তার প্রমাণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সমগ্র ভাবে ইংরিজি সাহিত্য—বিশেষ করে, রোম্যান্টিক ও ভিক্‌টোরিয়ান যুগ, ফরাসী রোম্যান্টিক ও তার অবক্ষয়ের যুগ-ইতালিয়ান সাহিত্য, জার্মান সাহিত্য, গ্যেটের যুগ ও রোম্যান্টিক পরবর্তী হাইনের যুগ, উনিশ শতকের অ্যামেরিকান সাহিত্য, অষ্টাদশ, উনিশ ও বিশ শতকের পশ্চিমী দর্শন-সাহিত্য, বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা বই, বিশেষ করে জীবন এবং তার বিবর্তন-বিকাশ সম্পর্কিত বই, আধুনিক ইয়োরোপ ও অ্যামেরিকান কাব্যপরীক্ষার যুগ গভীর-ভাবে রবীন্দ্রকাব্যে অনুস্যুত হয়েছে। এছাড়া কত বই যে তাঁর কবি-চরিত্রে পরিবর্তন এনেছে তার ইয়ত্তা নেই। সাধাবণভাবে আমাদের যে ধারণা তার তুলনায় অনেক বেশি তিনি পড়তেন এবং কতো রূপে কতো বিচিত্র আইডিয়াকে যে তিনি গ্রহণ করেছেন তা নির্ণয় করা মুস্কিল। কিছু কিছু বিদেশী বই এবং ধ্যানধারণা ও চিন্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর কবি-প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে।

'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষত রোগগ্রস্ত কবিকে দেখা গেল যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় একেবারেই নতুন। ইয়োরোপীয় কাব্যের অবক্ষয়-যুগের পরিবেশে কবি যেন তাঁর কাব্যকে উপস্থিত করলেন। 'প্রভাত-সঙ্গীতে' এক নতুন রোম্যান্টিক কবিকে আমরা পেয়ে বিস্মিত হলাম। রোম্যান্টিকদের ভাষাও যেন তাঁর আশ্চর্য ভাবে রপ্ত মনে হলো। আসলে কিন্তু অনেকদিন ধরেই বিদেশী কাব্যচর্চা ও অনুরাগের মধ্য দিয়ে রোম্যান্টিক কাব্য-ভাষাকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। রোম্যান্টিক বিষাদিনীকেও আমরা তাঁর কাব্যে ক্রমশঃ দেখতে পেলাম। রোম্যান্টিকদের নিঃসঙ্গ যাত্রার ইমেজও দেখতে পাওয়া গেল। 'কড়ি ও কোমলে' জীবনের সর্বরসোপভোগের ফরাসী বিলাসিতা এলো। 'মানসী'তে রোম্যান্টিসিজ্‌মের চূড়ান্ত প্রকাশ। এখানে সেই বিষাদিনীর প্রতিচ্ছায়ায় বিশ্বজগৎ করুণ-লাবণ্যে ভরে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন—সে সম্পর্ক স্থাপন ইতিপূর্বে পাশ্চাত্ত্য কাব্যেই দেখেছি—তারই বিশেষ সূচনা এখানে। নাগরিক জীবনের প্রতি রোম্যান্টিক-সুলভ বীতরাগ

দেখা গেছে। দেশপ্রেমচেতনাও দেখা গেছে। কয়েকটি কবিতায় সৌন্দর্য-আকাজ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইংরিজি সাহিত্য—এই তিনটিকে 'তৌর্যত্রিকে'র মতো মিলিয়ে নিয়ে। 'সোনার তরী'তে সৌন্দর্য-আকাজ্ক্ষা ও সংসারাসক্তির টানাপোড়েন দেখতে পাওয়া গেছে। কবি নিজেই বলেছেন—ইয়োরোপের কর্মচাঞ্চল্য আর ভারতীয় বৈরাগ্য এই দুই মিলে বাস্তব সংসার আর সৌন্দর্যলোকের মিশ্রণ হয়েছে তাঁর কাব্যে। একটু ভেবে দেখলে দেখা যাবে—সৌন্দর্য-আকাজ্ক্ষা, যাকে কবি 'বৈরাগ্য' বলেছেন (স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের চিঠি: 'আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাজ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন, গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী'—সবুজপত্র, ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা) সেও ইয়োরোপীয় কাব্যপাঠেরই ফল। 'হিংটিং ছটে' পরোক্ষভাবে ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতা এবং তার থেকে জাত উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ পবিহাস-রসিকতাকেই তারিফ করা হয়েছে। এই কাব্যেই কবি তাঁর জীবন-দেবতাকে আবিষ্কার করেছেন। রোম্যান্টিক কবিদের guiding power, কেয়ার্ডের রচনা, বাশকার্টশেফের জার্নাল, এবং হয়তো গ্যেটের জীবন থেকে [গ্যেটে তাঁর কবিতার উৎসে এক unknown self-কে আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর কবিতাগুলিকে তিনি বলতেন daemonic] প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন। বিবর্তনবাদমূলক বই পড়ে পৃথিবীর ও প্রাণী-জগতের ক্রমবিকাশের সূত্রটিকে কবি রহস্যময়-ভাবে দেখেছেন। 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি কবিতা বিজ্ঞানেরই কাব্যরূপ। 'চিত্রা'র সৌন্দর্য-জগৎ অনেকখানি কীট্সীয় ইন্দ্রিয়চেতনায় রচিত। শেলী তো আছেনই। সুইনবার্নের জাদুকরী ভাষাও প্রেরণা জুগিয়েছে। ক্লাসিক্যাল যুগের প্রতি রোম্যান্টিকদের আকর্ষণের মতো সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আকর্ষণ জেগেছিল 'কথা'-'কাহিনী'-'কল্পনা'-'কণিকা'র জগতে। 'ক্ষণিকা'র উল্লাসের কারণ হিসাবে হাইনের কাব্য-সংস্পর্শের কথা বলা যেতে পারে, যদিও তা অনুমান মাত্র। 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে বুয়র যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যলোলুপ রাজনীতি-সভ্যতার নগ্নচেহারা ফুটিয়ে তুলেছে। উপনিষৎ-কঁৎ-দর্শন মিলিয়ে কবি 'বিশ্ব-দেবতার' কল্পনা করে তারই করুণার অপেক্ষায় থেকেছেন। 'স্মরণ' কাব্য স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা এলিজি। রোম্যান্টিকদের শিশুদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের ছিল। হয়তো রোম্যান্টিক ও ভিক্টোরিয়ানদের শিশু-কবিতা রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা রচনায় প্রেরণা দিয়েছে, যদিও এ ধরনের লেখার একটা বাস্তব উপলক্ষ্য ছিল। 'খেয়ার' মধ্যে 'Resignation' ও

রোম্যান্টিক Voyage-এর ভাব-চিত্র ফুটে উঠেছে। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি'তে মানবতার পূজা ঈশ্বর-পূজার নামান্তর হয়েছে কঁৎ-এরই প্রভাবে। মাঝে মাঝে সেই জীবনদেবতার ছায়া পড়েছে। বিজ্ঞান-সমর্থিত জীবনের যৌবন-শক্তি ও তার প্রবহমানতা সম্পর্কে কবির ধারণা উনিশ শতকের অষ্টম দশক থেকেই দেখা দিয়েছিল। উদ্ধৃতি দিয়ে তা দেখিয়েছি। এখন বার্গ্‌সঁ-র দর্শনের দ্বারা সে চেতনা তার স্বরূপে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। জীবন সম্পর্কে এক অবিনাশী সম্ভাবনার প্রতি আস্থায় বার্গ্‌সঁকে কবি ছাড়িয়ে গেলেন 'বলাকা'য়। জীবনের গতিতত্ত্বকে খুঁটিয়ে দেখলেন 'পলাতকা'য়, বাঙালীর ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে। অ্যামেরিকার বস্তুগ্রাসের থেকে মুক্তি পেয়ে শিশু-কল্পনার জগতে গা ভাসালেন 'শিশু ভোলানাথ'-এ। ইতিমধ্যে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা গেল বিশ্বের মনীষী-মহলে। সার্বজাতিক কল্যাণ-কামনায় অনেকেই এগিয়ে এলেন। 'পূরবী'তে তার উদ্দীপ্ত আভাস মিললো। এ কাব্যের কয়েকটি প্রেমের কবিতায় ইন্দ্রিয়বাসনাতীত অনুভূতির সাক্ষাৎ মিললো। 'কড়ি ও কোমলে'র পরেই তিনি প্রেমের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়-চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

প্লেটোর ডায়ালগ আর আমিয়েলের জার্নালের প্রেমচিন্তা কবিকে প্রেমের এই অসীমতার প্রতি উন্মুখ করেছিল আগেই। তার পরিণতি এখানে। জড় ও জীবজগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চেতনা কাব্যরূপ নিল 'বনবাণী'তে। প্রকৃতি-উপভোগের পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টি মিললো উপনিষদের প্রাণ-প্রবাহ চেতনায়, বার্গ্‌সঁর তত্ত্ব এখানেও সক্রিয়।

এরপর থেকে দেখা গেছে, কবি যেন বিশ্ব-প্রাণপ্রবাহের তীরে বসে আছেন। প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ নতুন। বাঙলা কাব্যে সেই প্রবাহের কলরোল শোনা গেল। নতুন কালের নতুন চিন্তাকে কবি সমাদর করতে উৎসুক। অমিশ্র বাস্তবকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিচারে গ্রহণ করবার রেওয়াজ উঠেছে তখন। কবি তার প্রতি দক্ষিণ-মুখ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে নিজের রচনার ত্রুটি স্বীকার করলেন মুক্ত মনে। রাশিয়ার সমাজব্যবস্থাও কবিকে পথ দেখিয়েছে। বিষয়, ভাষা ও দৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি 'সহজ' হয়েছেন। 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'শ্যামলী' এই নতুন পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা।

এর পরেই জড় ও মনের সম্পর্ক নিয়ে কবি আলোচনা করেছেন 'বিশ্ব-পরিচয়' লেখার সময়। জড় থেকে জীব—চৈতন্যের ক্রমবিকাশের পরিণতি।

আদিতে যে জ্যোতি রয়েছে—তা-ই চৈতন্যে প্রকাশিত। মৃত্যুর আগে তাঁর রোগ-ভোগের মধ্য দিয়ে কবি সেই চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতিকেই প্রত্যক্ষ করলেন। শেষ পর্যায়ের কবিতায় এই অভিজ্ঞতাই বারে বারে ফিরে এসেছে।

বাঙলা কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে স্থূল-সূক্ষ্মের দ্বন্দ্ব মেটেনি। রবীন্দ্রনাথ তার দ্বন্দ্ব নিরসন করলেন। অতীন্দ্রিয় চেতনার ভাষাসৃষ্টিতে তিনি সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাঙলাকে আশ্চর্য ভাবে কাজে লাগালেন। রোম্যান্টিকদের প্রতীকগুলির মতো রবীন্দ্রনাথও দেশী ও সার্বজনীন কতকগুলি প্রতীক করে নিলেন তাঁর বিশিষ্ট ভাবনা-প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। বিশেষ করে গত শতকের আশির দশকে কিছুদিন বিদেশী কবিতা চর্চা অনুবাদ ও অনুসরণ করে তিনি বাঙলা কাব্যে অভাবিতপূর্ব ভাষা সৃষ্টি করলেন, সংযম, রুচি ও সূক্ষ্মতা বাঙলা কাব্যকে অপূর্ব লাবণ্য দিল। রোম্যান্টিকদেব মধ্যে ভাষাশিল্পের প্রেরণা কীট্‌স্‌ই দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে, তাই কীট্‌সের কথা বারবার বলেছেন তিনি। ইংরিজি ভাষার ঐশ্বর্য, লাবণ্য কাঠিন্য সমস্ত কিছুকেই সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাঙলার মিশ্রণে ফুটিয়ে তুললেন। 'খেয়া' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত ভাষায় বাউলের ভাষাকেও কাজে লাগিয়েছেন মর্মানুভূতির প্রকাশে। 'বলাকা' কাব্যে পদাবলীরীতি, সংস্কৃতরীতি ও বাউল গানের রীতিকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার কবে যে আশ্চর্য গতিশীল ভাষাসৃষ্টি করলেন তিনি, তা বাঙলা কাব্যে শুধু তৎকালে নতুন নয়, চিরকালের বিস্ময়। 'পুনশ্চ' থেকে যে নতুন পরীক্ষা শুরু হয়েছে তাতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার যেমন বহু ব্যবহৃত তেমনি আটপৌরে চলিত ভাষাও আশ্চর্য লাবণ্যে প্রকাশিত। ইংরিজি বাক্যবীতি কোথাও থাকলেও তাতে মাতৃভাষার চেহারাই বড় হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যায়ের কাব্যে সংস্কৃত শব্দপ্রয়োগে ভাষা গাঢ় ও মন্থর হয়ে মৃত্যু-চেতনা প্রকাশের উপযোগী হয়েছে। ছন্দের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতি তো প্রথম থেকেই ব্যবহার করেছিলেন তিনি। এছাড়া যতিপ্রান্তিক সমিল পয়ার-ত্রিপদী-চৌপদী; যতিপ্রান্তিক মিলহীন পয়ার, অমিল ত্রিপদী [বোধহয় শেলির Alastor, Queen Mab ইত্যাদির আদর্শে], প্রবহমান পয়ার—অমিল ও সমিল [কীট্‌সের আদর্শে], প্রবহমান মহাপয়ার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ পংক্তি-মাপের মুক্তকাভাসিত ছন্দ, গদ্যছন্দ [বিদেশী আদর্শে] ইত্যাদি বাঙলা কাব্যের সম্পদ। মাত্রাবৃত্তে তাঁর নৈপুণ্য একেবারেই স্বকীয়।

দলমাত্রিক ছন্দেও বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন মিল না দিয়ে, প্রবহমানতা আনবার চেষ্টা করে। মিলবিন্যাসে, পদ-পর্ব-চরণ বিন্যাসের বৈচিত্র্যে স্তবকের সুমিত গঠনে শুধু পাঠককে নয়, সমসাময়িক বাঙালী কবিদেরও হতচকিত করেছেন। সনেট রচনায় তিনি ফরাসী রীতি ও শেক্‌স্‌পিরীয় রীতি আশ্রয় করে শেষ পর্যন্ত স্বকীয় পথ ধরেছেন। প্রাথমিক পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতিনির্ভর হয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁধা পথ ছেড়ে স্বকীয় রীতির স্রষ্টা।

বাঙলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের এই আলোচনায় দেখা গেল, প্রভাবের ব্যাপারে আলোচ্য কবিকুলের সকলেই স্বীকরণ করবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় জীবন, আদর্শ, ভাবনা ও ভাষার মধ্য দিয়েই বাঙলা কাব্যের মধ্যে প্রভাবকে গ্রহণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাঁরা। অনেক সময় আমরা এই প্রভাবকে মানতে চাইনি, গ্রহণ করতে চাইনি, কিন্তু বাঙলা কাব্য তার আপন প্রবাহকে সমৃদ্ধ করবার প্রেরণায় বিশ্বসাহিত্যের রসের ক্ষেত্র থেকে তার প্রাণরস সংগ্রহ করেছে। বিদেশের সংস্কৃতির 'সোনার কাঠি'র স্পর্শ তার লেগেছে, সংগ্রহ ও স্বীকরণের মধ্য দিয়েই বাঙলা কাব্য স্বকীয়তা বা 'খাঁটিত্ব' বজায় রেখেছে। রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ—সকলেই এই স্বীকরণের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। কিঞ্চিদধিক এই আশি বছরের ইতিহাসে আমরা দেখেছি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবকে ক্রমশ নিবিড় করে নেবার চেষ্টা এবং এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সার্থকতম প্রতিনিধি। তিনি প্রভাবকে গ্রহণ করেছেন গভীরভাবে এবং সেইজন্যই রসের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। হয়তো রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অনেক বেশী প্রকট তাঁদের কাহিনী-কাব্যগুলির জন্য। লিরিক উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে প্রভাব স্বভাবতই অন্তর্লীন থাকে। কিন্তু সে প্রভাবেরও তারতম্য থাকে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চেয়ে বিহারীলাল প্রভাব-গ্রহণে ছিলেন বেশি দক্ষ, রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিরাও তাই। আর রবীন্দ্রনাথ তো সবচেয়ে বেশি দক্ষ। তাঁর প্রতিভাস্পর্শেই বিষয়, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, রীতি সর্বব্যাপারেই বাঙলা কাব্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাইকেলের হাতে বাঙলা কাব্য নবজন্ম পেয়েছিল। রঙ্গলাল তার আগমনী জানিয়েছিলেন, পরবর্তীদের হাতে বাঙলাকাব্যে বিদেশী সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান পাঠের অভিজ্ঞতার

ছাপ পড়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে তার 'জন্ম-জন্মান্তর' ঘটে গেল। রবীন্দ্রনাথের হাতে যে কাব্য জন্মান্তরিত হলো তার মৌলিক চরিত্রটি হলো একটি স্পষ্ট আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। এ প্রেক্ষাপটে গত শতাব্দীর উদারনৈতিক মানবিকতা, গণতান্ত্রিক অধিকার-চেতনা এবং ঈশ্বরিত মানবতার ধারণা খানিকটা রং-তুলির কাজ করে রেখেছিল। আর খানিকটা কাজ করে রেখেছিল বৈজ্ঞানিক চেতনা। যুক্তিবাদী দর্শন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার আঘাতে প্রত্যহ ও শাশ্বতেব বিরোধ শুরু হয়েছিল। এই শেষ লক্ষণটি দ্বিজেন্দ্রলালে যত স্পষ্ট ['মন্দ্র' কিংবা 'আলেখ্য' কাব্যের কয়েকটি কবিতায়], সমকালীন রবীন্দ্র-কাব্যেও ততটা নয়। যাই হোক, মানবিকতা এবং গণতান্ত্রিক বোধই ছিল রবীন্দ্র-সমকালীন কবিগোষ্ঠীব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রোম্যান্টিসিজ্‌মের পল্লীভিত্তিক সৌন্দর্য-জগৎটি রবীন্দ্র-সমকালীন সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান কুমুদরঞ্জন, কালিদাস, যতীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, ইত্যাদি অনেকেই স্বকীয় ভঙ্গিতে ফুটিয়েছিলেন। হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের জগৎটি বিস্ময়রসে একটু বিশিষ্ট। রূপ-রঙ ধ্বনির এক নিজস্ব মিথ্‌ তিনি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন, কালিদাস মোটামুটি একই জাতেব শিল্পী। অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদাব, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রমথ চৌধুরীর ফবাসী চর্চা ও বুদ্ধি-নির্ভর সংযম সাধনা এক বিচিত্র গদ্যময় সংহত কবিতার জন্ম দিয়েছিল। ভোগ-বৈরাগ্যের এক নিজস্ব দ্বন্দ্বও ছিল তাঁর। মোহিতলালের ভোগবাদী তান্ত্রিক বলিষ্ঠতা, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ, যতীন্দ্রমোহনেব চাষী-শ্রমিক মানুষের প্রতি সোজাসুজি দরদ প্রকাশ যেন কল্লোল গোষ্ঠীর গণচেতনার অগ্রদূত হয়ে এলো। রুশ বিপ্লবের পর সাম্যবাদী হাওয়ায় যেভাবে ব্যর্থতার শূন্যতা পূরণ করেছিলেন নজরুল এবং কিছু পরিমাণে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তাতে তাঁদেব বয়োজ্যেষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ কিংবা যতীন্দ্রমোহনের পূর্ব ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি দৃষ্টি, শ্রমার্ত, অজ্ঞাত দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতির নজর প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর রুশবিপ্লবের সাম্যবাদী পরিবেশ বাঙলা কবিতার অন্যতম লক্ষণ। হুইটম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি ও সর্বগ্রাসী মানবিকতা এই পরিবেশে খাপ খেয়েছে বলেই হুইটম্যান অনেকেরই তখন প্রিয় কবি। ঈশ্বর, প্রকৃতি, মানুষের বদলে প্রসারিত নগর সভ্যতার কবি প্রাধান্য দিয়েছেন শহরের মানুষ, পথ ও কবি-কে, যে কবির মধ্য দিয়ে আহত স্বপ্নময়

মানুষ কথা বলে। এই সাধারণ নগরকেন্দ্রিক সমাজ-চেতনা ও মানবিকতা তিরিশের দশকের শেষে পরিচ্ছন্ন মার্কসীয় সামাজিক বাস্তবতাকে পথ করে দিয়েছে। নগর সভ্যতার ক্লান্তি ও অবক্ষয়, শোষণ ও আত্মদমন, যৌনাকাঙ্ক্ষা ও আত্মরতির ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসেছেন বিষ্ণু দে ও সমর সেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখোমুখি সময়ে অনেকেই সাম্যবাদে দীক্ষিত হয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা রাম বসুর কবিতায় প্রাথমিকভাবে এই দীক্ষান্ত সুর বেজেছে। মায়াকভ্‌স্কি, নাজিম হিকমত কিংবা পাব্‌লো নেরুদার মতো কবি এই সূত্রেই প্রেরণাস্থল।

অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব-প্রধান কাব্যধারায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-যুবনাশ্ব যে তীব্র ব্যক্তিগত আবেগকে প্রকাশ করতে পারতেন তাঁরাও ক্রমশঃ পশ্চিমী সাহিত্য-চর্চায় শিল্প সচেতন হলেন। এই সচেতনতার পথেই কবি-অ-কবি নির্বিশেষে অনেকেই আমাদের কবিদের আদর্শ হয়েছেন। প্রুস্ত্‌, বোদল্যের, র‍্যাঁবো, মালার্মে, টি.এস. এলিয়ট, জেম্‌স্‌, উইণ্ডহাম লুইস, লরেন্স ইত্যাদিরও রচনা ও আদর্শ তখন বহু চর্চিত। এই সূত্রেই ঐতিহাসিক অনুভূতি ও স্মৃতির সঙ্গে ব্যক্তি-প্রতিভার শিক্ষিত যোগ এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক পটভূমিতে নিজেদের আবেগের কেন্দ্রগুলিকে স্থাপন কবার কথা সুধীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, জীবনানন্দও বলেছেন। কাজেই নৈর্ব্যক্তিকতা এবং ঐতিহাসিক ভৌগোলিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় কবিতার দৃঢ় ও সংহত উপস্থাপনাই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিদের মূল্য লক্ষ্য ছিল। একথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না, এই সব কবিদের গঠন-পরীক্ষা, গদ্য-পদ্য মিশ্রণের কৌশল, গদ্যকবিতার পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেও খানিকটা নৈর্ব্যক্তিকতা, আত্মসচেতনতা ও বাহিরাশ্রয়িতা দিয়েছিল। অন্যদিকে মনোবিকলন-পন্থার অনুসরণ, নিজস্ব মিথ্‌-সৃষ্টি, অবচেতন 'সুররিয়্যা-লিস্টিক' অসংলগ্ন ও সমস্থায়ী প্রকাশভঙ্গি, অতীত, উপস্থিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়কে যুগপৎ উপস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক মননের ব্যবহার তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাঙলা কবিতাকে 'এক বিশ্বে'র পটভূমিতে এনে ফেলেছে। ফলে আদর্শের টান বা বাঁধন যখনই বেশি হয়েছে তখনই মুক্ত আবেগের পথে কবিতাকে ছেড়ে দিয়েছেন কবিরা। ফলে বিশেষ কোনো বিদেশী কবি বা কবিগোষ্ঠী হয়তো কোথাও কোথাও চিহ্নিত হয়ে পড়েন সাময়িকভাবে, কিন্তু

কবিতাকে নিঃশর্ত ও আন্তর্জাতিক রাখতেই কবিরা এখন বেশি ইচ্ছুক। জীবনানন্দ খুব স্পষ্ট ভাষায় আধুনিক কবিতার এই চরিত্রকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন:

'নিজের দেশের কবিতায় দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতর স্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গলকাব্য পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ও মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভিতরেই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তার আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে সে সবের সঙ্গেও যুক্ত।' [কবিতার কথা। পৃ. ১১৪]

পরিশিষ্ট

ক। উনিশ শতকের বাঙলা কাব্যে ইংরেজ কবিদের প্রভাব

১.

ইংরিজি শিক্ষা প্রবর্তনের পর উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই তখনকার কবিখ্যাতিলিপ্সু বাঙালী কবিদের মধ্যে বিদেশী কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তৃতীয় দশকের প্রথম দিক থেকেই বাঙালী কবিরা ইংরিজি কবিতার প্রভাবে পড়েন। প্রভাব না বলে প্রকোপ বলাই উচিত। কারণ ইংরিজি সাহিত্যের আস্বাদ পেয়ে ইয়ং বেঙ্গল বাঙলা ভাষাকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন। কাজেই বিদেশী সাহিত্যের রসে ডুবে প্রতিভাবানের দল ইংরিজিতে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে সে ভাষায় কবিতা লিখে বিদেশীদের সত্যিকার প্রশংসা পাওয়া যে নেহাৎই অসম্ভব ব্যাপার, সে কাণ্ডজ্ঞান তখন কারো হয় নি। ইংরিজির মতো অসাধারণ শক্তিশালী ভাষার সংস্পর্শে এসে মাতৃভাষার প্রকাশক্ষমতা ও রুচির দৈন্য দেখে এ অবস্থা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তার ফলে বাঙলা ভাষায় প্রচুর সম্ভাব্য কবিকে আমরা যে হারিয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার ওপর শ্রদ্ধা থাকলে বা তার ওপর সে সব কবিদের দয়া-দাক্ষিণ্য দেখা দিলে বিদেশী কাব্যচর্চার ফলশ্রুতিকে তাঁরা কাজে লাগাতে পারতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য রুচি নিয়ে যাঁরা কাব্যরচনা করতেন তাঁদের সংখ্যা আরও বেশী হতো। উন্নত রুচির বাঙলা কাব্য হয়তো প্রথমার্ধের তৃতীয় দশক থেকেই আমরা পেতাম এবং কবির সংখ্যা বৃদ্ধিতে কাব্যের সমৃদ্ধি অন্তত কিছুটা পরিমাণ যে বাড়তো তাতে সন্দেহ কি। বাঙলা দেশের সৌভাগ্য যে, মাইকেল ইংরিজি কাব্য রচনা ছেড়ে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভাকে নিয়োগ করেছিলেন এবং এই যুগান্তকারী প্রত্যাবর্তনের জন্য বেথুন সাহেব ও গৌরদাস বসাকের কৃতিত্ব অনেকখানি। ইংরিজি কাব্যচর্চা করতে গিয়ে ইংরিজি ভাষায় কবিতা রচনার মোহ যখন কেটে গেল, তখন কবিখ্যাতির ইচ্ছা না থাকলেও অনেকেই ইংরিজিতে কাব্য রচনা করেছেন। এই কবিতা লেখার

পিছনে বেশির ভাগেরই ছিল আত্মতৃপ্তি। খানিকটা পাঠক সমাজে অভিজাত স্থান নেবার ইচ্ছাও যে ছিল না তা নয়। না থাকলে বইগুলো ঘটা করে প্রকাশিতও হতো না। চাকুরিজীবী কবিরা ইংরেজ মহলের প্রশংসার প্রত্যাশীও ছিলেন। পরবর্তীকালে বাঙালী কবির ইংরিজি কাব্য রচনার কথা ভাবলে প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথ সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথাই মনে আসে।

যাই হোক হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের বিদেশী কাব্যচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রথম বিদেশী সাহিত্য যা পড়ানো হতো তার মধ্যে শেক্‌স্‌-পিয়ারের রচনাই উল্লেখযোগ্য এবং এই ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ডি.এল রিচার্ডসনের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। তিনি শুধু ইংরিজি সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেন নি, ইংরিজি ভাষার ছন্দ ও প্রাণ তাঁর আবৃত্তিতে ফুটে উঠেছিল। মেকলেও সে আবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফের শিষ্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩০ এ ঘোষণা করেছিলেন যে হিন্দু শাস্ত্রের চেয়ে পোপ-ড্রাইডেনকে বেশি শ্রদ্ধা করতে হবে। রামতনু লাহিড়ী তাঁর ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক পড়াবার পরেও বার্নস, কুপার, টমসন, ক্যাম্পবেল ইত্যাদির কবিতা এবং মিল্টনের Comus পড়িয়ে শোনাতেন। হোমরের ইলিয়াদ ও ভার্জিলের ঈনিদের অনুবাদ অক্ষয়কুমার দত্ত স্কুলেই পড়েছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডাফের জীবনী থেকে জানতে পারি যে, ১৮৩০ সালে 'ফেভরিট অথরস্' ছিলেন ওয়াল্টার স্কট, বায়রন ও রবার্ট বার্নস। শেক্‌স্‌পিয়ারের ম্যাকবেথ এবং হ্যামলেট বার বার আবৃত্তি করানো হতো ছাত্রদের। উৎসাহী ছাত্ররা ষ্টেজে অভিনয় করতো। কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী থেকে জানতে পারি, তিনি প্রিন্স অব্ ডেনমার্কের অভিনয় করেছিলেন ছাত্রজীবনে। শেক্‌স্‌পিয়র, মিল্টন এবং ইয়ং তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। ১৮৪০-এর কাছাকাছি প্যারাডাইস লস্ট এবং পোপের এসে অন্ ম্যান পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পেয়েছিল। ইংরেজ কবিদের প্রভাবের প্রসঙ্গে ১৮৩৮ সালে 'বান্ধবে' এক সমালোচক বলেছিলেন: 'এদেশীয় কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিল্টন, বায়রণ, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্রশিষ্য'। এই ধরনের সাক্ষ্যগুলির মধ্যে সবগুলিই যে কবির সাক্ষ্য তা নয়, কিন্তু কবি-অকবি নির্বিশেষে সকল মানুষের মনেই যে ইংরিজি সাহিত্য ও অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যে ক্রমশঃ অধিকার ছড়াচ্ছিল তারই প্রমাণ দেওয়া গেল।

২.

ইংরিজি সাহিত্যের কবিদের মধ্যে শেক্স্‌পিয়ার, মিল্টন, পোপ, ড্রাইডেন, স্কট, মুর, বার্নস, শেলি, কীট্‌স্‌, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, গ্রে, বায়রন, কুপার, টেনিসন, ব্রাউনিঙ উনিশ শতকের বাঙালী কবিদের প্রেরণাস্থল ছিলেন। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে কোনো ইংরেজ কবির প্রত্যক্ষ প্রভাব পাওয়া যায় না। রঙ্গলালের কাব্য থেকেই আমরা প্রথম শেকস্‌পিয়ারের স্পষ্ট পদক্ষেপ শুনতে পেলুম। পদ্মিনী উপাখ্যানের মধ্যে স্থানে স্থানে শেক্স্‌পিয়ারের পংক্তির ভাবানুবাদ পাওয়া গেল [যেমন, 'কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম দেহ চিত্র করে' King John-এর চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে To gild refined gold' ইত্যাদি কয়েক পংক্তির অনুবাদ]। শেক্স্‌পিয়ারের রচনায় দেশপ্রেমের আদর্শসূচক ছড়ানো পংক্তিগুলি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং 'কর্মদেবী'র কবি রঙ্গলালেব কাব্যে আভাসিত হতে দেখি। মহাকবি হবার ইচ্ছায় মধুসূদন যদিও বিদেশী ক্লাসিক্যাল কবিদেরই গুরু করেছিলেন, তবু শেক্স্‌পিয়ারের ভাব, ভঙ্গি ও উপমা মধুসূদনের কাব্য রচনায় সাহায্য করেছিল। চিঠিপত্রে উপমাব ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শেক্স্‌পিয়ারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি। সনেট রচনার ব্যাপারেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেক্স্‌-পিয়াবকে মাইকেল অনুসরণ করেছিলেন সনেটের শেষ দু-পংক্তির মিল দিয়ে couplet রচনায়। তাঁর আদর্শ ছিল পেত্রার্ক ও মিল্টন। আর এও লক্ষ্য করার বিষয় সনেটে মধুসূদন অনেক বিশিষ্ট মানুষের বন্দনা করেছেন, শেক্স্‌-পিয়ারের কোনো বন্দনা নেই। তা না থাকুক, শেক্সপিয়ারকে মহাকবির যোগ্য আসন মধুসূদন দিয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় হেনরিয়েটার মৃত্যুর খবর পেয়ে মনোমোহন ঘোষকে Lady Macbeth-এর মৃত্যুতে Macbeth-এর উক্তি [Tomorrow, and tomorrow, and tommorrow, Act, V, Scene V] ক্ষীণকণ্ঠে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপিয়ারের 'টেমপেস্ট' ও 'রোমিও জুলিয়েত'-এর অনুবাদ করেছিলেন। শেক্সপিয়ারকে বন্দনা করেই তিনি লিখেছিলেন 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'। নবীনচন্দ্র সেন যে তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাহিনী কাব্যে সিরাজের সম্মুখে যুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্তে প্রেতের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন তা শেক্স্‌পিয়রীয় নাট্যকলার প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। A Midsummer Night's Dream-এর 'নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন' নামে এক অনুবাদ করেছিলেন নবীনচন্দ্র, যদিও তা

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্র অক্ষয় চৌধুরী যে শেক্‌স্‌পিয়ারের কেমন ভক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'ই তার প্রমাণ দেবে: 'আমাদের বাল্যবয়সে সাহিত্য-দীক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজী কাব্য আওড়াইতেন, তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।' 'উদাসিনী' কাব্যের সর্গারম্ভে শেক্‌স্‌পিয়ারের উদ্ধৃতিও একথার প্রমাণ দেয়। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যের ('যোগেশ') নায়ক যোগেশ বলেছে যে, তার প্রিয় কবি ও কাব্য হলো 'শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তর চরিত, সেক্ষপীর, বাইবণ, মিল্টন, হোমর, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, টেনিসন্‌, মুর।' রোম্যান্টিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে বসে শেকস্‌পিয়ার পড়েছিলেন। 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্যে শুধু যে সর্গারম্ভে শেক্‌স্‌পিয়ারের উদ্ধৃতি আছে তাই নয়, অনেক ভাবনা ও বর্ণনা শেক্‌স্‌পিয়াবের নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে ইংবিজি কবিতার নিছক অনুসরণের প্রতি স্পষ্ট ঘৃণা প্রকাশ বোধ হয় বিহাবীলালেই প্রথম দেখা দিয়েছিল। বাঙলা কাব্যধর্ম বা জীবনধর্ম বজায় রেখেই বিদেশী আদর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। জানি না, তাঁরই অনুসরণে কিনা, বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই স্বধর্মচ্যুত পরানুকরণের বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে উনিশ শতকের ইংরেজ, ফরাসী ও অ্যামেরিকান কবিরা যতটা প্রভাব ফেলেছেন, শেক্‌স্‌পিয়ার ততটা ফেলেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যেও শেক্‌স্‌পিয়ারের ভাবনা-চিন্তা তেমন সুলভ নয়। প্রায় বারো বছর বয়সে গৃহ-শিক্ষকের কাছে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ম্যাকবেথ। বোধ হয় তাঁরই আদেশে ম্যাকবেথের তর্জমা করেছিলেন সেই সময়েই। প্রায় চোদ্দ বছর বয়সে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' তিনি যে সমালোচনা লেখেন, তাতেও শেক্‌স্‌পিয়ার পড়ার প্রমাণ দিয়েছেন। পরে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমালোচনাতেও শেক্‌স্‌পিয়ার থেকে আদর্শ রচনা হিসেবে উদাহরণ দিয়েছেন। তাছাড়া অক্ষয় চৌধুরীর মধ্যে দিয়ে শেক্‌স্‌পিয়রের উত্তেজনা তাঁর মনেও সঞ্চারিত হয়েছিল, সে কথা আগে বলেছি। সেই উত্তেজনার প্রভাব তাঁর শৈশবের কাহিনী

কাব্যগুলির মধ্যে পড়েছে, কিন্তু 'জীবনস্মৃতি' রচনার সময়ে তিনি সে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তবে আতিশয্যে আক্রান্ত হলেও মানবচরিত্রের অতলরহস্য যে তাঁর বোধগম্য হয়েছিল শেক্‌স্‌পিয়ার পড়েই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শেক্‌স্‌পিয়ার রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গীও ছিল। ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে : .....'কখন কোনটা দরকার হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।......সেই জন্যে আমার সঙ্গে নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর থেকে আরম্ভ করে শেক্‌স্‌পিয়র পর্যন্ত কতরকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।' বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শেক্‌স্‌পিয়ারের ওপর একটি সনেট লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রণাম জানিয়েছিলেন। তবে শেক্‌স্‌পিয়াব যতখানি পড়েছিলেন তিনি, তার তুলনায় তাঁব কাব্যে শেক্‌স্‌পিয়ারের প্রভাব কম। শেক্‌স্‌পিয়ার, সমসাময়িক এডমণ্ড স্পেন্‌সার (?. ১৫৫২—৯৯) বাঙালী ছাত্রসমাজ ও কবিদের কিছুটা প্রভাবিত কবেছিল। তাঁর 'ফেয়ারী কুইন' (প্রকাশসূচনা ১৫৯০) ও পরবর্তী শতাব্দীর জন বুনিয়ানেব (১৬২৮-৮৮) 'পিলগ্রিম'স্‌ প্রোগ্রেস' (১৬৭৮) যৌথভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপককাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫)-এব প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছে।

শেক্‌স্‌পিয়াবের পর মিল্টন বোধ হয় বাঙালী কবিদের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। রঙ্গলাল 'রহস্য সন্দর্ভে' যে কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে 'আদিম নরদম্পতীর প্রাতরূপাসনা' মিল্টন থেকে অনূদিত। তবে সে প্রচেষ্টা মিল্টন-চর্চার শ্রেষ্ঠ সাধক মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরেকার কথা। মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্ট' থেকে কিছু বর্ণনাভঙ্গি ও উপমা ছাড়া মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশিকিছু গ্রহণ করেন নি। দান্তে ও তাস্‌সোর কাছে মিল্টন ছিলেন ঋণী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভার্জিলের কাছে। মধুসূদন মিল্টনেব মাধ্যমে এ দুই কবির সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তবে মিল্টন থেকে সমস্ত কিছু গ্রহণ না করলেও মিল্টনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। মিল্টনের পূর্বসূরিদের তিনিও তলব করেছিলেন, কিন্তু পূর্বসূরিদের তুলনায় উপকরণ আহরণের ব্যাপারে এবং কবিত্ব কৌশলে মিল্টন যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তা তিনি জানতেন : I don't think it is impossible to equal Virgil, and Tasso. Though glorious still they are mortal poets ; Milton is divine। বাঙলা কাব্যে ব্ল্যাঙ্কভার্স প্রবর্তনের জন্যও মধুসূদন মিল্‌টনের কাছে ঋণী :

Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton. বাঙলায় ব্ল্যাঙ্ক ভার্স পড়া অভ্যাস করার জন্য মধুসূদন প্যারাডাইজ লস্টের ছন্দকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলেছিলেন। সনেটের ব্যাপারেও মধুসূদন মিল্টনের অষ্টকের দুটি মিল এবং ষট্‌কে দুটি বা তিনটি মিলের অনুসরণ করেছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র বসু মিল্টনের প্যারাডাইজ লস্টের ভাবানুবাদ করেছিলেন 'স্বর্গভ্রষ্ট কাব্য' নাম দিয়ে। তবে প্রতিভার অভাবে সে ভাবানুবাদ ভাষার আড়ষ্টতায় উৎকট হয়ে উঠেছে। প্রায় ষোলো সতের বছর পরে মহেন্দ্রনাথ বিশারদ মিল্টনের Comus অনুবাদ করেছিলেন। বিহারীলালের রোম্যান্টিক চেতনা আত্মপ্রকাশ করার পর গীতিকবিতার এক নতুন উচ্ছ্বাসে মাইকেলের মিল্টন-চর্চার ঐতিহ্য অবহেলিত হয়েছিল। চিন্তানায়ক ঔপন্যাসিক ও কবির দল মিল্টন পড়লেও এক সনেট ছাড়া মিল্টনের কাব্যরীতিকে প্রয়োগ করার সুযোগ পেলেন না তাঁরা। মধুসূদনেব অনুসারী মহাকাব্যরচনালিপ্সু হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সেব শক্তি বোঝেন নি এটা আশ্চর্য, এবং আবও আশ্চর্য যে, হেমচন্দ্রেব কাব্যে ও নবীনচন্দ্রেব কাব্যে মিল্টন প্রায় অনুপস্থিত। কেবল Pandemonium-এব সভাব অনুসবণ হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের প্রথম সর্গে চোখে পড়ে, সরস্বতীবন্দনাংশও মাইকেল এবং মিল্টনের invocation-এর কথা স্মবণ করায়। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীব যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজেব বিরুদ্ধে মন্ত্রণাও মিল্টনের বিদ্রোহী এঞ্জেলদের সভাব কথা মনে কবিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ মিল্টনের 'প্যারাডাইজ লস্টে'র কথা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেও শেক্‌স্‌পিয়ার ও মিল্টনের উত্তেজনাব উচ্ছ্বাসকে সংযতভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা কবেছেন। মিল্টনেব ব্ল্যাঙ্ক ভার্স তিনি কতক ক্ষেত্রে গ্রহণ করলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিলের সাহায্য নিয়েছেন, পরবর্তীকালে পরীক্ষাধারা সেই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের মধ্যে আরও স্বাধীনতা এনেছেন।

৩.

মিল্টনের পর পোপ-ড্রাইডেনের যুগ বাঙালী কবিদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মধুসূদনের চিঠিপত্রে পোপ-ড্রাইডেন চর্চার রীতিমতো উৎসাহ দেখতে পাই। এডুকেশন গেজেট এবং 'অবোধবন্ধু'তে হেমচন্দ্রের অনেকগুলি খণ্ড লিরিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে পোপের অনুবাদ

'মদন পারিজাত' এবং ড্রাইডেনের অনুবাদ 'ইন্দ্রের সুধাপান' প্রকাশিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পোপের 'Temple of Fame' এবং 'Eloisa to Abelard'-এর কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কাব্যভঙ্গিতেও অগাস্টান যুগের ছাপ রয়েছে। কিছু পরে অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী' কাব্যে পোপ-ড্রাইডেন থেকে উদ্ধৃতি দেখতে পাই। পোপেব 'এলোইসা টু আবেলার্দ' অবলম্বনে অক্ষয়চন্দ্র 'মালতী-মাধব' কাব্যরচনা করেছিলেন। কিছু অংশ 'জ্ঞানাঙ্কুরে' বেরিয়েছিল (১২৮২)। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ সেনেব 'নির্ঝরিণী' কাব্যের মধ্যে পোপ থেকে একটি কবিতার অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু কাব্যের চর্চা এবং অনুবাদই নয়, পোপের মানবিকতার শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি 'Esaay on Man' এই শতকের সত্তরের দশকের সাহিত্যিকদের সাধারণ-ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮৭২-এ কালীমোহন মুখোপাধ্যায় 'মানবতত্ত্ব' নাম দিয়ে এবং ১৮৭৫-এ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় 'মানবতত্ত্ব কাব্য' নাম দিয়ে উক্ত রচনাটিব অনুবাদ কবেছিলেন।

স্কট বাঙলা কাব্যে কবিদেব প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অনুসরণেই সত্যিকারের বাঙলা উপন্যাসের সূচনা, কাব্যের ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই। স্কটের মধ্যযুগভিত্তিক রোম্যান্টিক গাথাকাব্য রঙ্গলালের মনে ঐতিহাসিক গাথাকাব্য রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল সন্দেহ নেই। এত বেশি সংখ্যক কবি স্কটকে অনুসরণ করেছেন বা তাঁর অনুবাদ কবেছেন যে, তাঁর অনুসরণে বাঙলা কাহিনী-কাব্যের একটা স্কুল তৈরি হয়েছিল বলতে পারি। যুদ্ধ বর্ণনা এবং আক্রমণ রচনার বর্ণনাগুলি স্কটের রোমান্সের নকলে রঙ্গলাল সাজিয়েছিলেন তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে। স্কটের মিনস্ট্রেলের অনুসরণে চারণের মুখে রঙ্গলাল কাব্য-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মধুসূদন স্কটের আদর্শকে বিশেষ আমল দেননি তাঁর কাব্যে। উপরন্তু রঙ্গলাল স্কট ইত্যাদি কবিদের অনুসরণ করেছেন বলে রঙ্গলালের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করেছিলেন। হেমচন্দ্রের মধ্যে স্কটের নাম গন্ধ নেই। নবনীচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) ঠিক এপিক হয় নি, স্কটের metrical romance-এর ধারা বহন করেছে। ঐ বছর স্কটের 'দি লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল'-এর অনুবাদ করেছিলেন রাখালদাস সেনগুপ্ত 'শেষ বন্দীর গান' নামে। ১৮৮০ সালে নবীনচন্দ্র স্কটের আদর্শে আবার একটি আখ্যায়িকা কাব্য লিখলেন 'রঙ্গমতী'। এর চরিত্রগুলিতে স্কটের অনুসরণ

আছে, গানে 'দি লেডি অব দি লেকে'র অনুসরণ আছে। 'ত্রয়ী'তে শৈলজা ও জরৎকারুর ভূমিকাতেও রোমান্সের ছোঁয়া লেগেছে। অক্ষয় চৌধুরী (১৮৫০-৯৮) স্কটের আদর্শ ধরে রোম্যান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। যদিও তাঁর 'উদাসিনী' কাব্যে পার্নেলের 'হার্মিট' কাব্যের অনুসরণ স্পষ্ট, কিন্তু স্কটের ধারাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই ধারাতেই আমরা নবীনচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ইত্যাদি আখ্যায়িকা কাব্য এই ধারারই অনুসরণ, তবে গীতিকাব্যধারার বেগ প্রবল হওয়ায় স্কটের আদর্শে কাহিনী কাব্য রচনা উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে খুবই কমে গিয়েছিল।

মুরের কবিতা, বিশেষ করে Irish Melodies ইংরিজি-জানা কবিদের প্রথম থেকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মুরের প্রেমানুভূতির উচ্ছ্বাস এবং দেশপ্রেমের আবেগ বাঙালী কবি যুগোপযোগীভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র বিখ্যাত অংশ 'স্বাধীনতাহীনতায়··' মুরের Glories of Brien the Brave এবং From Life without Freedom অনুসরণে লেখা হয়েছিল। ১৮৭৪-এ প্রকাশিত অধরলাল সেনের 'মেনকা' মুরের Lalla Rookh কাব্যের অন্তর্গত 'প্যারাডাইজ এণ্ড দি পেরী' কবিতার অনুবাদ। ১৮৭৬-এ অজ্ঞাতনামা কোনো লেখকের লাল্লারুখ-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'পরী ও স্বর্গ' নাম দিয়ে। ১২৮৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নির্ঝরিণী' কাব্যে মুর চর্চার প্রমাণ পেলুম একটি কবিতার অনুবাদের মধ্য দিয়ে। মুরের কবিতা অক্ষয় চৌধুরীর খুব প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় তাঁদের বাড়িতে চিত্র-বিচিত্র করা মুরের Irish Melodies[১] ছিল। অক্ষয় চৌধুরী তার থেকে আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করে দিতেন। সেই মেলডিজের কয়েকটি সংগীত বাঙলায় অনুবাদ করে 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যেও মুরের কবিতার অনুবাদ রয়েছে।

বার্নসের কাব্যের স্তবকগঠনরীতি বিহারীলালের মধ্যে কোথাও কোথাও পেয়েছি। তাঁর কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন।

শেলি কীট্‌স্ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা মাইকেল প্রথম জীবনের ইংরিজি কাব্যরচনার সময় আদর্শ করেছিলেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব' রচনায় শেলি কীট্‌সের সাহায্য নিয়েছেন, যদিও তা দুর্নিরীক্ষ্য মনে হয়। ক্রমশঃ মহাকবি

হবার প্রেরণা পেয়ে তিনি রোম্যান্টিক কাব্যের পথ ত্যাগ করেন। পরে মহাকাব্যকে বিদায় দিয়ে আপন গীতি-প্রবণতাকে স্বীকার করেছিলেন। রঙ্গলাল রোম্যান্টিক কবিতা পড়তেন। হেমচন্দ্র শেলির স্কাইলার্ক অনুবাদ করেছিলেন। নবীন সেনের গীতোচ্ছ্বাসের পিছনেও নিশ্চয় শেলি-কীট্‌স্‌ ছিলেন প্রেরণাদাতা। অক্ষয় চৌধুরী তো নিজে রোম্যান্টিক কবিদের রীতিমত ভক্ত ছিলেন। বিহারীলালের রোম্যান্টিক কল্পনার পেছনেই সর্বপ্রথম শেলি কীট্‌স্‌ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সত্যকার রূপ নিয়ে ধরা দিলেন। প্রকৃতিকে জীবস্বরূপে আমরা প্রাচীন কাব্যে দেখতে অভ্যস্ত থাকলেও প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, প্রকৃতিকে আবেগের উৎস বলে জানতে, প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের আধ্যাত্মিক সত্তাকে খুঁজে বার করতে নতুন করে প্রেরণা ও শিক্ষা পেলুম এই রোম্যান্টিক কবিদের কাছ থেকে। ১৮৮৫ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে নতুন করে (Article VII) এই ঋণের কথা স্বীকার করা হয়েছিল: Like Wordsworth we make to love nature and extract a philosophy out of it. Like Shelley, we invest it with mystic metaphysics. Like Byron, we make it the cue for pouring forth passionate rhapsodies. রোম্যান্টিক চেতনাকে সত্যকার finishing-rounding দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে স্থূল আবেগের উচ্ছ্বাস সংযত হলো, রুচিস্নিগ্ধ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এলো। ১২৮৭ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী'তে 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধে কবি রোম্যান্টিক কল্পনা সম্পর্কে রায় দিলেন: 'কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত সুশিক্ষিত এবং উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যাত্রাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে।' 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' নামে 'ভারতী'তে (১২৮৭ আষাঢ়) প্রকাশিত প্রবন্ধে বায়রনের কল্পনাকে উত্তেজক ও স্থূল বলে শেলির কল্পনাকে অনুসরণ করতে বললেন তিনি। পরের মাসের ভারতীতে আবার সংকুচিত কুব্জ বাঙালীর অকারণ দুঃখময় কল্পনাগীতিকে বায়রনের কবিতা উদ্ধৃত করে ব্যঙ্গ করলেন। বোধহয় নিজেকেও করেছিলেন। কারণ সেই সময়েই 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র 'দুঃখের আবাহন' লিখেছিলেন। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম রোম্যান্টিক কল্পনার স্বরূপ প্রকাশিত হলো, সে কল্পনার উচ্চতা, মার্জনা এবং রুচি প্রকাশিত হলো এবং বলাবাহুল্য, তাঁর কবিতাই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার সার্থকতম প্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের সেই সূক্ষ্মতম চেতনার তন্ত্রীতে কম্পন তুললো। 'অকারণ কষ্ট'

(১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ, ভারতী) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শেলি আর্নল্ড্, রসেটি ও'শনেসি প্রভৃতির কবিতা তর্জমা করে দেখালেন যে আধুনিক ইংরিজি কবিতার মধ্যে 'আশ্রয়প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপসংগীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজি কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন।' শেলির অখ্রীষ্টীয় অদ্বৈতমতের কথা প্রথাবিরোধী বলে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, 'ভারতী'তে প্রকাশিত (১২৮৮ অগ্রহায়ণ) 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' প্রবন্ধে তিনি সে কথা প্রকাশ করেছিলেন। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ইত্যাদি কাহিনী-কাব্যে শেলির প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ক্রমশঃ কবির সৌন্দর্য চেতনার উদ্বোধনে শেলির সৌন্দর্য চেতনা প্রভাব বিস্তার করেছিল। কীট্সের ইন্দ্রিয় চেতনাও কখনো মৃদু কখনো তীব্রভাবে প্রকাশিত। এবং তাঁর সমিল প্রবহমান ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন বেশি। 'বেণু' ও 'বীণা'র সিম্বল খুব সম্ভব কবি পেয়েছিলেন শেলির কাছ থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'বাঁশি'র অনুষঙ্গও বৈষ্ণব কবিতার স্মারক না হয়ে শেলির মানব-দেহবীণার স্মারক হয়েছে। ['Man is an instrument over which a series of external and internal impressions are driven, like the alternations of an ever-changing wind over an Aeolian lyre which move it by their motion to ever-changing melody'.[২] 'Make me thy lyre . 'আমারে করো তোমার বীণা'] দেবেন্দ্রনাথ সেনের ইন্দ্রিয় চেতনা খানিকটা কীট্সের অনুগামী ছিল, 'নির্ঝরিণী' কাব্যগ্রন্থে কীট্স্ থেকে দুটি কবিতা তিনি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিগূঢ় সম্পর্ক প্রকাশে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ভঙ্গি দেখি হেমচন্দ্রে এবং সর্বোপরি বিহারীলালে ও রবীন্দ্রনাথে। প্রকৃতির বিচিত্র পটপরিবর্তনে মানুষের মানসিক পটপরিবর্তন রবীন্দ্রকাব্যধারার একটি অক্ষুণ্ণসূত্র। মহিলাকবি প্রসন্নময়ী দেবীর 'বনলতা' (১৮৮০) কাব্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার অনুবাদ দেখতে পাই।

উনিশ শতকের বাঙালি কবির কাছে বায়রন [১৭৮৮-১৮২৪] নতুন মাদক দ্রব্যের কাজ করেছিলেন। শুধু বাঙলা কাব্যে নয় সমগ্র ইয়োরোপে ইতিপূর্বে অনুরূপ প্রভাব পড়েছিল বায়রনের। তাঁর প্রচণ্ড প্যাশন তাঁকে খ্যাতিবিস্তারের পথ করে দিয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলা কাব্যে যে স্তিমিত অবস্থা চোখে পড়ে তাতে বায়রনের কবিতাই বোধহয় উপযুক্ত

ওষুধের কাজ করেছিল। রঙ্গলাল স্কট-বায়রন-মুর পড়তেন বলে মধুসূদন ব্যঙ্গ করেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। অথচ ছাত্রজীবনে মধুসূদন বায়রনের স্বপ্নে মজে ইংরিজি ভাষার কবি হতে চেয়েছিলেন। বায়রনের দেশপ্রেমাত্মক চেতনা হেমচন্দ্রের চেতনাকে স্পর্শ করেছিল। নবীনচন্দ্র বায়রনের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে কবিত্বের পক্ষে অপরিহার্য যে 'সংযম' তা হারিয়েছিলেন। বিহারীলালের মধ্যে বায়রনের প্রভাব আছে। তাছাড়া তাঁর বায়রন পড়ার প্রমাণ পাচ্ছি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তিতে। উত্তেজনাকে কবিত্বের সংযমে আনবার চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ও যৌবনে। পারেননি অনেক সময়েই, উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন। 'জীবনস্মৃতি' রচনার সময় সেই অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বাসকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। 'কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না'—এই চেতনা তাঁর পনর ষোলো বছর বসে থেকেই ছিল। তবুও অজ্ঞাতে বায়রনই তাঁকে অকারণ দুঃখের স্বরূপ জানিয়ে দিয়েছেন, রোম্যান্টিক মনের মর্মভেদী পরিচয় কী তা হাড়ে হাড়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'শিক্ষানবীশের পদ্য' বায়রনের অনুকরণে ও অনুসরণে লেখা। ১৮৭৪-এর আশ্বিনে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল: 'আজি কালি বায়রণের কাব্যের সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সর্বত্রই বায়রণানুকরণ দেখিতে পাই।' অধরলাল সেন বায়রনের ভাব-শিষ্য বলে খ্যাত ছিলেন।

১৮৬৯-এ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (বিদ্যাপতিগবেষক) 'মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। 'মিত্রবিলাপ' টেনিসনের (১৮০৯-১৮৯২) ইন্ মেমরিয়াম অনুসরণে লেখা। ১৮৮০-এ হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে আমরা টেনিসনের কবিতার অনুবাদ পাচ্ছি। পরবর্তীকালে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পত্নীবিয়োগবিধুর অক্ষয়কুমার বড়াল ইন্ মেমরিয়ামের অনুসরণে নিজের বিয়োগব্যথা প্রকাশ করেছিলেন 'এষা' কাব্যে। আমেদাবাদে থাকতে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরী থেকে টেনিসনের কবিতার বই পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী'তে (১২৮৮, অগ্রহায়ণ) 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' প্রবন্ধে টেনিসনের পৌত্তলিকতার প্রতি অনাস্থাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই অভিনন্দন টেনিসন ছাড়া ম্যাথু আর্নল্ড এবং রবার্ট বুকাননও পেয়েছিলেন। ১৮৮৭-এ দার্জিলিঙের সান্ধ্য সাহিত্য-পাঠের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ টেনিসন ও ব্রাউনিঙের কবিতা পড়ে শোনাতেন। টেনিসনের কবিতা রবীন্দ্রনাথের

মনোবেদনা প্রকাশে সহায়ক হয়েছিল, তাঁর idle tears প্রকাশের অভিপ্রায় বেগবান হয়েছিল। ব্রাউনিঙের ভক্তপাঠক ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ। এর আগে ব্রাউনিং চর্চার তেমন প্রমাণ পাই না। ব্রাউনিঙের ঈশ্বর বিশ্বাস, সৃষ্টির কল্যাণময়তায় বিশ্বাস অক্ষয়কুমার মেনেছিলেন। তাঁর 'প্রদীপ' কাব্যের কবিতাগুলি ব্রাউনিঙের আদর্শে ভাবের বিবর্তন অনুযায়ী সাজিয়েছিলেন। ব্রাউনিঙের ক্ষণিক প্রেমানুভূতির মধ্যেই শাশ্বত মুহূর্তকে আবিষ্কারের আনন্দে রবীন্দ্রনাথও মেতেছিলেন। বিরহের মধ্যেই ক্ষণিক প্রেমের উল্লাসে কেমন একটা সাহসের অনুভব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি, সেটি বোধ হয় ব্রাউনিঙেরই দান। ব্রাউনিঙের কাব্যনাট্যগুলিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্যগুলির প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল সন্দেহ নেই। মিসেস্ ব্রাউনিঙের Sonnets from the Portuguese থেকে একটি কবিতা অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন। যে সমস্ত অপ্রধান ইংরেজ কবিরা বাঙালি কবির অনুকরণ বা অনুসরণের আদর্শ হয়েছিলেন উনিশ শতকে, তাঁদের মধ্যে চ্যাটার্টন, কুপার, গ্রে, পার্নেল, গোল্ডস্মিথ, ফিট্জেরাল্ড, এবং ক্যাম্পবেলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধান কবিদের মধ্যে কোলরিজ বাঙালী কবিদের আলোচনার বিষয় হলেও আদর্শ হিসেবে খানিকটা অনুচিতভাবেই অবহেলিত হয়েছিলেন।

১। এই বইটি রবীন্দ্রসদনে (বিশ্বভারতী) সংরক্ষিত আছে। দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা: উজ্জ্বলকুমার মজুমদার: 'এক্ষণ': জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭।

২। Defence of Poetry. Shelley's Literary and Philosophical Criticism; ed. by John Shawcross (Oxford 1909) Page 121. M. H. Abrams-এর The Mirror and the Lamp (1953)-এর তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত (Page 51)।

খ। নির্ঘণ্ট

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যার সূচক]